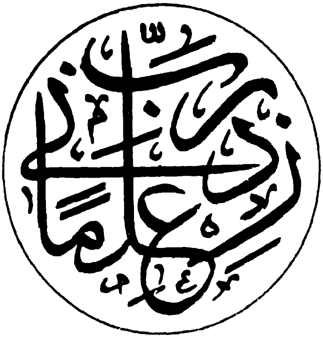


উচ্চারণ: রাব্বে জেদ্‌নিন এলমা

হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

মানুষ আল্লাহ্‌র ভেদ তিনি ভেদ তার
তাই তো আদম হয় খলিফা খোদার।

মহম্মদ নবীর শ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহ্‌র
বকর মানবশ্রেষ্ঠ খলিফা খোদার।

মানুষ আমার ভেদ আমি ভেদ তার
তাই তো মানুষ হয় খলিফা আমার।

কোরআন: ২:৩০, ৮:১৭, ৩০:৩০,
৩৮:২৬, ৪৮:১০,
৫০:১৭

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড

সিদ্দিক-ই-আকবর
হযরত আবুবকর

কোরআনের আলোকে: চার খলিফা, খোলাফা-ই-রা'শেদীন
(ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ)

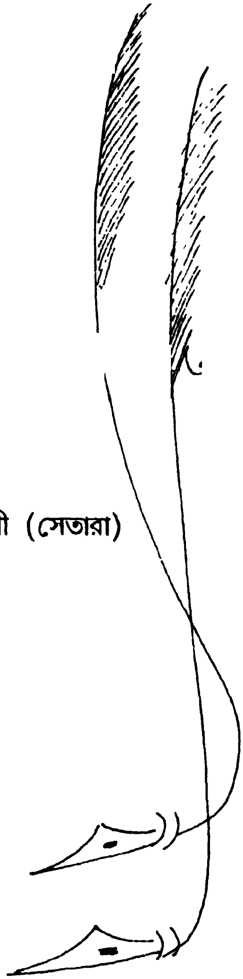
ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

HISTORY OF ISLAM—VOL. II

by—DR. OSMAN GHANI

M.A., Ph.D., D.Litt., R.L.S., F.A.S., S.R.F.



প্রকাশনায়:

আল্‌হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক

মল্লিক ব্রাদার্স,

৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে:

কুমার অজিত , বরুণ সাহা ও শওকৎ আরা গনী (সেতারা)

অক্ষর বিন্যাসে: স্ক্রিপ্ট

২০এ রামনাথ বিশ্বাস লেন,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণে: ইউনিক প্রিন্ট এন্ড প্রসেস

২০এ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

= ভাইবোন =

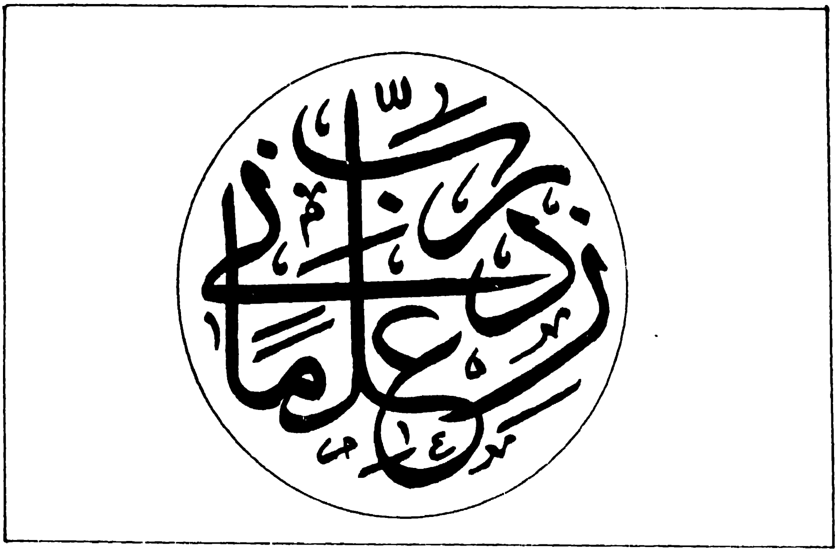
স্বপ্নদ্রষ্টা অগ্রজ

মহম্মদ সোলেমান (মাস্টার)

(জয়নাব-জোলেখা-আনিসুর রহমান)

এ জীবনে ঘটে যদি গিরি-আরোহণ
সে প্রান্তে কেহ নাই, তোমার স্বপন।
জ্ঞানের আলোতে যদি করি বিচরণ
আঁধারে তোমার দান প্রভাত-তপন।
ধর্মের মৌলিক সত্য বুঝাতে মোরে
কত রাত্রির অবসান করেছ ভোরে।

কষ্ট যদি পেয়েছিলে যাইবাবে গোরে
সে-কষ্ট ছিল শুধু ছাড়িবারে মোরে।
ছাড়িতে বসুন্ধরা কষ্ট যদি পেলে
ছিঁড়িতে উসমান-ডোর চক্ষু দুটি মেলে।
শতবার শতজনে একই কথা ব'লে
মুদিলে নয়ন দুটি, পড়িলে ঢ'লে।
তোমার স্বরূপ যেটি করিতে সন্ধান---
আমি যদি দেহ হই, তুমি ছিলে প্রাণ।
জানি না স্বরূপ তব শ্রদ্ধা কি স্নেহ
আমি যদি প্রাণ হই, তুমি ছিলে দেহ।
তোমাকে মাথার মণি দেখেছে গনী
গনী ছিল তব চোখে চোখের মণি।
মোদের সম্পর্ক যেটি ছিল অনুক্ষণ
বলেছিলে তুমি মোরে—'রাম ও লক্ষ্মণ'।



মহানবীর চোখে :

মহানবী (দঃ) বলেন—তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে। কিন্তু আবুবকর বলেছিল—তিনি (অর্থাৎ আমি) সত্যবাদী। সর্বোপরি সে নিজের জান ও মাল দিয়ে আমার সহায়তা করেছে। তোমরা আমার এ সঙ্গীকে ত্যাগ করে কি আমাকেই ত্যাগ করতে চাও?

বঃ হযরত আবু দারদা।—বোখারি।

একদিন মহানবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের মধ্যে আজ কে রোজা রেখেছে? হযরত আবুবকর সিদ্দিক উত্তর দিলেন—আমি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের মধ্যে আজ কে জানাজার নামাজ পড়েছে? হযরত আবুবকর উত্তর দিলেন—আমি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য দান করেছে? এবারও আবুবকর বললেন—আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেছে? এবারও আবুবকর বললেন—আমি। তখন মহানবী (দঃ) বললেন—এতগুলো উত্তম কাজের সমাবেশ একদিনে যার মধ্যে ঘটে, সে অবশ্যই জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে।

বঃ হযরত আবু হোরাইরা।—মোসলেম।

বঃ বর্ণনাকারী

পূর্বাভাষ

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ 'মহানবী' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী ও দেশজোড়া পাঠক-পাঠিকাগণের আশাতীত আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছি, উৎসাহ বোধ করেছি। বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি পত্রও দিয়েছেন—'ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস' শেষ করার জন্য। তাঁদের অকৃত্রিম অনুরোধে আমি অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ। 'মহানবী' গ্রন্থটি সমাজে এত সত্বর এরূপ মর্মস্পর্শী সাড়া জাগাবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। যে কোন লেখকের জীবনে এটা খুবই আনন্দের কথা।

'মহানবী'র পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ইচ্ছা রেখেছি। বহু বিদগ্ধজন হতে সাধারণ মানুষও 'মহানবী' (দঃ)-কে 'মানুষ' হিসাবে দেখার যথার্থ মূল্য দিয়েছেন, যার জন্য খুবই আনন্দ পেলাম। বাংলাদেশ হতেও বহু বিদ্যানুরাগী আমাকে অনুরূপ পত্র দিয়ে ধন্য করেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'মহানবী' গ্রন্থটি প্রভূত সমাদর লাভ করায় সকলকে আবার বিনম্র চিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

১৮ : ১০৯, ১১০, ৪১ : ৬।

আজ সকলের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা মাথায় নিয়ে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড—'খোলাফায়ে রাশেদীন' (সৎপথে পরিচালিত ন্যায়পরায়ণ চার খলিফাগণ) প্রকাশিত হল। আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি, বহু জনের আগ্রহ ও অনুরোধ আমাকে এই কাজে শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে নিবিড় সাধনায়।

মহানবী রচনাকালে যে কোরআনভিত্তিক নীতি অনুসরণ করেছিলাম, এখানেও সেই একই নীতির প্রয়োগ করেছি। কেননা এখানে যাঁদের কথা আলোচনা করেছি তাঁরা ছিলেন মহানবী (দঃ) এর একান্ত অকৃত্রিম অনুসাবী, সুতরাং ঐ একই নীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক।

মুসলিম খেলাফত ও সাম্যবাদ

মহান গুরুভার ও বিশাল গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েও সংসার-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও প্রশাসনে মানুষ কি করে আপন গুণে মহান হতে পারে, মহিমান্বিত হতে পারে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনধারা তারই আলেখ্য। তাঁরা আপন কর্মগুণে অলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন মানব সমাজে। সুতরাং এখানেও অহেতুক অলৌকিকতার মোহ বা দুর্বলতা পরিহার

করার চেষ্টা করেছি। কেননা সাবধান বাণী এইটুকু—সত্য ও সুন্দরের পথে তাঁদের কঠিন অর্জিত মনুষ্যত্বের দীপশিখা যেন কোন অনিশ্চিত অলৌকিকতার ঝড়-ঝাপটায় নিভন্ত হয়ে না ওঠে। সবার সম্মুখে তাঁরা দেহগতভাবে ছিলেন সাধারণ মানুষ, অন্তরে ছিলেন আদর্শ মানব।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সবসময় নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন এবং ঠিক ঐ ভাবেই দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরাও করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ"। পরবর্তীকালে তাঁর চারজন অকৃত্রিম অনুসারী খলিফাগণও ঠিক ঐ ভাবেই নিজেদের সমাজে তুলে ধরেছিলেন। খলিফাগণের জীবন ছিল এমনই সরল ও সহজ, কোথাও কোন দুর্বলতা ও জটিলতা নেই, অভিনয় নেই, অভিমান নেই, আড়ম্বর নেই, অহমিকা নেই, অসাম্যের চিহ্ন নেই। তাঁরা শুধুমাত্র সাম্যের প্রবক্তা ছিলেন না, বাগ্মী ছিলেন না, তাঁরা বিশাল জনসমাবেশে সাম্যের সুন্দব ভাষণ দিয়ে অসাম্যের বিরাট অট্টালিকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বৈধ-অবৈধ সম্ভোগের চবম প্রাচুর্যে দিন ও রাত্রি কাটিয়ে নিজদেরকে নিজেই প্রবঞ্চনা করতেন না।কোরআন ১৮ : ১১০।

তাঁরা ছিলেন সত্য, শান্তি ও সাম্যের আচার্য। তাই তাঁদের বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদীন, অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। আরবী খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। মহানবী (দঃ) ছিলেন এক আল্লাহর প্রতিনিধি। চার খলিফাগণ ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি ৬৩২ ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মহানবী (দঃ) রাতের পর রাত, নিবিড ধ্যানে, একান্ত আবাধনায় আত্মিক সাধনায় আল্লাহর নিকট হতে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং দিবালোকে মানুষেব কল্যাণে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করতেন। 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও ছিলেন ঠিক তাঁর পূর্ণ অনুসারী। তাঁরাও বলতেন—'রাত্রিতে যে শক্তি সঞ্চয় করি, দিবালোকে তা খরচ করি।' তাঁরা আরো বলতেন, মনের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, দেহের জন্যও তেমনি প্রার্থনা আছে। মনের প্রার্থনা ধর্মযোগে, অর্থাৎ মন ভাল থাকে ধর্মযোগে, দেহের প্রার্থনা কর্মযোগে, অর্থাৎ দেহ ভাল থাকে কর্মযোগে। এইভাবে তাঁরা একদিকে ছিলেন ধর্মযোগী, আবার অন্যদিকে ছিলেন কর্মযোগী। তাই তাঁদের জীবনধারা ছিল আদর্শের ধারা, অনুশীলনের ধারা, মানুষ গঠনের ধারা, সমাজ গঠনের ধারা। তাঁদের ধারা শুধু জড়বাদের (Materialistic world) মতো দেহ ও ইহলোকের ধারা নয়। তাঁদের জীবনধারা দেহ ও মনের সমন্বিত ধারা, ইহলোক ও পরলোকের সম্মিলিত ধারা, এককথায় অখণ্ড জীবনের ধারা।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারায় বিধৃত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র জাতি, যার নাম মানবজাতি। একটি মাত্র সমাজ, যার নাম মানবসমাজ। তিনি চেয়েছিলেন একটি মাত্র সরকার, যাব নাম বিশ্ব-সরকার বা মানব সরকার। (বর্তমানের U.N.O. জাতিসংঘ তার

কিছুটা মাত্র।) একটিমাত্র শাসন, যার নাম বিশ্ব-শাসন বা মানব-শাসন; একটি মাত্র সভ্যতা, যার নাম বিশ্ব-সভ্যতা বা মানব সভ্যতা; একটি মাত্র পরিবার, যার নাম বিশ্ব-পরিবার বা মানব-পরিবার। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার, যে ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক। যে তার প্রতিবেশীর চোখে ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক।" সুতরাং ভাল লোকের সংজ্ঞা তিনি কোন দেশ-পাত্র বংশ-গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যাননি।

আজ ১৪০০ বছর পর সমগ্র বিশ্ব যেন একটি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। অতএব সমগ্র বিশ্ব-মানব আজ ঐরূপ একটি একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক চিন্তা ভাবনা নিতে না পারলে, একদিন বিশ্ব-সমাজ একে অপরের অব্যর্থ আঘাতে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার জন্যই আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী এরূপ একটা চিন্তা নিয়েছিলেন বিশ্ব মানব, বিশ্ব সরকার। তাঁর বিষযবস্তু ছিল - বিশ্ব সৃষ্টি, বিশ্ব-সমাজ। তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল মানবাধিকার, মানব সমাজ। তাঁর এক হাতে ছিল বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা, অন্য হাতে ছিল সেই এক বিশ্বস্রষ্টার সকল সন্তানকে এক ও অভিন্ন জানা এবং সকল মানুযেব মানবাধিকারকে স্বীকার করা ও সম্মান দেওয়া।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস--সেই এক মাতা ও এক পিতার ইতিহাস, সেই এক ও অভিন্ন সন্তানের ইতিহাস, মানবাধিকাবের ইতিহাস, সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পুরুষ ও রমণী সকলকে নিয়ে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নশীল অখণ্ড মনুষ্য সমাজের ইতিহাস।

ইসলাম ধর্ম মূলত তাই শান্তি ও সাম্যভিত্তিক, প্রতিবেশী, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই বোন, স্ত্রী-পুত্র কন্যা প্রভৃতি সহ পরিবারভিত্তিক, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক, দেশ পরিচালনার জন্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রভিত্তিক, সংসার ও সমাজভিত্তিক, সংস্কার ও সভ্যতাভিত্তিক এবং বিপ্লব ও বিবর্তনভিত্তিক। ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদিস এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণপঞ্জী। শুধু গ্রন্থ মধ্যে কাগজে কলমেই এই সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন হতে তাঁর অকৃত্রিম খলিফাগণ 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' জীবনধারা এর প্রমাণের কোন অপেক্ষাই রাখে না। ধর্মে, শাস্ত্রে, শাসনে, প্রশাসনে, ইতিহাসে, দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে দূর অতীত হতে সুদূর ভবিষ্যতের অখণ্ড মানুষের এবং মানুষের অখণ্ড জীবনের জন্য 'খোলাফায়ে রাশেদীন' সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ জীবন-ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যেন সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য কতিপয় মহাজীবনের প্রবল প্রয়াসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিহাস, দৃষ্টান্তের ইতিহাস, উপমার ইতিহাস, অনুশীলনের ইতিহাস, প্রতিজ্ঞার ইতিহাস, প্রজ্ঞার ইতিহাস, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস, আদর্শের ইতিহাস ও মানবাধিকারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের ইতিহাস।

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) নিরঙ্কুশ সাম্যের ভিত্তিতে জগৎ শান্তির যে সমাজব্যবস্থা, যে বিধিবিধান দান করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন সেই পথে পরিচালিত হলেন। মহানবী (দঃ)-এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেওয়া পথ ও পন্থা কিছু কিছু সমাজবিরোধীদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল, তখন ইসলাম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) তরীর হাল ধরলেন। খুবই শক্ত হাতে, খুবই দক্ষতার সাথে বিপদাপন্ন উত্তাল তরঙ্গ হতে ইসলামের তরীকে তীরে আনতে সক্ষম হলেন। তাই তাঁকে Saviour of Islam বা ইসলামের ত্রাণকারী বলা হয়।

এরপর হাল ধরলেন আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা রূপে শাসনে সমাজ জীবনে, সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং গঠনে ও বিচারাসনে যে অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ও কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, তা জগতের ইতিহাসে আজও দুর্লভ। তাই তাঁকে Real Builder of Islamic State বা ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

অতঃপর এলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ)। হজরত ওসমান (রাঃ) চিরদিনই ছিলেন অতীব দয়ালু, দাতা, মহানুভব। তিনি নিজে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তীকালে ইসলামের সেবায় সমস্ত ধন বিতরণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে জগতের বুকে অক্ষয় ও নিখুঁত রাখার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য। অন্যান্য সকল কাজের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন একত্রীকরণে তিনি যে বুদ্ধিমত্তাব পরিচয় দিয়েছেন, তা চিরস্মরণীয় বস্তু। তাই তাঁকে জা'মেয়ুল কোরআন বা কোরআন একত্রকারী বলা হয়।

এরপর এলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ বা শের-ই-খোদা হযরত আলী হায়দার (কঃ) (৬৫৬-৬১ খ্রীঃ)। পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে বহু বীর এসেছেন ও গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব সমাজ দ্বিতীয় আলির (কঃ) জন্ম দিতে পারেনি। তিনি শারীবিক শক্তির দিক থেকে ছিলেন মহাবীর, আবার মানুষের দিক থেকেও ছিলেন মহামানব, পৌরুষের দিক থেকে ছিলেন মহাপুরুষ, মনের দিক থেকে ছিলেন মহানুভব। দেহের বীরত্ব ও মনের মহত্ত্ব একযোগে তাঁকে এতদূর ঊর্ধ্ব-জগতে নিয়ে গিয়েছিল, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহয় সিংহ ও 'জ্ঞানের দরজা' বলে ভূষিত করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন মানব সমাজের নজিরবিহীন সিংহ-পুরুষ। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন পবিত্র খোলাফায়ে

রাশেদীনের অক্ষত সময়কাল, মানবতার পরিপূর্ণ জীবনদীপ, সাম্যের পূর্ণ প্রতীক, শান্তির নিরঙ্কুশ বাহন চির ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। মানব সমাজ হারাল তার সাম্যের যুগ, স্বর্ণ যুগ, আদর্শ সাম্যবাদ। ইসলামের প্রকৃত খেলাফত যুগ এখানেই সমাপ্ত হল। পরবর্তী অধ্যায় খলিফা বনাম রাজা-বাদশার যুগ। মানবকালের মধ্য-গগনে মানবতার পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সততা ও ধর্মপরায়ণতা, হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিচার ও প্রশাসনিক প্রতিভা ও যোগ্যতা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনহিতকর কার্য ও মহানুভবতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও মহত্ত্বকে মানব সমাজে মানুষের স্মৃতিতে ম্লান করতে পারে মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি। খলিফাগণ এই যে অলোকসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের অদম্য চরিত্রবল। তাই তাঁদের ইতিহাস একদিকে রাজা-বাদশার ইতিহাস, অন্যদিকে ফকিরের ইতিহাস; একদিকে মানুষের ইতিহাস, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, সমৃদ্ধির ইতিহাস। সবের উর্ধ্বে সত্য ও সুন্দরের পথে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁদের ইতিহাস সাম্যের ইতিহাস, শান্তির ইতিহাস। এককথায় তাঁদের ইতিহাস রাষ্ট্রের ও সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কথা স্মরণ করে সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকারের অকৃত্রিমভাবে অনুস্মরণের ইতিহাস।

সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকার

অতীতের ইতিহাস হতে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা হতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে, ধর্মগ্রন্থ হতে ও নানা দিক হতে ভবিষ্যতের পথে একটি কথা বিশ্ব-মানবসমাজ বারবার জানতে পেরেছে—যখনই যে কোন সমাজ বা দেশ তার সাম্যের ভারসাম্য হারিয়ে, মনুষ্যত্বকে হারিয়ে পশুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তখনই বিধাতা পুরুষ পরম করুণাবশত এক-একটি ক্ষণজন্মা পুরুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর দূতরূপে, সাম্যকে ফিরিয়ে এনে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর দূতগণের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)। কোরআন—৩:১৪৪, ৪:৭৯, ৩৩:২১, ৪১:৬, ৪৮:২৯, ৬১:৬।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দরদী বন্ধু; এবং দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী মহান দূত, মরুর কল্যাণে মরুদুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে ও মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তি-সাম্যে মহাসেনা, সমাজ সংস্কারের দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমার দরবারে দয়ার সাগর, প্রেম ও ভালবাসায় পরমপুরুষ। কোরআন—৩:১৫৯, ৪:৭৯, ১৬৫, ৯:১২৮, ১৫:১০, ১৬:৪, ২১:১০৭।

তুলিতে মানব জাতি মনুষ্য সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব সন্তানে।
দুই হাতে তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।

* * *

জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কন্টকেতে ক্ষতবিক্ষত
তখনো নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান। --মহানবী

তবে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী (দঃ)-এর চিন্তাধাবাকে তদানীন্তন বিশ্ব-সমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি অলোড়িত কবেছিল, এবং যে দুটো দিকে তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, ঐ দুটো জিনিস সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী সমাজ। কোরআন— ২ : ১৮৭, ৩ : ১২৯, ৪ : ৩৪।

পুরুষ-রমণী সমাজপাখি মহানবীর হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই, উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বাবা গড়িবে এ সংসাব।
এক যদি গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী। মহানবী

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান ব্রতেব মূল লক্ষ ছিল সকল মানুষের মাঝে বিশ্ব স্রষ্টাব বন্দনা, এবং সেই এক বিশ্ব স্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মাঝে জাতিগত-বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মানুষ রচিত কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করে সাম্যের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। মানবতার এই বাস্তবায়নের জন্যই কখনও উড়িয়েছিলেন ধর্মের পতাকা, কখনও বা উড়িয়েছিলেন কর্মের নিশান, কখনও বা রেখেছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রাণের সুদৃঢ় পদক্ষেপ, কখনও বা ঘোষণা করেছিলেন 'জেহাদ'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কোরআন—৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০, ৯৩ : ১০।

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
দেখিবারে দেখেছিলে জগৎ স্বপন
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।

—মহানবী

মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—এই জগতে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্, এবং তাঁর সৃষ্ট-জগতে ও সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। তিনি কোন রাজতক্ত মেনে নেননি। কোন রাজা মানেননি। কোন জমিদার ও জোতদারকেও স্বীকার করেননি। কোন অতিরিক্ত সঞ্চয়কারীকেও বরদাস্ত করেননি। এ বিশ্বে মদিনার বুকে নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রমুখী সমাজব্যবস্থা। যা ছিল একান্ত সাম্যভিত্তিক।

এ ধরার মালিকানা জগৎস্রষ্টার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তার।
শিখায়েছ মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।
শিখাইলে মানুষের মান-মানবতার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
মানুষ খলিফা! শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার।
মহানবীর গণতন্ত্র সভ্যসমাজ
শিখায়েছে মানবেরে গড়িতে সমাজ।

অক্ষত সাম্যবাদের ক্ষতবিক্ষত রূপ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহানবী (দঃ)-এর বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী ও মানবতার উদ্ধারকারী, চিন্তা ও কর্মধারার প্রয়োগ প্রণালীকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলেছিলেন তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন (সৎখলিফাগণ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ অর্থাৎ মহান সঙ্গীগণ।

এই খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল মানব সমাজে প্রথম নিরঙ্কুশ সাম্যবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি চূড়ান্ত ফল। কি করে এই সংসারের একটি মানুষ সামান্য সংসার জীবন হতে অসামান্য বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেও সাম্যের ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করতে পারেন—একদিকে তিনি ফকির, অন্যদিকে তিনি সম্রাট; আবার শক্তির দিক থেকে একদিকে তিনি পার্থিব জীবনের শক্তিধর পুরুষ ও সম্রাট, অন্যদিকে আত্মিক দিক থেকে স্বয়ং স্রষ্টার অমিত শক্তির অসীম আধার। এইখানেই, এই তাৎপর্যেই তাঁরা স্রষ্টার দূতের প্রতিনিধি,

প্রতিনিধিত্বও তাঁদের সার্থক হয়েছে। তাঁদের যে জীবন, তা জাগতিক ও ঐশ্বরিক দ্বিশক্তিকে দু'হাতে ধারণ করে মানব সমাজে সাম্যের সেনারূপে মানবতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনকাল সময়কাল জগতেরও (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ) সংসারের এই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল, সত্য পরীক্ষায় উন্নীত। সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনে-প্রশাসনে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাম্য সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন গালভরা সংবিধানে নয়, কোন কনফারেন্স বা সেমিনারে নয়, কোন ঐতিহাসিক মঞ্চের আসনে নয়, ভাষণে নয়, তাঁদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সাম্য পেয়েছে প্রাণ সমাজ-জীবনে।

তাঁদের পবিত্র জীবন ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব ইতিহাসে, রাজ-ইতিহাসে এই অপূর্ব সমন্বয়ের সাম্যের অধ্যায়টি অলিখিত থেকে যেত। সংসারের কঠিন ধারা ও স্বর্গের সুধা কেমন করে একটি মানুষের জীবনে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে, কি করে একটি সম্রাট ফকিরের জীবনযাপন করতে পারেন, সাম্যের প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন-প্রণালী, খেলাফতকাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, নজিরবিহীন উপমা। এই দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন মরণোত্তর অখণ্ড জীবনের ও সাম্যবাদী মানব-সমাজের এবং সভ্যতার, শাসনের-প্রশাসনের মহান রূপকার।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪) (ইসলামের ত্রাণকারী) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই মহানবী (দঃ)-এর মহান চিন্তাধারাকে সমাজ-জীবনে রূপ দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) (ইসলামি রাজ্য ও শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) ঐ চিন্তাধারাকে সযত্নে লালন করে বিশ্ব-সমাজ জীবনের সারবান বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাম্যের ভিত্তিতে ধনী-দরিদ্র, মুসলমান-অমুসলমান যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। (মহানবী (দঃ) বলেছিলেন—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার। যে এই পরিবারের নিকট ভাল মানুষ, সেই আল্লাহর নিকট ভাল মানুষ।") হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনে ও দক্ষ হাতে মহানবীর (দঃ) এই পরিবারভিত্তিক চিন্তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ দেখতে পাই। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীও ছিলেন এই পথেরই অনুসারী।

কোন অনিবার্য কারণবশত তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬) (কোরআন একত্রকারী)-এর সময় ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে সমাজে কিছু কিছু ধনী, জমিদার ও জোতদারের আবির্ভাব হলে মহানবী (দঃ)-এর কয়েকজন বিশেষ সাহাবী সাম্যের জন্য সিংহবিক্রমে গর্জিয়ে ওঠেন। মহানবী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যের গায়ে সামান্যতম আঘাতকে তাঁরা

যেন আপন শরীরের অসামান্যতম আঘাত বলে অনুভব করেছিলেন। এই সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম।

তখন (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ) সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। সিরিয়াতে হযরত আবুজর গিফারীর (রাঃ) অসন্তোষের বহ্নি যখন বিরাট আকার ধারণ করল, তখন স্বয়ং গভর্নর প্রমাদ গুনলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই হযরত গিফারীকে সুকৌশলে মদিনায় খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা বহু চেষ্টা করেও হযরত গিফারী (রাঃ)-কে বোঝাতে সক্ষম হননি। হযরত গিফারী (রাঃ) মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্য জনগণকে ডাক দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শরীর তাঁকে আর বেশিদিন সময় দেয়নি। কিন্তু তাঁর আন্দোলন ও আহ্বান সকলের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব-সমাজবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা বেরিয়েছে, জার্মান ভাষা তাদের অন্যতম। এই পথে জার্মান পণ্ডিতগণ, রাজনীতিবিদগণ পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস হতেই সর্বপ্রথম কমিউনিজমের সন্ধান পান। (কোরআন-সুরা*মাউন ১০৭:১-৭।) এবং আবুজর গিফারী (রাঃ)-কে বিশ্বের সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট—সাম্যবাদী) বলে আখ্যায়িত করেন। জার্মানবাসীদের মনে মুসলিম ভাব ও চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যয়ন শুরু হয়। পবিত্র কোরআন হতে আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জার্মান ভাষায় অনূদিত হল। পরবর্তীকালে (KARL MARX) কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডারিক এঞ্জেলস মুসলিম ইতিহাসকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার ও উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং জার্মান পণ্ডিতগণও এই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির ফলে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

সুতরাং আজ যদি মহানবীর প্রিয় উম্মত বিশ্ব মুসলমানকে ও ঋষি মহর্ষীগণের বংশধর ভারতবাসীকে বা যে কোন ধর্মের যে কোন আস্তিককে কোন নাস্তিকের নিকট সাম্যের সেবক ও শান্তির শিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে বিশ্ব মুসলমানের জন্য ও বিশ্ব-আস্তিকের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

---

*সুরা মাউন: (১) তুমি কি তাকে দেখেছ—যে ধর্মকে অস্বীকার করে? (২) ফলত সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, (৩) যে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। (৪) সুতরাং ঐ সকল নামাজ আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ, (৫) যারা স্বীয় নামাজে (অর্থাৎ নামাজের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে) অমনোযোগী। (৬) যারা শুধু (যেন লোকচক্ষে লোক) দেখানোর জন্য (উপাসনা) করে। (৭) এবং (গৃহস্থালীর) প্রয়োজনীয় ছোটখাটো দ্রব্যাদি দ্বারা (গরিবকে) সাহায্য করতে বিরত থাকে। কোরআন ২:২৬১-৬৪, ৩:৯২, ১০৭:১-৭, ৯৩:১০।

পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ইসলামের সেই অনাবিল শান্তি ও সাম্যকে ফিরিয়ে আনতে। ইসলামের প্রথম দুই খলিফা মূলত যুদ্ধ করেছিলেন অমুসলমানদের সাথে। তখন মুসলমানদের মধ্যে কোনপ্রকার মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হযরত আলীর জন্য চরম দুর্ভাগ্য, তাকে তাঁর আপন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তরবারি ধরতে হল। তিনি যখন খেলাফতে বসলেন, তার পূর্বেই ইসলাম জগতে বা রাষ্ট্রে দুষ্ট কায়েমী স্বার্থ বসে পড়েছে। তখন অনেকেই বড় বড় জমিদার ও জোতদার বা ধনকুবের। হযরত আলী (রাঃ) কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। বরং যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যখন আঁতে ঘা লেগেছিল কপট মারওয়ান ও কুচক্রী মুয়াবিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের, তখন তাঁরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলেই জানতেন হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) চিরছায়া স্বরূপ ছিলেন। চরিত্রে ব্যক্তিত্বে ছিলেন তুলনাহীন মানুষ। তবুও তাঁরা তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। অন্যদিকে মহাবীর মহানুভব আলী (রাঃ) তাঁদেরও সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ইসলামের শান্তি ও সাম্যেব জন্য। এই যুদ্ধে হযরত আলীর পরাজয়ের প্রধানতম কাবণ কোথাও তিনি অসৎ, হীন ও নীচ হতে পারেননি। যে কোন পরিবেশে, যে কোন পরিস্থিতিতে হীনতা ও নীচতা কোনদিনই মহানুভব আলীর (রাঃ)-এর একটি স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁর শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ কর্তৃক লালিত-পালিত ইসলামের প্রকৃত সাম্যবাদ সমাধিস্থ হল, এবং কপট কুচক্রী আমির মুয়াবিয়ার হাতে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জগতে কুখ্যাত রাজতন্ত্র জন্ম নিল।

—ওসমান গনী

অবতরাণিকা

ইতিহাস আল্লাহর সৃষ্টি

আজকের বালক-বালিকা যেমন আগামীকালের যুবক যুবতী, জনক-জননী বা পিতা-মাতা, ঠিক অনুরূপভাবে আজকের ঘটনা আগামীকালের কাহিনী বা ইতিহাস। অতীতের সংবাদপত্রগুলো বর্তমানের ইতিহাস এবং বর্তমানের সংবাদপত্রগুলো ভবিষ্যতের ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাসের মূলে দেখা যাচ্ছে—প্রথম ঘটনা, ঘটনা সংবাদে রূপান্তরিত, সংবাদ ইতিহাসে স্থানান্তরিত। এবার লক্ষ্য করব— এই ঘটনারাশির মূলে কে!

"তোমার নিকট কি ফেরাউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত এসেছে।"

কোরআন—৮৫ : ১৭ ১৮।

কোথায় আজ দুর্ধর্ষ আদ-সামুদ-মাদাইন ও লুতের বংশধরগণ!

কোরআন —৭ : ১৫, ৯ : ৭০, ১১ : ৫০, ১৪ : ৯, ২২ : ৪২, ২৫ : ৩৮।

কোথায় আজ শক্তিশালী ফেরাউন, সাদ্দাদ ও নমরুদ!

কোরআন— ২ : ২৫৮, ৭ : ১০৩-১৪০, ১০ : ৭৫ ৯২।

কোথায় আজ মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও অজন্তা-ইলোরা!

কোথায় আজ আল্-হামরা ও তাজমহলের নির্মাতাগণ!

আল্লাহ্ কোরআনে ন্যায়-বিচার ও উপকারের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অশ্লীল ও অসৎ কার্যের এবং অমিতব্যয়িতার জন্য নিষেধ করেছেন। ১৬ : ৯১।

যখনই যে কেউ আল্লাহর বাণীকে উপেক্ষা করেছে, তখনই তিনি তাকে শূন্যে বিলীন করে দিয়েছেন। তাই মানুষের সৃষ্টি ইতিহাসের মূলে যে ঘটনারাশি, তারও মূলে রয়ে গেছে 'আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিব্যক্তি'। মানুষ তার লেখক মাত্র। যে কোন জাতিকেই শিক্ষা নিতে হলে, তার ইতিহাস হতেই চরম শিক্ষা নেওয়া উচিত। কেননা সকল ইতিহাসই আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষ তার লেখক ও নিমিত্ত মাত্র। ৭ : ৩১, ১৩ : ১১, ১৭ : ২৭, ২৯, ৫৩ : ৩৯।

পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখ সব ঘেরি
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেরি।
মানুষের বুদ্ধিবল দেখ বিবেচনা
তার পরে দাও তুমি আপনার চেনা।
পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখে সব ঘেরি
বাজাতে শেষের ঘন্টা নাহি কর দেরি।

ইসলামের ইতিহাস

দেখিয়া কোন মুসলিম-হাতে জুয়ার আসরে তাস
ভাবিও না তা কোরআন-হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
দেখিয়া কোন মুসলিম-হাতে সতীর সর্বনাশ
ভাবিও না তা আল্লার বাণী নবীজীর ইতিহাস।
মুসলিম নয়, নরপশু সে, পশু প্রবৃত্তির দাস
মহাপাপের ধিক্কার দেয় ইসলামের ইতিহাস।
নর-নারীর প্রেম শুদ্ধপথে বহিতে প্রেমের প্রবাহ
ব্যভিচারে দিল প্রাণদণ্ড; বিবাহেতে দিল উৎসাহ।
দেখিয়া কোন মুসলিম-হাতে গরিব হয়েছে নাশ
ভাবিও না তা কোরআন-হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
দেখিয়া কোন বাদশার কোপে অসহায় মজলুম
জালেমের রূপ দেখিও সেথা ইসলামে নাই জুলুম।
বলে না কোরআন, বলে না হাদিস সাম্যের ইতিহাস
মর্ত্যের বুকে করিবে মানুষ খুনোখুনি বারমাস।
বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস শান্তির ইতিহাস
বিশ্ব মানব করিবে হেথা শান্তিতে বসবাস।
চার খলিফার প্রাণের ছবি নবীজীর ইতিহাস
মোরা শুধু তার বিকৃতিকরণ করেছি সর্বনাশ।

কোরআন: ২:১২৪, ২৭৯, ৪:৩, ৩৪, ১২৯, ৯:৭০, ২৩:৯৪, ২৮:৩৭।

খলিফা

সকল ধর্মের প্রাণ আদি সত্য রূপ
শরীয়ৎ, তরিকৎ, মরিফাতে তাসাউফ্
যে জন অক্ষম এই তাসাউফ জ্ঞানে
ইসলামের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।
যে জন অক্ষম এই জীবন জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু মহিমায়।
মানুষ আল্লাহর ভেদ তিনি ভেদ তার
তাই তো 'আদম' হয় খলিফা খোদার।
মানুষ সবার উপর সবকিছু তার

বিকাশ ঘটিলে শুধু মনুষ্য-আত্মার।
বিবেকের জয় যেথা আত্মার উত্থান
মানুষ ফেরেশতা হতেও শ্রেষ্ঠ মহীয়ান।
দ্বারী হয়েও হও যদি মানুষ মহান
দেখিবে দুয়ারে তব দাতা দণ্ডায়মান।
বাড়ে যদি শক্তি তব বিশুদ্ধ আত্মার
জিজ্ঞাসা করিবে প্রভু কি চায় তোমার।

নিবিড় রহস্যঘেরা সূফী-আচরণ
আত্মার উন্নতি পথে শ্রেষ্ঠ বিচরণ।
সূফী মতে নাহি যেথা আত্মার বিকাশ
মনুষ্য জীবন তার শুধু-পরিহাস,
দুর্লভ মানব জন্মে যার ইতিহাস--
প্রকৃতির কোলে সে যে প্রবৃত্তির দাস।
যে জন অক্ষম এই সূফী-সন্ত জ্ঞানে
জীবনের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।
সম্মানের শীর্ষে তু'লে অলিরে কোরআন -
সমগ্র জগৎ জনে করেছে সাবধান।

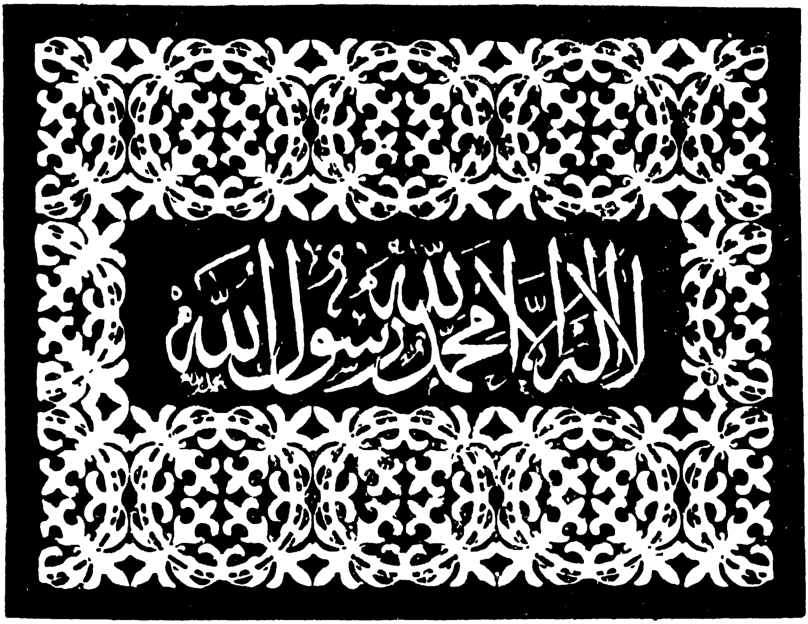
মহম্মদ নবীর শ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহর
বকর মানবশ্রেষ্ঠ খলিফা খোদাব।
আল্লাহর মহান [illegible] বকর তুমি
কখনও পাবে কি আর আরব ভূমি!
রেখে গেলে জীবনেব এ কোন্ খ্যাতি
ধন্য হল জগতের মানব জাতি।
ওমর ওসমান হতে আলী হায়দার
জগতের অদ্বিতীয় খলিফা খোদার
তাঁদেরে পেয়েও কেন পিপাসা পাবার
মানুষের মাঝে ছিলেন মানুষ আবার।
বিকাশ ঘটিলে শুধু মনুষ্য আত্মার
কত যে আপন তুমি দেখিবে আল্লাহর
মানুষ আমার ভেদ আমি ভেদ তার—
তাই তো মানুষ হয় খলিফা আমার।

কোরআন: ২:২৫, ৩০, ৮:১৪, ১০:৬২, ১৮:১০৭, ২৩:১, ৬২:১০, ৮৯:২৭-৩০।

খোলাফায়ে রা'শেদীন
(সৎ পথে পরিচালিত চার খলিফা)

খলিফা নামের যোগ্য বুঝালেন বিধি
সৃষ্টির সেবায় যাঁরা তাঁরই প্রতিনিধি।
জীবিকা জীবন লাগি করি বিশ্বাস
জীবনেরে করে নাই জীবিকার দাস।
রেখেছ জীবন-ধ্রুব এমনি সুস্থির
যখনি বাদশা তুমি তখনি ফকির।
সমাজে শাসনে যাঁদের প্রত্যক্ষ জীবন
বিধাতার শতগুণে গুণান্বিত মন
সাম্যেতে সূর্যের সম দীপ্তি বিকিরণ
শান্তিতে চন্দ্রের ন্যায় আলো বিতরণ।
কখন কোমল হৃদয় কুসুম সম
কোথাও পাহাড় হতেও রুদ্রতম।
কখন প্রশান্ত প্রাণ সাগর সম
কোথাও আকাশ হতেও উদারতম।
বেগবান নদী যারা কে তাদের রুখে
স্বয়ং বিধাতা যাদের স্রোতের সম্মুখে।
দুই তীরে রেখে গেলে দূরেই প্রকাশ
ইসলামের মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত বিকাশ।
খোলাফায়ে রাশেদীন সিদ্ধ চারজন—
মানুষের মানবতার মহা মূল্যায়ন।
মানুষ সবার উপর শ্রেষ্ঠ মহীয়ান
এ সত্যের যেন নাহি কর অপমান
তুমি যে সবার সেরা শ্রেষ্ঠ গরীয়ান
নিজ হাতে নাহি কর নিজ অপমান।

কোরআন —২:৩০, ৬২, ২১৩, ৪:১, ১৬৫, ৬:১০৮, ৭:১৭২, ১৮৯, ১০:১৯, ৯৯, ১০৮, ১১:১১৮, ১৬:৯৩, ১২৮, ১৭:১৫, ৮৪, ১০৫, ২১:৯২, ২২:৬৭, ২৩:৫২, ২৫:৫৬, ৩০:৩২, ১১০, ৩৪:২৮, ৪৯:১১, ২৩, ৫৩:৩৯, ৬৪:২, ৮৭.১৪।



লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।

খেলাফত

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন—

"আমার নবুয়ত যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, ততদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তিনি তা তুলে নেবেন। তারপর নবুয়তের তরিকায় বা পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং আল্লাহ্ যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন টিকে থাকবে। তারপর তা তুলে নেবেন। অতঃপর আত্মঘাতী মুলকিয়ৎ (রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হবে। যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, ততদিন তা টিকে থাকবে। তারপর তাও তুলে নেবেন। অতঃপর জোর-জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তা টিকে থাকবে। তাবপব তা তুলে নেবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় নবুয়তের তরিকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন।"—মেশকাতুল্ মাসাবিহ, (বাবুল্ ইন্ফার ওয়াত্ তাহ্জীর্)

মহানবীর নবুয়ত্ যুগ	: ৬১০—৩২ খ্রীঃ = ২৩ বছর।
খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ	: ৬৩২–৬১ খ্রীঃ = ৩০ বছর।
ইসলামি খেলাফতের নিখুঁত আদর্শ ও স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ	: ৬৩২—৫০ খ্রীঃ = ১৯ বছর।
উমাইয়া রাজতন্ত্রের যুগ	: ৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ = ৯০ বছর
আব্বাসীয়া রাজতন্ত্রের যুগ	: ৭৫০—১২৫৮ খ্রীঃ = ৫০৯ বছর
ইসলামি যুগ	: ৬১০—৬৬১ খ্রীঃ = ৫২ বছর।
মুসলিম যুগ	: ৬৬১—১২৫৮ খ্রীঃ = ৫৯৮ বছর।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সিদ্দিক-ই-আকবর

হযরত আবুবকর (রাঃ)

হে বিরাট হে মহান তোমারে চুমি
বিশাল রোমান-শক্তি রুখে দিলে তুমি।
দাম্ভিকতার চূড়ে ব'সে বুঝিল ইরান—
কত শক্তি ধরে এই পবিত্র কোরআন।

কোরআন—৩:২৬, ১১০, ১৩৯।

স্বয়ং রসুলে আকরাম মহানবী হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বলেন—"নবী ও রসুলগণকে বাদ দিলে, আবুবকর অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর মানুষের মুখের উপর সূর্য উদিত হয়নি। এঁদেরকে বাদ দিলে আবুবকরই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ্ আমার বুকে যা নিক্ষেপ করেছেন, আমি তা আবুবকরের বুকে নিক্ষেপ করেছি।"

হযরত ওমর ফারুক বলেন—"ইসলামের খিদমতে কেউই আবুবকরকে অতিক্রম করতে পারবে না।"

হযরত ওসমান বলেন—"হে আবুবকর! আমি কি খলিফার পদে হযরত ওমরের নামটি লিখে দেব।" "কাগজটা দাও, আমিই লিখে দিই।" অন্তিম শয়নে আবুবকর বলেন।

হযরত আলি বলেন—"স্বয়ং হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পর আবুবকর ও ওমর শ্রেষ্ঠ মুসলমান ছিলেন।"

মওলানা মহম্মদ আলি বলেন—"চারিত্রিক নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবুবকরের স্থান মহানবীর পরই।"

হযরত আবুবকর বলেন—"আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ নই, আপনাদের সকলেরই সাহায্য ও পরামর্শ আমার কাম্য।"

আমরা বলি—হযরত আবুবকর ইসলামের ত্রাণকর্তা।

হযরত আবুবকর (রাঃ)
কেন মহানবীর জীবন ছায়া
কেন ইসলামের প্রথম খলিফা

প্রাণিজগৎ, জীবজগৎ, মনুষ্যজগৎ বা অন্যান্য সকল জগতে আমরা অনায়াসে, অতি সহজে একটি জিনিস লক্ষ্য করি—সঙ্গী বা সাথী। এই সঙ্গী বা সাথী হওয়াটা নির্ভর করে আপন আপন প্রকৃতির ওপর। আপন আপন প্রকৃতির মধ্যে কোন সহজাত গুণ বা দোষ না থাকলে, ঐ শ্রেণীর সঙ্গী বা সাথী হওয়া যায় না। কোথাও কোথাও জোর করে হলেও, ঐ সঙ্গ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। এটা সকল জগতেই চিরন্তন সত্য রূপে প্রতিভাত। এবাব আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে থাকবো, কি করে, কোন্ পথে হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মতো মহাজীবনের 'জীবনছায়াব' ও ইসলামের প্রথম খলিফার অচিন্ত্যনীয় গৌরব ও সম্মান লাভ করলেন।

মহানবী (সাঃ) নবী হওয়ার পরই যে আবুবকর তাঁর মহান সান্নিধ্য লাভ করলেন বা ভালবাসলেন, ঠিক তা নয়। বরং মহানবীর জীবনসূচিব সূচনা হতেই শিশু আবুবকর তাঁকে চরমভাবেই ভালবেসেছিলেন। এবার আমরা লক্ষ্য করছি দুইটি মহাজীবনের প্রকৃতিধারা, স্বভাবসিদ্ধ ধারা। প্রকৃতির কোলেই যেন একে অন্যের অতীব আপন হয়ে গেল। কোথাও বা তাঁরা শিশুজীবনেব খেলার সাথী, কোথাও বা তাঁরা বাল্যকালের মাঠের সাথী। যে শিশুটির সঙ্গলাভ করে পুণ্যাত্মা আবুবকর একদিন সমগ্র মুসলিম জাহানের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় দুর্গে চিরবন্দী হলেন, যাঁর শাশ্বত সম্মানে মহাকাল মাথা নুইয়ে দিয়েছে, যাঁর অমরত্বকে আড়াল করে, যাঁর সম্মানকে মলিন করে, স্বয়ং স্রষ্টা ব্যতীত, সৃষ্ট জগতের কোন কিছুই আজও এ স্পর্ধা রাখে না। যে শিশুটির দৌলতে আবুবকরের দুর্লভ মানবজীবনের এই মহাজয়, সে জয়ের কোন তুলনা নেই, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেই মানব শিশুটির ও ভাবীকালের মহানবীর জীবন সূচনার প্রকৃতি-ধারা কেমন ছিল—

জন্ম যখন মরুজগতে ধরার মাটি ধন্য
পথহারা এক হরিণী তখন বিশ্ব তোমার জন্য।
তোমার কথা বলতে গিয়ে বলেন আল্লাহ্ ফেরেস্তাগণ—
মহান খোদার নূর যে তুমি তোমার নূরে বিশ্ব-সৃজন।
অপূর্ব এক সৃষ্টি যোগে বিশ্ব সৃষ্টি পূর্ণ হয়
মানবাকাশে তোমার উদয় চন্দ্র যেথা মলিন রয়।
জীবনসূচীর সূচনা হতে তোমার শুভ সকল কাজ
শুচির বাগে সুন্দরেতে গোলাপে যেন দিতেছে লাজ।

কোবআন—৩:১৪৪, ৪:১৬৫, ৫:১৫, ৭:১৫৮, ১৭:১০৫, ২১:১০৭, ২৫:৫৬, ২৬:৮, ৩৩:৪০, ৫৬, ৩৪:২৮, ৪১:৬।

তাহলে এখন আমরা লক্ষ্য করছি, হযরত আবুবকর এমন একটি মানবশিশুর সাথে আপনা হতেই জড়িয়ে পড়লেন, যে শিশুটির চরিত্র-মাধুর্য, স্বভাব-সৌন্দর্য আকাশের পূর্ণ চন্দ্রকেও মলিন করে। জগতের ফুটন্ত শিশির ধোয়া প্রভাত গোলাপকেও ম্লান করে, লজ্জা দেয়। এইখানেই মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সাথে ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর শিশুজীবনের আপন আপন প্রকৃতিগত মনের সহজাত মিলন ঘটে গেল। এ মিলনছিল—স্বভাবের মিলন, চরিত্রের মিলন, মনের মিলন, সৌন্দর্যবোধের মিলন, শান্তি কামনার মিলন, সঙ্গে সঙ্গে শিশুজীবনের খেলার মিলন, খাওয়ার মিলন, থাকার মিলন, একত্রে শোয়ার মিলন। এককথায় দুটি শিশুর মনোজগতের পূর্ণ মিলন।

জন্ম ও মৃত্যুর দিক থেকেও আবুবকর যেন মহানবীকে অনুসরণ করলেন। মহানবী যেখানে ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আবুবকর সেখানে ৫৭২ খ্রীঃ। মৃত্যুর দিক থেকেও ঠিক একই প্রবণতা লক্ষ্য করছি। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহানবীর তিরোধান বছর, ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ আবুবকরের জীবন লীলার সমাপ্তি বছর। উভয়েরই আগমন ও অন্তর্ধান যেন একই সময় সীমান্তে বাঁধা। কি অপূর্ব মিলন! কি রহস্যময় মিল! এই মিলন, এই মিল কোন মানুষই ঠিক করতে পারে না। কেননা "কেউই জানে না, কখন কোথায় কিভাবে মৃত্যুবরণ করবে।" কোরআন সুরা লোকমান—৩১:৩৪।

লুটিয়ে পড়ে জীবনতরী
জীবন নদীর জানে না কেউ
এপার হতে ওপারে নেয়
কখন সে যে কেমন ঢেউ।

বংশ বা গোত্রের দিক থেকে লক্ষ্য করি আরবের সম্রান্ত কোরেশ বংশে দু'জনেরই জন্ম। শিশু হতে কৈশোরে, কৈশোর হতে যৌবনে দু'জনেই পদার্পণ করলেন। এই শিশুকাল হতে যৌবন পর্যন্ত সেদিনের জঘন্যতম আরব সমাজের কোন কিছুই তাঁদের স্পর্শ করতে পারল না। এইদিক থেকে দু'জনেই ছিলেন সমগ্র আরব সমাজের বিরলতম ব্যতিক্রম।

হযরত আবুবকর ছিলেন মূলত কাপড়ের ব্যবসায়ী। মহানবী ছিলেন চাচা আবু তালেবের সহযোগী ব্যবসায়ী। পরবর্তীকালে বিবি খাদিজার ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক বা কর্ণধার, কিছু পরে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী । এই সময়েই আরম্ভ হয়েছিল মহানবীর মহান জীবনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাধনা। কোন এক অজ্ঞাত লোকের আহ্বানে তিনি যেন আকুল ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আধ্যাত্মিকতার তটদেশে দাঁড়িয়ে তাঁর এই গভীর আকুলতা ও ব্যাকুলতা সিদ্ধিলাভ করল ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রীস্টাব্দে।

এবার অবতীর্ণ হলো আল্লাহর 'ওহী' প্রত্যাদেশ। আরম্ভ হলো সত্যের

মহাপরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় কে প্রথম ঝাঁপ দেবে, কার নাম সারা বিশ্বে চিরদিন প্রথম হওয়ার গৌরব লাভ করবে, কে সেই 'মহীয়ান', কে সেই মহীয়সী, কে সেই গরীয়ান, কে সেই গরীয়সী। এই অগ্নিপরীক্ষায় মহিলা জগতের মধ্যে প্রথম উত্তীর্ণা হওয়ার গৌরব যিনি লাভ করলেন, তিনি স্বয়ং মহানবীর জীবন-সঙ্গিনী বিবি খাদিজা। পুরুষকুলের মধ্যে প্রথম যিনি তিনিই হযরত আবুবকর। শিশুজীবনের খেলার সাথী, বাল্যকালের সঙ্গী, যৌবনের বন্ধু আবুবকর আজ ঐশী জগতেও মহানবীর প্রথম সঙ্গী। কি ওতপ্রোত, কি নিবিড় সম্পর্ক!

অতঃপর মক্কার মাটিতে সুদীর্ঘ ১৩ বছর কাল মহানবীর কঠিন হতে কঠিনতম সংগ্রামের জীবন। অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন, একের পর এক সকল কিছুই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মহানবীর পাশে দাঁড়িয়ে এমন কোন অত্যাচার নেই, যার সম্মুখীন হতে হলো না আবুবকরকে। অকাতরে সহ্য করলেন সব অত্যাচার, কেবলমাত্র মহানবীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য। অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল হত্যার ষড়যন্ত্রে, নির্মূল করার মূলমন্ত্রে, বধ্যভূমি রচনা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতে; তখনই নেমে এল আল্লাহ্‌র অমোঘ নির্দেশ দেশ বা জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করার জন্য। মহানবী প্রস্তুত হলেন দেশত্যাগে। এই ঘোর বিপদে, ঘোর অন্ধকারে কে তাঁর সঙ্গী! ছায়ারূপে দেখা দিলেন আবুবকর। নিবিড় অন্ধকারে শত দুষমনের মাঝে মাত্র দু'জনের যাত্রা—মহানবী ও আবুবকর। সওর পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল গুহাতে মাত্র দু'জনই মহানবী ও আবুবকর। শত শত শত্রু ঘেরা, অগণিত শত্রু পশ্চাতে রেখে মদিনার পথেও মাত্র দু'জন—মহানবী ও আবুবকর। সঙ্গে শুধু মাথার ওপরে আল্লাহ্‌। তখন ৬২২ খ্রীস্টাব্দ।

এবার আরম্ভ হল মদিনার জীবন। মহানবীর মক্কার জীবন ছিল সহ্য ও ধৈর্যের জীবন। এখন মদিনার জীবনে আরম্ভ হল সংগ্রামময় জীবন। কিন্তু এই সংগ্রামের গভীর তলদেশে ছিল প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, ক্ষমা ও দয়ার জীবন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবন। কি অপূর্ব জীবন, কি অপূর্ব আদর্শ। জীবনের প্রথমার্ধে সহ্য ও ধৈর্য, আবার জীবনের শেষার্ধে ক্ষমা ও দয়া।

তোমারে ধরিয়া ধন্য জগৎভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি।

কোরআনঃ সূরা আহ্‌যাব্‌—৩৩:৪৬।

এখন আমরা একবার আবুবকরের জীবন লক্ষ্য করি। যে জীবনকে অবলোকন করছি—কোথাও পবিত্র কোরআন পাঠে ক্রন্দনরত জীবন, কোথাও কোন গরিবের পাশে দয়ার জীবন, কোথাও কোন অপরাধীর পাশে ক্ষমার জীবন,

কোথাও কোন ক্ষুধার্তের পাশে দাতার জীবন। আমরা এক সাথে দুটি মহাজীবনকেই লক্ষ্য করছি। একটি যেন সাগর স্বরূপ, অন্যটি যেন তার বুকে মিলিত হওয়ার জন্য খরস্রোত বেগবান নদী স্বরূপ। দুটি চরিত্রেই লক্ষ্য করছি এক অনন্যসাধারণ লক্ষণ। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান নির্ণয়ে, আল্লাহ্‌র পথে উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে আহ্বানে কোথাও তাঁরা কুসুম অপেক্ষা কোমল, কোথাও তাঁরা বজ্র অপেক্ষা কঠোর। মহানবীর সমগ্র জীবন এবং আবুবকরের সাধারণ জীবন হতে খেলাফত জীবন এটাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

মক্কার কোরেশগণ মহানবীকে মক্কা হতে বিতাড়িত করেও নিষ্কৃতি দেয়নি। মদিনার মাটিতে আক্রমণ করেছে বারবার। বদর যুদ্ধ হতে আরম্ভ করে মহানবীর জীবনে এমন কোন যুদ্ধ বা সঙ্কটকাল দেখি না, যেখানে আবুবকরকে তাঁর ছায়ারূপে দেখি না। এত বড় বিশ্বস্ত অনুসারী, এত বড় সার্থক অনুগামী, এত বড় সত্যের অনুভবকারী আমরা সমগ্র ইসলাম জগতে আর দ্বিতীয়টি দেখি না। সাধারণ মানুষের মতো মহানবীর কোন প্রাণহীন ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো না। অর্থাৎ তাঁর কোন ছায়া ছিল না। তিনি ছিলেন নুর অর্থাৎ আলো। আলোর কোন ছায়া থাকে না। আবুবকর ছিলেন তাঁর প্রাণময় ছায়া। ছায়া যেমন তার মূলকে অনুসরণ করে, আবুবকর ঠিক তেমনি তাঁর মূল মহানবীকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছিলেন।

তাই মহানবী তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে রোগশয্যায় মদিনার মসজেদ-ই-নববীর সমস্ত দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন মাত্র একটি দরজা বাদে। যেটিকে উল্লেখ করলেন আবুবকরের দরজা। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন তাঁর পরিবর্তে মসজেদে ইমামতি করবে, নামাজ পরিচালনা করবে আবুবকর। তখন সকলেই বুঝতে পারল আবুবকরের মান কোথায়, স্থান কোথায়, মহিমা কোথায়। এইভাবে মহানবী তাঁর জীবিতকালেই আবুবকরকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিলেন। কোমল প্রাণ আবুবকর বারবার এই গুরুদায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বয়ং বিবি আয়েশা বারবার মহানবীকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পিতা কোমলহৃদয় আবুবকরকে এই গুরুভার না দেওয়ার জন্য, কিন্তু মহানবী তাঁর দেওয়া নির্দেশে অবিচল ছিলেন। মহানবী জীবনে বহুবার বলে গেছেন—তিনি যা কিছু করেন, সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে। এইদিক থেকেও আমরা লক্ষ্য করি হযরত আবুবকর যে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন, এর পশ্চাতেও ছিল সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্‌রই গুপ্ত ইচ্ছা, অতঃপর মহানবীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সর্বশেষে সর্বমানবের বা আম-জনসাধারণের অকৃত্রিম ও আন্তরিক সর্বসম্মতি রায় হযরত আবুবকর প্রথম খলিফা।

•হযরত আবুবকর খেলাফতের আসনে প্রথম অধিষ্ঠিত হয়েই মহান আল্লাহ্‌র নিকট অতীব বিনীত চিত্তে মোনাজাত করলেন, আজ তিনি যে গৌরবজনক

গুরুদায়িত্ব লাভ করলেন, আগামীকালের দিনগুলোতে তিনি যেন তার সম্মানজনক সমাধান রচনা করতে পারেন। সম্মুখে সমস্ত মুসলিম ভাইদের সম্বোধন করে তাঁর কণ্ঠে যেন বিদ্রোহী কবি নজরুলের ঐ ছন্দটি দূর অতীতে বেজে উঠল,——

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

আজও যেন হযরত আবুবকরের ঐ কণ্ঠ মুসলিম জাহানে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় দিবারাত্রি বেজেই চলেছে।

বলো হে বিজয়ী বীর আমার সে আল্লাহ্
ধরিবে মিজান যেই জীবনের পাল্লা
ঝঞ্ঝা বিপদে যেই তরণীর মাল্লা
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা-শরীক আল্লাহ্।
মানবের তরে শুধু মানুষ তো হিল্লা
করিবে যাহাই করুক করিবে সে আল্লাহ্।
বল হে পুণ্যের দাঁড়ি ভারী হবে পাল্লা—
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা-শরীক আল্লাহ।

উপসংহার : সমগ্র আরব সমাজে স্বয়ং মহানবীর পর যে ব্যক্তিটি ইসলামের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে এককথায় এক বাক্যে নিজ জীবনকেই নিঃসংশয়ে দান করেছিলেন, উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিই আবুবকর। মহানবীর পর যে ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ এক নিমিষে ইসলামের সেবায় দান করেছিলেন, তিনিই আবুবকর। তাহলে লক্ষ্য করার মতো বিষয়, এক হাতে জীবন ও অন্য হাতে জীবনের সব সম্পদ, এই দুটোকেই যিনি একসাথে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন, তিনিই একমাত্র আবুবকর। যাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সুতরাং তিনিই যে ইসলামের সর্বপ্রথম খলিফা হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তাই তিনি মহানবীর জীবিতকালেই তাঁর নির্দেশেই মসজিদে-নববীর নামাজের ইমামতির (বা পরিচালনা করার) মহাগৌরব লাভ করেছিলেন। এখানেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই মুসলিম জাহানে মহানবীর পর আবুবকর প্রথম খলিফা ও চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানব।

বংশ-পরিচয় ও ব্যক্তি পরিচয়ে আতীক আবুবকর

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়েকটি বংশ সর্বাধিক পরিচিত, তাদের মধ্যে আরবের কোরেশ বংশ অন্যতম। এই বংশেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহর সর্বশেষ দূত মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশেরই একটি শাখার নাম বনি তায়েম। এই বংশে হযরত আবুবকর-জন্মগ্রহণ করেন। প্রাক্ (৫৭২ খ্রীঃ) ইসলামি যুগে আবুবকর আব্দুল কাবা ও আতীক নামেও পরিচিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নামকরণ হয় আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ

আল্লাহর দাস। তাঁর কুনিয়াৎ বা ডাকনাম ছিল আবুবকর। এই নামেই তিনি সর্মাধক পরিচিত ছিলেন। এখনও তাই। ঐতিহাসিকগণ এই নামটির তিনটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন, আবুবকর শব্দের অর্থ কুমারীর পিতা, যখন তাঁর নামটি বড় কাফ্ দিয়ে লেখা হয়; আবার কেউ বলেন এর অর্থ গাভীর পিতা, অর্থাৎ নামটি যখন ছোট কাফ্ যোগে লেখা হয়। কোরআন শরীফের দ্বিতীয় সুরাটির নাম 'বাকারাহ' অর্থাৎ গাভী, আবার কেউ বলেন এর অর্থ উটের পিতা, এখানে উটকে ওদেশে গাভীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আবুবকরের পিতার নাম ছিল উসমান। তাঁর কুনিয়াৎ বা ডাকনাম ছিল আবু কুহাফা। তিনি ডাকনামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সালমা, এঁর কুনিয়াৎ বা ডাকনাম ছিল উম্মুল খায়ের। মক্কায় অবস্থানকালে আবুবকর দুটো বিয়ে করেছিলেন; প্রথমা স্ত্রীর নাম কুতাইলা, এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম উম্মে রুমান। কুতাইলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পুত্র আব্দুল্লাহ ও কন্যা আস্মা। উম্মে রুমানের গর্ভে জন্ম নেন পুত্র আব্দুর রহমান ও কন্যা আয়েশা।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও আবুবকর একই কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের দু'জনেরই উপ-গোত্র দুটি হাশিম ও তায়িম ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলে যায়। এঁদের দুজনেরই ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন - মোররাহ।

মোররহ

↓	↓
কিলার	তায়িম
↓	↓
কুসাই	সায়াদ
↓	↓
আব্দুল মন্নাফ	কায়ার
↓	↓
হাশিম	আমর
↓	↓
আব্দুল মোত্তালিব	আমীর
↓	↓
আব্দুল্লাহ	আবু কাহাফা
↓	↓
হযরত মহম্মদ(দঃ)	হযরত আবুবকর(রাঃ)

রহস্যাবৃত জন্মকাল ও জীবনধারা :

মহানবী ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এর দু' বছর কয়েক মাস পরে আবুবকর জন্মগ্রহণ করেন। আবার মহানবীর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন

করার পর আবুবকর দু'বছর কয়েক মাসের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেকেই মনে করেন যে দু'জনের জীবনকাল একেবারেই এক ছিল। তাই এই দু'জনের জন্ম ও মৃত্যুকালকে রহস্যাবৃত বলা হয়ে থাকে। উভয়েরই জন্ম-মৃত্যু দু' বছর কয়েক মাসের ব্যবধানে না ঘটলে কি অপরিসীম ক্ষতি হতো, তা পরবর্তী ঘটনাকে লক্ষ্য করলেই সহজেই বোঝা যায়। কেননা মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আরবের অবস্থা আবার কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, যা বর্ণনাতীত।

দশ বছর মদিনার বুকে কর্মবহুল জীবন যাপনের পর মহানবীর জীবনের অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এল। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ৮ জুন সোমবার তিনি পরলোকগমন করলেন। মহানবীর বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোন উত্তরাধিকারের কথা কেউ চিন্তাই করেননি বা করতে পারেননি। তাই মহানবীর মৃত্যুতে সমগ্র আরবের অবস্থা দাঁড়ায় রাখালবিহীন এক মেষপাল। সারা মদিনা, সারা আরব হা-হা করে উঠল। নবীর শহর আজ নবীবিহীন। আজ মহানবী নীরব। আজ মহান আল্লাহও নীরব। ওহীর দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হল। সকলেই আজ জ্ঞানহারা, অভিভাবক হারা। এমনকি হযরত ওমরের মতো মানুষও আজ জ্ঞানহারা। এই মহাক্ষণে যিনি ডুবন্ত-প্রায় তরীর কাণ্ডারী রূপে দাঁড়ান, তিনিই হযরত আবুবকর।

এই মহাক্ষণে হযরত আবুবকর নবীরূপে দেখা দিতে না পারলেও নবরূপে দেখা দিলেন। শোকে-দুঃখে জ্ঞানহারা ওমরকে সম্বোধন করে সকলকেই বললেন—"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহম্মদ (দঃ)-এর এবাদত করত, সে জানুক মহম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর এবাদত করত, তারা জানুক, আল্লাহ্ চিরজীবী, তিনি কখনও মরেন না। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—মহম্মদ একজন দূত ব্যতীত কেহ নহেন, তাঁর পূর্বেও বহু দূত অতীত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পথ হতে বিমুখ হবে! আল্লাহ্ আরো বলেন—হে মহম্মদ, তোমাকে ও তাদের সকলকেই মরতে হবে। কেননা প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। কোরআন—২১ : ৩৫, ৫৫ : ২৬-২৭।

এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই জ্ঞান ফিরে এল। বিশেষ করে ওমরের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সমগ্র আরব আবুবকরের মুখে কোরআনের এই কথাগুলোকে যেন নতুন ভাবে অনুধাবন করল। তাই আবুবকর নবীর পরে নতুন পৃথিবীতে যেন এবার নবরূপে দেখা দিলেন। সূর্য সবেমাত্র অস্তমিত হয়েছে, তখনও পশ্চিম আকাশ রক্তিমাভ লালে লাল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দেখা দিল সন্ধ্যাতারা—আবুবকর। সমগ্র মুসলিম জাহানে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তমান হলেন আবুবকর। নবী না হয়েও নবীর গুরুভার ও গুরুদায়িত্বকে কাঁধে নেওয়ার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—হযরত

আবুবকর। একটি মানুষের মধ্যে অসংখ্য গুণরাশির সমাবেশ ঘটলে, আল্লাহর অকুণ্ঠ রহমত মাথায় থাকলে, তবেই তিনি এ হেন নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। হযরত আবুবকর তাই ইসলাম জগতে একটি নজিরবিহীন বিরল ব্যক্তিত্ব।

সেদিনের আরব সমাজে আবুবকর:

সেদিনের আরব সমাজকে এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়—কলহের কুরুক্ষেত্র, অশান্তির আখড়া, শাসক, শাসন, আইন-কানুন, রীতি-নীতি বলতে কিছুই ছিল না। এর পরিবর্তে ছিল দুর্বার বিশৃঙ্খলা। বনের পশুকেও হার মানিয়েছিল তাদের পাশবিকতা। ধর্মকে কেন্দ্র করে তারা আরম্ভ করেছিল আপন আপন মনগড়া ব্যবসা। নানা দেবদেবীর নামে নানা প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করাই ছিল তাদের একমাত্র ধর্ম। মনুষ্যত্ব, মানবতা, নৈতিকতা, সভ্যতা, সৌন্দর্যবোধ, স্নেহ-মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, এককথায় যে মানবীয় গুণগুলো মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে, মানুষকে একদিন চরম মনুষ্যত্ব দান করে, এগুলো ছিল সেদিনের আরব সমাজে একেবারেই অপরিচিত। কোথাও কন্যা হত্যা, কোথাও ব্যভিচারের মুক্ত লীলা বা প্রদর্শনী, কোথাও বিধবাদের নিয়ে কল্পনাতীত পশু আচরণ, কোথাও বিবাহ নামে লোমহর্ষক জঘন্য কাজ, কোথাও জুয়া ও মদ্যপানের খোলা ময়দান, কোথাও গরিবের প্রতি নিষ্ঠুরতার নির্মম আঘাত, কোথাও নারীর প্রতি অভাবনীয় অত্যাচার। অতি সংক্ষেপে এই ছিল সেদিনের আরব সমাজ। এই সমাজেই হযরত আবুবকর ছিলেন আপন ব্যক্তিজীবনে প্রভূত গুণরাশিতে গরীয়ান, এবং মনুষ্যত্বে মহীয়ান।

এইভাবে জীবনের প্রথম হতেই মহান আবুবকরের চরিত্রে মহত্ত্বর লক্ষণগুলো গোলাপের পাপড়ি ছাড়ার মতো সমাজ জীবনে একের পর এক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। আমরা আবুবকরের সময় তদানিন্তন আরব সমাজের যে কলঙ্কময় চিত্রটি দেখলাম, তা আবুবকরের নিষ্কলুষ চরিত্রকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। বরং একদিন আবুবকরের মধুর চরিত্রই তাঁর দূষিত সমাজকে স্পর্শ করেছিল, দুষ্ট মুক্ত করেছিল, প্রভাবান্বিত কবেছিল। চির সত্যবাদী, চির ন্যায়নিষ্ঠ, চির চরিত্রবান আবুবকর একদিন যে মহানবীর প্রথম উম্মতের গৌরব অর্জন করবেন, এতো খুবই স্বাভাবিক কথা। একদিন তিনি যে ইসলামের প্রথম খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করবেন, এতো মহানন্দের কথা।

আবুবকর ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের সম্ভ্রান্ত সন্তান। বাল্যকাল হতেই তিনি কাপড়ের ব্যবসায় নিজকে নিযুক্ত করেন। ব্যবসাক্ষেত্রে তিনি যে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেখানে সমগ্র আরব তাঁর মহান নীতি প্রদর্শনে

একেবারেই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাহলে লক্ষ্য করছি কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কর্মবীর। সততার সাথে তাঁর নিরলস সাধনা একদিন আবুবকরকে একজন ধনী-সন্তানে পরিণত করল। প্রচুর অর্থ জীবনে রোজগার করেছিলেন। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করার বিষয়, ঐ ধনভাণ্ডার তিনি কোন্ পথে ব্যয় করলেন, আরব সমাজে সেদিন নানা পথ খোলা, এককথায় অমিতব্যয়িতার কোন সীমা ছিল না। পাপের পথ চিরদিনই পিচ্ছিল ও নিম্নগামী। এই পিচ্ছিল পথে পয়সার সাথে কোথায় যেন একটি সহজাত মিল রয়ে গেছে। মহান আবুবকরের হাতে ছিল প্রচুর পয়সা, এবং আরব সমাজে ছিল অগণিত পিচ্ছিল ও নিম্নগামী পথ। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে তিনি ঐ সমস্ত পথকে পরিত্যাগ করে পবিত্র ও পূত পথের পথিক হলেন, তা তাঁর অনন্যসাধারণ চরিত্র বল। এই বলে বলীয়ান হয়েই তিনি তার সমাজের সকল দুর্গতকে দেখতে আরম্ভ করলেন, এ যেন দুর্গত মানবের মহান কাণ্ডারী। কোন হাতে দান, কোন হাতে দয়া, কোন হাতে ক্ষমা, কোন হাতে মায়া রচনা করল এক মহান ব্যক্তিত্ব। সবার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লুটিয়ে পড়ল তাঁর করতলে। এককথায় সমগ্র আরব বলে উঠল, হে আবুবকর, তুমি আরবের আতিক, তুমি আমাদেব দাতা। তাঁর শারীরিক গঠনও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, খুব বড় একটা দেহধারী ছিলেন না। রং ছিল গৌরবর্ণ, ললাট ছিল প্রশস্ত, নাসিকা ছিল উন্নত, মাথা ছিল বড়, চক্ষুদ্বয় ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ প্রলম্বিত বাহু ইত্যাদি তাঁর দেহকে করেছিল সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। মানুষের মনে তাঁকে দেখা মাত্র এক নজরেই সম্ভ্রম জাগ্রত।

স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে:

আবুবকর জীবনে সর্বমোট চারটি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম দুটি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে দুটো মদিনাতে। প্রথমা স্ত্রীর নাম কুতায়লা, তাঁর দুটি মাত্র সন্তান আব্দুল্লাহ ও আসমা। কুতায়লা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে রুমান। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মালক ইবনে কানানার বংশোদ্ভূত মহিলা। ইনি মদিনাতে মারা যান। উম্মে রুমান একটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে যান-আব্দুর রহমান ও বিবি আয়েশা। বিবি আয়েশা পরবর্তীকালে মহানবীর সহধর্মিনী। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর নাম—আসমা, যাঁর গর্ভে পুত্র মহম্মদের জন্ম। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী উম্মে হাবিবা, যাঁর পিতার নাম খারিজ, মদিনার অধিবাসী। তাঁর একটি কন্যা ছিল, যাঁর নাম উম্মে কুলসুম। আসমা হজরতের হিজরাত কালে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন কাজ কৃতিত্বের সাথেই সমাধা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মদিনাতে হযরত যুবাইয়ের সাথে তাঁর বিবাহ

হয়। তারও পরবর্তীকালে উমাইয়া খেলাফতে খলিফা আব্দুল মালিকের সময় তাঁর নির্মম সেনাপতি হাজ্জাজ কর্তৃক পুত্র আব্দুল্লাহর বিদেহী মস্তক অতীব বৃদ্ধা মাতা ঐ আসমার নিকট উপঢৌকন রূপে প্রেরিত হয়ে ইসলামের ইতিহাসকে চির কলঙ্কিত করে।

ইসলাম গ্রহণের সময় আবুবকরের নিকট ৪০ (চল্লিশ) হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। তিনি ঐ সমুদয় অর্থ ইসলামের সেবায় ব্যয় করেন। পরে মদিনা আসার কালে মাত্র পাঁচ হাজার ছিল। সেটাও ইসলামের সেবায় অকাতরে দান করেন। খেলাফতকালেও আবুবকরের ছিল ফকিরের জীবন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। দুইটি জীবন নদী ।।

আল-আমিন
আল-সিদ্দিক

আল্-আমিন

তদানিন্তন আরব সমাজে সমগ্র আরববাসী যেন দূর ও নিকট হতে লক্ষ্য করছিল তাদের অসভ্য সমাজ জীবনে দুইটি সুসভ্য জীবননদী যেন একই মুখে ধাবমান। সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান নদীধারাকে যেমন কোন কিছুই রোধ করতে পারে না, ঠিক অনুরূপ ভাবেই ঐ দুটি জীবননদী কোন এক অজানা লোকের আহ্বানে মহাসত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এই দুটির একটি মহা নদী ছিল—স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। জীবনের শুভ জন্মলগ্ন হতেই তাঁর যেন ব্রতই ছিল সত্যের প্রকাশ, সুন্দরের বিকাশ। শুধুমাত্র আরব নয়, জগৎ তমশারাশিকে বিদূরীত করে এ বিশ্বকে জ্ঞান ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। বিশ্ব-মানব সমাজের এমন কোন শ্রেষ্ঠতম গুণরাশি ছিল না, যেগুলো তাঁর বুকের কোণে পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। এইদিক থেকে বলতে গেলে মহানবী (সাঃ) ছিলেন বিশ্ব-মানব সমাজের একটি ফুলের বাগান, যে বাগানটিতে একদিন ধীরে ধীরে সমস্ত বন-ফুল, সমস্ত বিশ্বফুল, সমস্ত মনের ফুল, সমস্ত কুঁড়ি ও পাপড়ি শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র আরব যেন এই বাগানটিকে, এই উজ্জ্বল দীপশিখাটিকে একাগ্রচিত্তে দূর ও নিকট হতে অবলোকন করছিল। সমগ্র আরবে সাড়া পড়ে গেল। সবার দৃষ্টি তাঁরই দিকে। সর্বত্র আলোচনা তাঁরই বিষয়। এই সমাজে, এই পরিবেশে—এ কোন্ মানব! এই একটি জিজ্ঞাসাই আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকেই যেন পাগল করে তুলল। সকলেই যেন মোহাভিভূত, অবাক সকলেই যেন পতঙ্গের ন্যায় অনিমিখ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে ঐ একটি উজ্জ্বল দীপশিখার দিকে। দূর-দূরান্ত হতে দলে দলে মানুষ আসে শুধুমাত্র তাঁকে একবার দেখার জন্য, তাঁর মিষ্টি মুখের দুটি কথা শুনে ধন্য হবার জন্য। দেখতে দেখতে এমন একটি দিন এসে গেল, যখন জনস্রোত তাঁর পিতামাতার দেওয়া আদরের নামটিকেই বাদ দিলেন। কি আশ্চর্য, কি অচিন্ত্যনীয়। সকলেই সাদরে, শ্রদ্ধাভরে তাঁকে

একটি নতুন নামে ডাকতে আরম্ভ করলেন—আল-আমিন, চির সত্যবাদী, চির সুন্দর, চির বিশ্বাসী। আচারে-বিচারে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, দ্বন্দ্বে-কলহে, সকলেরই কাম্য ব্যক্তি—আল্-আমিন।

দয়ার সাগর তুমি দীন দুনিয়ার
বহন করিয়া তুমি বিশ্ব গুরুভার
বেগবান নদী তুমি বিশ্ব দরিয়ার
ধূলি-বালি ময়লা যত টানিয়া ধরার
জীবন করিলে পাত দূতরূপে যাঁর
তোমাতে তোমার বংশে রহমত তাঁহার।

কোরআন— ৩:১৫৯, ৪:৭৯, ১৬৫, ৯:১২৮, ১৫:১০, ১৬:৩৬, ২১:১০৭, ৩৩:২১, ৪৬, ৪৫:২০, ৪৮:৮, ৫৪:২২, ৩২, ৬৮:৫২।

আল-সিদ্দিক

দু'জনের সম্পর্ক :

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) যে যুগে (৫৭০-৬৩২-৩৪) আরবের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই যুগটিকে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ বা অন্ধকারের বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়ে থাকে। এই নামকরণ হতেই বোঝা যাচ্ছে তখনকার দিনে আরবের সামাজিক চিত্রটা কেমন ছিল। মানব চরিত্রের এমন কোন জঘন্য দিক ছিল না যে দিকটি তখন আরব সমাজে ফুটে ওঠেনি। তারা তখনকার দিনে যে অসামাজিক কাজগুলো করতো, তার কোন কোনটির নামোচ্চারোণ করলেও মানব-মাত্রেই শরীরে শিহরণ জাগে। মদ-ভাঙ, মেয়েছেলে, জুয়া, মারামারি, খুনোখুনি ইত্যাদি ছিল তাদের অসামাজিক জীবনের প্রধান উপকরণ। সামাজিক রীতি-নীতি, বিধি-বন্ধন, আচার-বিচাব, আইন-কানুন প্রভৃতির কোন নামগন্ধই ছিল না। এই যুগে এই সমাজে হযরত আবুবকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মগতভাবে তার জীবনধারাকে আমরা দু'ভাগে দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ধারাতে তিনি জন্মগতভাবেই সদা সত্যবাদী, বিনয়ী, নম্র, স্বভাবে সুন্দর, চরিত্রে নির্মল, ব্যবহারে অতীব অমায়িক। শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, দয়া-মায়া, ক্ষমা, পরোপকার ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। দ্বিতীয় ধারাতে দেখি তিনি কোনদিনই সমাজের কোন প্রচলিত যে কোন জঘন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। আরব সমাজের ঐ জঘন্যতম কাজগুলোকে তিনি যে কেবল ঘৃণাই করতেন, তা নয়। ঐগুলোকে উত্থানের

পথে মানব সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতেন। তাই এগুলোকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রতিনিয়ত। তখনকার দিনে আরব সমাজ ছিল অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক। এই ব্যাপারেও আবুবকর ছিলেন বিরল ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ। তিনি জীবনে একদিনও ঐরূপ কোন পূজা-অর্চনা করেননি। তার উপাস্য ছিল একমাত্র এক নিরাকার আল্লাহ্। এই পথেরই জীবন-জিজ্ঞাসা মহান আবুবকরকে একদিন করল মহামানব, মহাপুরুষ; সবার উর্ধ্বে মহানবীর একান্ত সহচর। এই পথেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার সার্থক উত্তর, তাঁর পথের উৎকৃষ্টতম পাথেয়। এই পথেই তিনি হলেন ইসলাম জগতের প্রথম উম্মত ও বিশ্ব-পথিক। পরবর্তীকালে যে পথিককে অনুসরণ করেই কত পথিকই না ধন্য হলেন, কত সাধারণ জীবন অসাধারণ হলেন, কত হতভাগা ভাগ্যবান হলেন। আবুবকর ছিলেন এমনই এক স্পর্শমণি।

সেদিনের অন্ধকার যুগের আরব, অসভ্য আরব, বর্বর আরব লক্ষ্য করল আবুবকরের জীবনধারাকে। যে জীবনটিতে দেখতে পেল সত্যকথা, সত্য ভাষণ, বিনয়, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা, বাৎসল্য-বদান্যতা, ন্যায়-নিষ্ঠা প্রভৃতি প্রভূত গুণের সমাবেশ। যে যুগে অন্ধকারময় আরবে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছিল না বললেই চলে। সামান্য দু'-একজনের মধ্যে ওটা একেবারেই সীমিত ছিল। এই সীমিত জনের মধ্যেই ছিলেন আবুবকর একজন। একদিন তাঁর জ্ঞান-গরিমা, আচার-ব্যবহার সমগ্র আরববাসীকেই এমনভাবেই মুগ্ধ করল, তারা যেন তাদের বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, ঝগড়া-কলহে একটি আশ্রয়স্থল খুঁজে পেল। দলে দলে মানুষ আসতে থাকল আবুবকরের নিকট। দুর্বল শ্রেণীর মানুষ সবলের কবল থেকে বাঁচার জন্য ছুটে আসত তাঁর নিকট। আবার সমাজে যাঁরা ছিলেন সবল, প্রতাপশালী, শক্তিমান পুরুষ, তাঁরাও কিন্তু আবুবকরকে শ্রদ্ধা জানাতে কোনদিনই ভুল করেননি। যত বড়ই শক্তিশালী আরব হোন, সকলেই এক বাক্যে আবুবকরকে শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন, আন্তরিকভাবেই সম্মান দেখাতেন। এই দুর্লভ সম্মান ছিল তাঁর প্রাপ্য, তিনি তা পেয়েছিলেন। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, জাতি-ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেবই নিকট তিনি ছিলেন সম্মানের পাত্র। এই সম্মানের পেছনে ছিল তাঁর অসাধারণ ত্যাগ ও তিতিক্ষা। এমনকি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতে, অন্যায়ের প্রতিবাদে, দুর্বলের রক্ষণে, সবলের অত্যাচারে বিনীত পুরুষ আবুবকর জীবনের বিনিময়েও সিংহের ন্যায় গর্জিয়ে উঠতেন। সার্বিকভাবে সমাজ সংস্কারে আবুবকরের দান ছিল অসামান্য, অফুরন্ত। এইখানেই আবুবকরের জীবন রহস্য-বিধৃত। এইখানেই আবুবকর অন্ধকার আরবের আশ্রয়স্থল। এইখানেই বিজ্ঞ আবুবকর অজ্ঞ আরবের অনির্বাণ দীপশিখা।

তখনও মহানবী নবী হননি, তখনও আবুবকর তাঁর শিষ্য হননি। কিন্তু

দু'জনেরই জীবনধারা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে আনল। দু'জনে একই জিনিসকে ঘৃণা করেছিলেন, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আবার একই বস্তুকে দু'জনেই ভালোবেসেছিলেন যা সুন্দর, যা ন্যায়নিষ্ঠ। উভয়েরই অনুপম চরিত্রের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য উভয়কেই যেন করল একে অপরের অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম বন্ধু। বালক আবুবকর যখন আরবের কিছুমাত্র সুন্দর-স্বভাব বিশিষ্ট বালকদের সন্ধান পেলেন, তিনি তাঁদের সাথেই তখন হতে ওঠা-বসা, খেলা-ধুলা করতেন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন এক মহাখনি। যে খনিটিতে ছিল অসংখ্য গুণরাশি। যে গুণরাশি মানুষকে করে জীবশ্রেষ্ঠ, মহীয়ান, গরীয়ান। দুর্লভ মানব জন্মকে দেয় মহিমার স্বাদ, যে গুণরাশিগুলো মানুষের পশুত্বকে তার জীবন সংগ্রামে একেবারেই সংহার করে তাকে দেব মহিমায় মনুষ্যত্বের মহা আলোকে তুলে ধরে। আরবের এই মহাখনিটি ছিল---স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)। এই মহাখনিটির স্বাদ ও সন্ধান পাওয়ার পর হতে শিশু আবুবকর, বালক আবুবকর, যুবক আবুবকর, প্রৌঢ় আবুবকর, বৃদ্ধ আবুবকব চিরদিনের জন্য তাঁকে আপন হৃদয়-দুর্গে বন্দী করলেন। এইখানেই আবুবকরের আপসহীন জীবনের মহিমা আবার বিধৃত হল। এই জগতের কোন কিছুই তাঁকে মহানবীর নিকট হতে কোনদিনই এক পলকের জন্যও দূরে সরিযে নিতে পারেনি। তাই আবুবকর ছিলেন মহানবীর জীবনে এক আপোসহীন চিরসঙ্গী, চিরছায়া। এই মধুর সম্পর্ক, এই স্বর্গীয় ভাব ও ভালবাসা, এই অকৃত্রিম আন্তরিকতা, এই গভীর জীবন-বোধ আরো প্রাণময় হলো, আরো প্রগাঢ় হল, দুদিনের সম্পর্ক চিরদিনের সম্পর্কে স্থান পেল। দু'জনের সম্পর্ক দু'জাহানের সম্পর্কে সম্পর্কিত হল, বিশ্বজনের সম্পর্কে সংবর্ধিত হল, এপারের সম্পর্ক ওপারের সম্পর্কে উন্নীত হল, এককথায় এ সম্পর্ক এপার ওপার দু'পারকে প্লাবিত করে তুলল যখন মহানবী তুলে ধরলেন ইসলামের শান্তি পতাকা, ঘোষণা করলেন আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবাদত কর, উপাসনা কর। তাঁর কোন শরিক নেই। জীবনকে সুন্দর কর, শোভাময় কর, সমাজকে শান্তিময় কর, সমৃদ্ধিময় কর। জগতের ইতিহাসে মহানবী ও আবুবকরের এই সম্পর্ক শুধু দুর্লভই নয়, বিরলই নয়, বরং চির দৃষ্টান্তবিহীন সম্পর্ক।

ইসলাম বরণ :

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বজোড়া মানবতার মৃত্যুবাণকে রুখে দিতে, এবং মরণমুখী মনুষ্যত্বে বীরের প্রাণকে সঞ্চার করতে। আল্লাহ্‌র এই পরম অনুগ্রহ লাভ করার পূর্ব অধ্যায়ে মহানবীর জীবনে আমরা কি দেখতে পাই। তাঁর স্বভাব, চরিত্র, আচার ব্যবহাব

সকল কিছুকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। তাঁর নবুয়ত বা প্রত্যাদেশ লাভের দিনটি যতই ঘনিয়ে আসতে থাকল, তিনি যেন ততই আপন সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়তে থাকলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নির্জন নীরব প্রান্তে একাকী হিরা গুহায় কাটাতে থাকলেন। এইভাবে তিনি সাধনার অতি উচ্চস্তরে পৌঁছাতে থাকলেন, জাগতিক জ্ঞান যেন রহিত হতো, কোন অজানা লোকে গভীরভাবে ডুবে যেতেন।

মনের বিকার শুধু মনীষা বিজ্ঞান
তোমাকে চিনিতে চায় তব দেওয়া জ্ঞান।
নহে মোর মানবিক যুক্তি-তর্ক জ্ঞান
যেখানে দিয়েছ ধরা সে তো শুধু ধ্যান।

এই বিপুল ধ্যানে তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন—মহাসত্য কি, বিশ্ব-রহস্য কি, বিশ্ব-স্রষ্টা কে। এইভাবে একদিন যখন মহানবী (৬১০ খ্রীঃ) চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন, লাভ করলেন নতুন জীবন, নবুয়ত। লাভ করলেন রেসালতের গুরুদায়িত্ব, নবুয়তের গুরুভার।

রেসালতের গুরুদায়িত্বে নবুয়তের ভার
সফলতায় রেখে গেছ সবুজ স্বাক্ষর।

একদা মহানবী যখন হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন, ফেরেশতা জিবরাইল হিরা গুহায় এলেন। বললেন—তিনি ফেরেশতা জিবরাইল, আল্লাহর নির্দেশেই এখানে এসেছেন। আমাকে আল্লাহ্ এই প্রত্যাদেশ-সহ পাঠিয়েছেন, আপনি এটি প্রচার করুন:- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ,"। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ।

এই কথা যখন মক্কার মাটিতে আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকল, তখন মক্কাবাসীগণ একদিন যাঁকে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, আজ তাঁকেই এমন কোন অকথ্য ভাষা ছিল না, যে ভাষাতে গালি-গালাজ করেনি। এমন কোন অত্যাচার ছিল না, অবিচার ছিল না, যা নির্বিচারে তাঁর ওপর বর্ষিত হয়নি। মহানবী আকুলভাবে মানুষকে আহ্বান করলেন—এক আল্লাহর দিকে, সুন্দর জীবন যাপনের দিকে, সভ্য সমাজ গড়ার জন্য, আপন আপন মনুষ্যত্বকে বাঁচানোর জন্য, দুর্লভ মানব জীবনের স্বাদ আস্বাদনের জন্য। মহানবী দিনের পর দিন যতই আকুল হয়ে উঠলেন আল্লাহর মহিমা প্রচারে, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে; অসভ্য আরববাসীগণ ততই যেন অধীর হয়ে উঠল, অস্থির হয়ে উঠল মহানবীকে বাধা দেওয়ার জন্য নানা দিক থেকে, শেষ পর্যন্ত বধ করার জন্যও।

ইসলামের এই প্রাথমিক দিকে, শুভ সূচনার দিকে আবুবকর কয়েকদিন ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে ছিলেন। তিনি আসা মাত্র আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

তাঁর সাথে দেখা করলেন। এবং তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এই মাত্র কয়েকদিন পূর্বের জগদ্বিখ্যাত আমিনকে আজ আরববাসী এমন নোংরা ভাষায় সম্বোধন করতে থাকল, আবুবকর তাতে অবাক বিস্ময় বোধ করলেন। তিনি বারবার সকলেরই নিকট একটি মাত্রই জিজ্ঞাসা রাখলেন,—গতকাল যিনি তোমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সম্মান লাভ করেছিলেন, একদিনে আজ এমনকি ঘটল যে, তিনি নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছালেন। এ কথার সদুত্তর কোন আরববাসীই তাঁকে দিতে পারল না। তখন তিনি অস্থির চিত্তে সকলকেই বললেন—আমাকে বুঝতে দাও। তিনি কালবিলম্ব না করে সোজা সরাসরি মহানবীর নিকট হাজির হলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি কোন নতুন ধর্মমত প্রচার করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন,—ঐ ধর্মমতটা কি? তখন মহানবী উত্তর দিলেন,—' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসলুল্লাহ'। তখন আবুবকর মহানবীকে আর তাঁর চোখের পলক ফেলার সময় না দিয়ে বলে উঠলেন—'আশহাদু আন্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু'—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এবং আরও সাক্ষী দিচ্ছি, নিশ্চয় মহম্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।"

কালবিলম্ব না করে আবুবকরের এই যে ইসলাম গ্রহণ, এর পশ্চাতে দেখি গভীর রহস্য। মানুষের নিজস্ব বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা, যুক্তি-তর্ক ইত্যাদি মানুষকে পরিচালনা করে থাকে। একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আবুবকরেব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি, তাঁকে যেন পরিচালনা করছে কোন এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ও গভীর জ্ঞান এবং নিবিড় ধ্যান। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং মহানবী বলেন—"আমি যখনই ইসলাম সম্পর্কে কাউকে কোন কথা বলেছি, দ্বিধাহীন চিত্তে কেউই গ্রহণ করেনি; কিছু না কিছু সন্দেহ ও সঙ্কোচ মনে রেখে গ্রহণ করেছে। কিন্তু একমাত্র আবুবকরকেই দেখেছি বিনা দ্বিধায়, বিনা চিন্তায় আমার যে কোন আদেশ ও নিষেধকে অন্তর যোগে সানন্দে গ্রহণ করেছে।"—সুয়ুতি।

ইসলামের প্রথম তিনজন:

মহানবী (সাঃ) হিরা গুহাতে আল্লাহর বাণী লাভ করার পর দ্রুতগতিতে বাড়ি ফিরে আসেন। প্রকম্পিত হৃদয়ে, দেহমনে যখন প্রচণ্ড শিহরণ, সেই অবস্থাতে জীবন সঙ্গিনী বিবি খাদিজাকে সংক্ষেপে হিরা গুহার কাহিনী বর্ণনা করেন। তখন উম্মুল মোমেনিন বিবি খাদিজাতুল কোবরা এক পলকও দেরি না করে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম জগতের সর্বপ্রথম ব্যক্তির গৌরব ও সম্মান লাভ করেন।

অতঃপর আমরা লক্ষ্য করছি তখন বালক হযরত আলী মহানবীর গৃহেই থাকতেন। মহানবী ঘর হতে বের হওয়া মাত্র তিনি যখন জানতে পারলেন—হিরা গুহার কাহিনী, তিনিও তখন মুহূর্তকাল বিলম্ব না করেই ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন। এইভাবে ইসলাম মহানবীর আপন বাড়িতেই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এরপর ইসলাম ঘর থেকে বাইরে এল।

মহানবী এখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলামের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। মহানবীর জীবনের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবুবকর যখনই একথা শুনলেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বিনা চিন্তায়, বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এখন আমরা লক্ষ্য করছি—নর-নারী উভয় কুলের মধ্যে প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি বিবি খাদিজাতুল কোবরা। তখনকার দিনে যে নাবালক সন্তানটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালের শেরেখোদা হযরত আলী হায়দার। এবার সাবালক পুরুষকুলের মধ্যে যিনি ইসলামের প্রথম স্থান বা সবার মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করলেন, তিনিই পরবর্তীকালের সওর গুহার স্বনামধন্য সঙ্গী এবং ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক।

সত্যের সাথে মিথ্যার প্রথম সংঘর্ষ:

এবার মহানবী (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশমতো ঘরে-বাইরে ইসলাম প্রচারে রত হলেন। তখনকার প্রকৃত কথা বলতে গেলে—মাথার ওপরে আল্লাহ্, ঘরে বিবি খাদিজা ও বাইরে একমাত্র আবুবকর ব্যতীত আর কেউই নেই। বিশ্বের ইতিহাসে বহু ধর্মীয় পুরুষ বা দূত এসেছেন। তাঁদের সকলেরই শিষ্য বা অনুচরবৃন্দ ছিল। কিন্তু ধর্মীয় জগতে যেমন হযরত মহম্মদ (দঃ) এর কোন তুলনা নেই, তেমনি শিষ্য বা অনুচর জগতেও হযরত আবুবকরেরও কোন তুলনা নেই। মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্ব বিশ্ব-ধর্মীয় পুরুষদের যেমন ম্লান করেছে, আবুবকরের একনিষ্ঠ ভক্তি ও ভালোবাসাও তেমনি বিশ্ব-অনুচরবৃন্দকেও ম্লান করে দিয়েছে। মহানবীর মহা বিপদে তিনি পরম বন্ধুরূপে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে ছিলেন মহানবীর ছায়াস্বরূপ।

হযরত আবুবকর সাধারণ অনুচরবৃন্দের মতো ইসলামকে গ্রহণ করেন নি। অনেকে শিক্ষকতাকে পেশা রূপে গ্রহণ করেন, আবার অনেকে শিক্ষকতাকে ব্রত রূপে বরণ করেন। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলে পার্থক্য এইরূপই দাঁড়ায়। তাই আবুবকর ইসলামকে বরণ করেছিলেন মহান হৃদয় দিয়ে। স্বয়ং মহানবী নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন ইসলামের সেবায়, আর আবুবকর নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন মহানবীর সেবায়। তাঁই আমরা লক্ষ্য করি, যেদিন মহানবী প্রথম

প্রকাশ্যে কাবা মন্দিরের দুয়ারে আল্লাহ্‌র তৌহিদের বা একত্ববাদেব বাণী ঘোষণা করলেন, তখন অসভ্য কোরেশগণ পতঙ্গের ন্যায় মহানবীর ওপর পতিত হল, অকথ্য গালিগালাজ, অমানুষিক বিদ্রূপ, ঠাট্টা, টিটকারী ইত্যাদির পর আরম্ভ হল দৈহিক নির্যাতন, ভীষণ প্রহার। মহানবী জ্ঞান হারালেন। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আবুবকর বিদ্যুতের ন্যায় সেখানে হাজির হয়ে মোকাবিলা করলেন। তিনিও ভীষণভাবে প্রহৃত হলেন। এইভাবেই ইসলামের প্রথম সংঘর্ষের প্রথম বেদনাকেই তিনি মহানবীর সাথে সমভাবে ভাগ করে ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় আসনটিকে অধিকার করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বহুলোক ছুটে এল, আত্মীয়-স্বজন দৌড়ে এল। সকলেই উভযকেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন। যখন আবুবকরের জ্ঞান ফিরে এল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, মহানবী কোথায়। তিনি কেমন আছেন। তখন তাঁর মাতা উম্মুল খায়ের তাঁকে উত্তর দিলেন, তিনি যায়েদ ইবনে আকরামার গৃহে আছেন এবং ভাল আছেন। আবুবকর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ মায়ের সাথে আকরামার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। স্বচক্ষে মহানবীর অবস্থা দেখে তবেই তিনি শান্ত হলেন এবং শান্তি পেলেন।

মহীয়সী মাতা উম্মুল খায়েব এই ঘটনা লক্ষ্য করে বললেন— সত্য প্রচারের জন্যই এই শাস্তি যদি পেতে হয়, তাহলে আমিও ঐ সত্যকে আজই এখনই বরণ করলাম। এই বলে আবুবকরের মাতা আর কালবিলম্ব না করেই তৌহিদের কলেমা পাঠ করে নিজকে ধন্য করলেন। এই সত্য গ্রহণে, মহিয়সী মহিলা কারো সাথে এমনকি স্বামীর সাথেও কোন পরামর্শ করেননি। বিবি খাদিজার পর তাঁর মতো মহীয়সী মহিলার ইসলাম গ্রহণকে আমরা যথেষ্ট মূল্য দিই। কেননা তখন ইসলামের না ছিল জনবল, না ছিল ধনবল। না ছিল অতীত, না ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই অবস্থাতে সুযোগ্য পুত্র আবুবকর যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মাতা তা অপেক্ষা কম কিছু দিলেন না। জননী মহীয়সী না হলে মহীয়ানপুত্র জন্মাবেন কি করে। ধন্য মায়ের কোল, ধন্য মায়ের গর্ভ, যে-মা আবুবকরের মতো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

গাইবে যখন তোমার শিশু মানবতার উচ্চগান
ভাস্‌বে উঠে সেই সাগরে পদ্মরাগে মাতার প্রাণ।

ইসলামের প্রথম সংঘর্ষে আমরা পেলাম মহান আবুবকরকে এবং তাঁর মহীয়সী মা-কে। প্রতিটি প্রথম ক্ষেত্রেই যেন আমরা আবুবকরকে পাচ্ছি। সুতরাং ইসলামের প্রথম খলিফা পদেও তাঁকে পাওয়াটা কেবলমাত্র স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতই হয়নি, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মহানবীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও এখানে রূপ লাভ করেছে।

ইসলাম প্রচারেও মহানবীর প্রথম সাথী আবুবকর:

হযরত আবুবকর প্রথম জীবনেই মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে প্রচণ্ড-ভাবে ভাল বেসেছিলেন—তাঁর চরিত্র গুণে মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী জীবনে তাঁর মিশন ইসলামকে বিশ্বাস করেছিলেন আন্তরিকভাবেই মানব সমাজের মুক্তি ও কল্যাণের পথ হিসাবে। যাঁকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তিনি স্বয়ং মহম্মদ (দঃ)। যাকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তা স্বয়ং ইসলাম। এই ভালবাসা ও বিশ্বাসকে আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতে এমন একজনও জন্ম নেননি, যিনি (হযরত আবুবকরকে) অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাই মহানবীর প্রতি ভালোবাসা ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসে মহান আবুবকর আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আমরা এখন বিলক্ষণ বুঝতে পারছি, হযরত আবুবকর কেবলমাত্র নিছক ভালোবাসা ও মামুলী বিশ্বাসেই তাঁর কর্তব্য সমাধা করেন নি। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুসন্তান। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর ধনরত্নও সংগ্রহ করেছিলেন। ইসলাম ছিল তাঁর জীবনে সবার ওপরে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাই তিনি অকাতরে অবলীলাক্রমে তাঁর সমস্ত ধনরাশিকে একদিন ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেমন মামুলি বিশ্বাস ও ভালবাসাতেই তাঁর মহান দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তেমনি তিনি নিজের জন্য যে ইসলামকে ভাল মনে করেছিলেন, অপরের জন্যও তাকে মঙ্গলময় মনে করেছিলেন। এই মঙ্গলময় ইসলামকে বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দিতে তাঁর চেষ্টার কোন অবধি ছিল না। এইখানেই ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে তাঁর দান ছিল অপরিমিত। অনেক সময় অনেক মানুষ অনেক কিছুর দ্বারা নিজকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতাপান্বিত করতে চায়, অনেক সময় ভুল বোঝে ও নিজ মতবাদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু পুণ্যাত্মা আবুবকর এখানে বিরল ব্যতিক্রমজনিত সিংহপুরুষ। তিনি শুধুমাত্র একটি কথাই অন্তরে বুঝেছিলেন—ইসলাম মানব কল্যাণের দিশারী, সুতরাং মানুষের কল্যাণে তাকে দশ দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়াটা একান্ত কর্তব্য। এই কর্তব্য বোধই মহান আবুবকরকে করল ইসলাম প্রচারে মহানবীর প্রথম সাথী।

পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে—আবুবকর ছিলেন আরবের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধবও ছিলেন। এই বন্ধুমহলেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। ধীরে ধীরে আবুবকর তাঁর মতবাদ বা বিশ্বাসটিকে বন্ধু মহলেও প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর আন্তরিক আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিলেন। হযরত ওসমান বিন আফফান, হযরত সায়াদ ইবনে ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের প্রমুখ মক্কার কোরেশ প্রধানগণের যে ইসলাম গ্রহণ, তা মূলত আবুবকরের আন্তরিক আহ্বানেরই

একান্ত অবদান। এখানে আবুবকর ইসলামের মহাসৌধের যেন মহান রাজমিস্ত্রী, একটির পর একটি ইট এনে সৌধটিতে সংযোজনা করছেন। যেখানে আল্লাহ্র রসুল স্বয়ং মহানবী ছিলেন মহাসৌধের মহা পরিদর্শক ও প্রতিষ্ঠাতা।

পুণ্যাত্মা আবুবকর শুধুমাত্র আরবের সম্ভ্রান্ত কুলকে ইসলামের প্রতি টেনে এনে ক্ষান্ত হতে পারলেন না, তিনি আকর্ষণ করলেন আরবের অগণিত অবহেলিত দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় নরনারীকেও। তদানীন্তন সারা বিশ্বে ছিল দাস প্রথার যুগ। অধিকাংশ গরিবই ছিল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। যখনই তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল, তখনই তাদের উপর পতিত হতে থাকল অত্যাচারের বজ্রাঘাত। এই অত্যাচার ছিল বর্ণনাতীত। কখনও কোন অসহায় দাসকে ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখা হতো। যতক্ষণ না সে ইসলামকে অস্বীকার করত, বা পিপাসা ও ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ না করত; কখনও কোন অত্যাচারী প্রভু তার দাসকে জ্বলন্ত অঙ্গারে ফেলে দিত, কখনও কোন দাসকে সতেজ ঘোড়ার লেজে বেঁধে ঘোড়াটিকে দ্রুত বেগে ছোটানো হত, যতক্ষণ না হতভাগার শরীর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে না যেত; কখনও কোন দাসকে ফুটন্ত পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হতো, কখনও জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, কখনও উত্তপ্ত বালির ওপর বুকে পাথর চাপিয়ে রাখা হতো, দাসীদের ওপরও সমভাবে অত্যাচার চলত। কখনও কোন দাসীকে উলঙ্গ করে মক্কার শহরে ঘোরানো হতো, কখনও যুবতী দাসীকে প্রকাশ্যে দশজন মাতাল পামরের যৌনক্ষুধার শিকার করা হতো, কখনও দুটো ঘোড়াকে দাসীর দু'পায়ে বেঁধে বিপরীত দিকে ছুটিয়ে দেওয়া হতো, কখনও জীবন্ত অবস্থায় দুটো চোখই তুলে নেওয়া হতো, কখনও বা দু'টো হাতই কেটে দেওয়া হতো, কখনও বা দুটো পা-ই, কখনও বা দাসীর যুগল স্তন কর্তন, কখনও বা গরম সীসে দাসের কানে ঢালা হতো, কখনও বা যুবতী দাসীর গুপ্তাঙ্গে। ইসলাম গ্রহণ করলে এই ছিল সেদিনের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী। এ হেন হৃদয় বিদারক অত্যাচার, অমানুষিক লাঞ্ছনা, নির্মম নিপীড়ন, নিষ্ঠুর নির্যাতন প্রভৃতি সকল কিছুকে পশ্চাদপদ করে একদিন ইসলাম এগিয়ে গিয়েছিল। কোন জালেমের কোন জুলুমই তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। কোন বীরের কোন বীরত্বই তাকে বধ করতে পারেনি, শত বাধার, শত বন্ধনের, শত ষড়যন্ত্রের কোন শক্তিই তাকে গতিহীন করতে পারেনি। কেননা ইসলাম ছিল সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান নদীর ন্যায় মহাবেগবান, মহাখরস্রোতা।

আবুবকর আরবের সম্ভ্রান্ত কুলের বহুজনকে ইসলামের ছায়াতলে এনে হাজির করলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। এবার তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল অধঃপতিত অসহায় নর-নারীর প্রতি। তাদের ডাক দিলেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য। তারা তাঁর আন্তরিক ও অকৃত্রিম আহ্বানে

সাড়া দিল। আরম্ভ হল নির্যাতনের মহা পরীক্ষা। একের পর এক নির্যাতনের মহা পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে থাকলো, কেউ বা ক্ষতবিক্ষত দেহে, কেউ বা ধন-জন, মান-ইজ্জৎ-আবরু সমস্ত কিছুকে দিয়েই, কেউ বা প্রাণের বিনিময়েই। কি কঠিন পরীক্ষা। সম্মুখে কঠোর সাধক রাহ্‌মাতাল্লিল আ'লামিন স্বয়ং মহানবী (দঃ), যাঁর পাশে দণ্ডায়মান প্রচারে সাহায্যকারী, প্রসারে পরামর্শদাতা স্বয়ং আবুবকর (রাঃ)।

আবুবকর ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অত্যন্ত কোমল প্রাণ। তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠল অত্যাচার দেখে, তিনি ছুটে গেলেন দাস-দাসীদের প্রভু বা মালিকের নিকট। ব্যাকুলভাবে, করজোড়ে অনুরোধ করলেন মালিকদের, নিরপরাধ দাস-দাসীদের মুক্তি দিতে। যাদের শুধুমাত্র অপরাধ ছিল তারা বলেছিল আমাদের আল্লাহ্ (উপাস্য) এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। এই বলার জন্যই অনেকেরই প্রাণদণ্ডও হল। আবার অনেকেই আবুবকরের অনুরোধে মুক্তি পেল। অনেক মালিক মুক্তি দিতে অসম্মতি জানায় বিনা পয়সায়। তখন কোমল হৃদয় আবুবকর তাঁর সমস্ত ধন-মান-জনকে যেন এক নিঃশেষে নিয়োজিত করলেন দাস দাসীদের আজাদ বা স্বাধীন করার জন্য। বহু দাস-দাসীকে অনেক সময় অতি উচ্চমূল্যে ক্রয় করে মুক্তি দিলেন। তারাই আবার প্রাণের বিনিময়ে হলো ইসলামের মহাসৈনিক মহা খেদমদগার। ইসলাম প্রচারে আবুবকরের সদিচ্ছা যেন ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে ইসলামেরই বহু অজেয় বীর, বহু অমিত সেনা গড়ে তোলে। কি অপূর্ব সাধনা, কি অপূর্ব সফলতা, কি আন্তরিক ইচ্ছা, কি অন্তরের বেদনা বোধ।

বিমল বাসনা যার নাহি কোন ভয়
স্বয়ং মহিমাময় তার পাশে রয়।

কোরআন— ২৩:১, ৮৭:১৪

শত শত দাস-দাসীকে উদ্ধার করেছিলেন আবুবকর। সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। যাঁদের মধ্যে ছিলেন—জগদ্বিখ্যাত সাহাবী হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত খাব্বার (রাঃ) এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)। হযরত বেলালের নাম বা ঘটনা জানে না, এমন মুসলমান খুবই কম আছেন। তাঁর প্রভু ছিলেন একজন নিষ্ঠুর ইহুদি উমাইয়া বিন খালাফ। বেলাল ছিলেন একজন হাবসী গোলাম। উমাইয়া তার দাস বেলালকে ইসলাম ত্যাগের জন্য সকল প্রকারের বর্বরোচিত শাস্তি দিতে থাকল। উলঙ্গ বেলালকে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শুইয়ে বুকের ওপর প্রচণ্ড ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। এবং বিদ্রূপ সহকারে জিজ্ঞাসা করা হতো—বল, কি করবে। বেলাল উত্তর

দিতেন আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। এই কথা, এই ঘটনা কোমল প্রাণ আবুবকরের কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি কালবিলম্ব না করে হাজির হলেন উমাইয়া বিন খালাফের নিকট। অনুরোধ করলেন দাসকে মুক্তি দিতে। অনুরোধ ব্যর্থ হল। তখন তিনি নিরুপায় হয়েই অতি উচ্চমূল্যে বেলালকে ক্রয় করে আজাদ করে দিলেন।

পরবর্তীকালে ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর অন্যতম সাহাবীর সম্মান লাভ করেন। এবং ইসলামের প্রথম সমর বদর যুদ্ধে তাঁর অতীত দিনের মহা অত্যাচারী প্রভু উমাইয়া বিন খালাফের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে উমাইয়ার দেহ তার দূর অতীতের ক্রীতদাস হযরত বেলালের হাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর উত্তর। উমাইয়ার পুত্র আলিও একই যুদ্ধে একই জনের হাতে প্রাণ হারাল। হযরত বেলালের নাম-যশ-খ্যাতি ইসলাম জগতের যে স্থানটিতে অতুলনীয়, সেখানে তিনি মহানবী অনুমোদিত ইসলামের প্রথম ঐতিহাসিক মোয়াজ্জীন। ইসলামের এই ঐতিহাসিক মোয়াজ্জীন-সৃষ্টিতেও আবুবকরের দান চির সমুজ্জ্বল।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে
কৃতী দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।

হযরত আবুবকরের জীবনে এরূপ ঘটনা একের পর এক বহু ঘটে গেছে। সেগুলোকে সবিস্তারে বলতে গেলে বইয়ের কলেবর বহু গুণ বেড়ে যাবে। তাই দু'একটি বলেই শেষ করতে হয়। তাবুক যুদ্ধের সময় আগতপ্রায়। মহানবীর হাতে তেমন কিছু নেই। তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন, যে যা পার আমাকে সাহায্য কর। যার যা সামর্থে কুলালো সকলেই দিলেন। হযরত ওসমান ছিলেন ধনী ব্যক্তি। তিনি তাঁর ধনের প্রায় অর্ধেকেই এনে হাজির করলেন মহানবীর নিকট। কিন্তু হযরত আবুবকর তাঁর বাড়িতে যা কিছুই ছিল, সব কিছু নিয়ে হাজির হলেন মহানবীর সমীপে। মহানবী বুঝতে পারলেন আবুবকরের এই কাজকে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, ঘরে পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ! তিনি উত্তর দিলেন, ঘরে রেখে এসেছি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলকে। এই উত্তর শুনে স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, ইসলামের সেবায় কেউই আবুবকরকে অতিক্রম করতে পারবে না। পবিত্র কোরআন বলে—"বল নিশ্চয় আমার নামাজ (আরাধনা) ইবাদত (উপাসনা), এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।" সুরা আল-আনয়াম ৬:১৬২। কোরআনের এই পবিত্র আয়াতটি হযরত আবুবকরের জীবনে সার্থক রূপ লাভ করেছে। ইসলামের সেবায় আবুবকর শ্রেষ্ঠতম ত্যাগী পুরুষ।

সব কিছু সঁপে দাও তাঁহারই হাতে
দেখ শুধু ধৈর্য নিয়ে কি ফল তাতে
সুখ আছে শান্তি আছে স্বস্তি আছে যাতে
এক আল্লাহ্ অদ্বিতীয় অখণ্ডের হাতে। কোরআন—৬৫ : ৩

ক্ষত-বিক্ষত জ্ঞানহারা মহানবী, আঘাতপ্রাপ্ত অজ্ঞান আবুবকর

ইসলাম প্রচারের প্রথম তিন বছর :

মহানবী ইসলাম প্রচারে প্রথম তিনটি বছর প্রকাশ্যে বা জনসমাবেশে তেমন কিছু করেননি। মহাজ্ঞানী রসুলে করিম (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন, হঠাৎ বড় কিছু করা ঠিক না। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মনের মাটিকে আগেই তৈরি করতে। তাই প্রথম তিনটি বছর গোপনে, নীরবে, অপ্রকাশ্যে, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম কি চায়, সেটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। আরবে যে জঘন্যতম পরিবেশ বিরাজ করছিল, মহানবী সমাজ সংস্কারক হিসাবে তার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি শুধু আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, এইটুকু বলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। এর মূল তাৎপর্য যে সুন্দর, সমৃদ্ধিময়, শান্তিময় সমাজব্যবস্থা, এই নিগূঢ় সত্যটিকে তিনি তিন বছর যাবৎ নীরবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এতে জনমত ও জনশক্তি কিছু ইসলামে বৃদ্ধি পেল।

তিন বছরের পরের যুগ :

এই জনমত ও জনশক্তি চতুর্থ বছরে মহানবীকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকল। মহানবী তাদের কথায় এবার কর্ণপাত করলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ইসলাম কি চায়, তার মূল বক্তব্য কি। তখন কোরেশ প্রধানগণ চিন্তা করল, যদি এইভাবে বিনা বাধায় মহানবীকে তাঁর বক্তব্য প্রচারে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহলে তাদের পিতা-মাতার ধর্ম অচিরেই বিলোপ পাবে। তারা মহানবীকে বাধা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হল। আরম্ভ হলো অত্যাচার ও উৎপীড়নের পালা। আবুবকর পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সর্বদা মহানবীর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করলেন! সমস্ত বিপদের ঝুঁকি তিনি মাথায় নিলেন।

একদা আরব কোরেশগণ মিলিতভাবে একটি বিশেষ স্থানে গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন আছেন, কি করে মহানবীকে তাঁর প্রচার হতে, ব্রত হতে বিরত করা যায়। এই কার্য সমাধা করতে যে কোন প্রকারের কৌশল, ষড়যন্ত্র

গ্রহণ করতে তারা এক মারাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আজ তারা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হয় তারা থাকবে, কিংবা মহানবী থাকবেন। তাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল দুটো জিনিস এক সাথে আরবে থাকবে না। হেন কালে ঐ পথ ধরে মহানবী একাকী যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রে বসে কি যেন আলোচনা করছে। স্বভাবে সুন্দর, ব্যবহারে বিনম্র মহানবী চিন্তা করলেন, একবার ওদেরকে মহান আল্লাহর কথা বলে দেখি, কেননা তিনি ছিলেন প্রচারক, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এটা ছিল তাঁর মহান কর্তব্য। তিনি তাই কর্তব্যের খাতিবে তাদেরকে আল্লাহর কথা বলা মাত্র তারা অনতিবিলম্বে মহানবীর ওপরে নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে প্রচণ্ড প্রহাবে একেবারেই জ্ঞানহারা করে ফেলেন। আল্লাহর নবী ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছেন। একথা আবুবকরের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি আর কালবিলম্ব না করে সেখানে গমন করত অসভ্য কোরেশদের একাকীই সিংহবিক্রমে মোকাবিলা করলেন। বজ্রকণ্ঠে তিরস্কার করলেন মোশরেকদের। মহানবীকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠালেন। কিন্তু মোশরেকগণ কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকবকে সদলবলে আক্রমণ করে তাঁর শরীরকে রক্তাক্ত করে তোলে। এই পৈশাচিক ঘটনার কথা অন্যান্য মুসলমানদের কানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জীবন মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়েন। উদ্ধার করলেন আবুবকবকে। তিনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, মহানবী কোথায়, কেমন আছেন। ঐ সময় বহুবার এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঐদিনগুলোতে ক্ষত বিক্ষত মহানবীর পাশে ছিলেন আঘাতপ্রাপ্ত আবুবকর।

হযরত আবুবকর ও ইবনে দাগান

প্রাক-ইসলামি যুগে হযরত আবুবকর মক্কার কোরেশ বংশে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। এই নাম-যশ-খ্যাতির পেছনে তাঁর দুটি বিশেষ জিনিস ছিল। একটি তাঁর অগাধ ধনসম্পদ ও অন্যটি তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র। ইসলাম গ্রহণেব পর তাঁর নাম-যশ-খ্যাতি কমেনি, বরং বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর বেড়ে গেল অন্যান্য কোরেশদের ক্রোধ-রাগ-ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি। যেহেতু তিনি নিজ ব্যক্তি প্রভাব ও তাঁর বিপুল অর্থ দ্বারা ইসলাম প্রচারে মনে-প্রাণে সক্রিয়ভাবে অংশগহণ করেছিলেন। তিনি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আপন প্রভাবে প্রভাবান্বিত করে যেমন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় দাখিল করেছিলেন তেমনি অনেক অসহায় গরিব মানুষকে, ক্রীতদাস-দাসীকে আপন অর্থের (৩০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার) বিনিময়ে মুক্ত করে ইসলামে আসার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই নানাবিধ কারণে মক্কার কোরেশগণ আবুবকরের ওপর অগ্নিশর্মা হয়ে

পড়েন। তাঁর ওপর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল। কোমল প্রাণ মহানবীর হৃদয় যেন কেঁদে উঠল আবুবকরের ওপর অত্যাচার দেখে। তিনি তাঁকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর মক্কা ত্যাগের বা মহানবীর সঙ্গত্যাগের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহানবীর নির্দেশ তিনি অমান্য করতে পারেন না। একদিকে মহানবীর আদেশ ও অন্যদিকে আপন মনের ইচ্ছা। এই দুটোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অবশেষে মহানবীর আদেশকেই অন্তরের সাথে মেনে নিলেন আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করার জন্য।

আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদিন আবুবকর আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলেন। যখন তিনি 'বারকল গাবাত' নামক স্থানে পৌঁছালেন; তখন আকস্মিক ভাবেই তাঁর সাথে দেখা হল মক্কার কাবা গোত্রের নেতা ইবনুল দাগানের (দোগান্না/দোজানা) সাথে। তখন ইবনুল দাগান আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। উত্তরে আবুবকর জানালেন তাঁর সমস্ত দুঃখের কাহিনী। ইবনুল দাগান নিজেও ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, হৃদয়বান মানুষ। তিনি যেন আবুবকরের মতো মহান ব্যক্তির দেশত্যাগকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ইবনুল দাগান আবুবকরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁর মতো মানুষের দেশত্যাগ করাটা ঠিক হবে না। কোরেশগণ তাঁর প্রতি যে অত্যাচার করেছে, তা তারা একান্ত ভাবেই অন্যায় করেছে। তিনি বারবার আবুবকরকে কথা দিলেন, তিনি আবুবকর ও কোরেশদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে দেবেন যাতে ভবিষ্যতে আবুবকরের ওপর আব কোন অত্যাচর না হয়।

ইবনুল দাগানের একান্ত অনুরোধে আবুবকর আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হলেন। অতঃপর দুজনেই মক্কায় হাজির হলেন। একথা কিছুক্ষণের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ইবনুল দাগান সমস্ত কোরেশ প্রধানকে ডাক দিলেন। সকলেই একত্রিত হল। আবুবকরও হাজির থাকলেন। অতঃপর দাগান কোরেশ প্রধানকে সম্বোধন করে বললেন, সমগ্র মক্কাতে এমন কে আছে, যে ব্যক্তি আবুবকরের মতো মানুষের মহত্ত্বে ও সততায়, জ্ঞানে, বিচারে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, সহ্যে-ধৈর্যে, মমতায়-সংযমতায়, ন্যায়ে ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ নয়। এরূপ একটি মানুষকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সমগ্র মক্কাবাসীদের জন্য সত্যিকারেরই ভীষণ লজ্জার কথা। আবুবকর আত্মীয়-স্বজনের অতি আপন জন, বন্ধু-বান্ধবদের অতীব নিকট ব্যক্তি, ধনীর পরামর্শদাতা, গরিবের পিতামাতা, অসহায়ের একান্ত আশ্রয়স্থান। এরূপ একটি তুলনাবিহীন মানুষ দেশ থেকে চলে যাওয়া দেশের পক্ষে কত দুর্ভাগ্যের কথা। এককথায় তিনি দেশের গৌরব। এরূপ একটি মানুষকে অত্যাচার করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা

মহা অন্যায়, মহা পাপ। বরং এই শ্রেণীর কোন মানুষ স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতে চাইলেও দেশবাসীর উচিত তাঁকে সানুনয় অনুরোধ করেও আপন দেশে রাখা। অতঃপর সর্বশেষে ইবনুল দাগান কোরেশদের মতামত জানতে চাইলেন। তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় বক্তব্যে কোরেশদের মন যেন বিগলিত হল। তারা কথা দিল, তারা আর কোনদিন কোন অত্যাচার করবে না।

এই মীমাংসাতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কোরেশগণের পক্ষ হতে বলা হল, আবুবকর আপন বাড়িতে নামাজ ও আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগি করবেন। বাইরে প্রকাশ্যে কোথাও করবেন না, যাতে কোরেশ ছেলেমেয়েগণ বিপথগামী না হয়ে যায়। এইরূপ করলে কোরেশগণ আর কোনদিন আবুবকরের ওপর কোন অত্যাচার করবে না। আবুবকর মহানবীর পরামর্শমতো মক্কাতে থেকে গেলেন। এবং বাহির বাড়িতে একটি মসজিদ তৈরি কবে আল্লাহ্‌র এবাদত ও কোরআন শরীফ তেলায়াৎ (পাঠ) আরম্ভ করলেন। আবুবকর এত সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাঠ করতে পারতেন, যে কোন ব্যক্তি শুনলেই মোহিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এইভাবে তাঁর কোরআন পাঠ শুনে বহু কোরেশ ছেলেমেয়ের হৃদয় আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগল। তখন কোরেশগণ বুঝতে পারল বিপদ দূরে নয়। এবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। এবং তারা আবুবকরকে জানিয়ে দিল, তাঁর এই আচরণে তারা তাদের দেওয়া কথা আর রক্ষা করতে পারবে না।

এবার কোরেশগণ সদলবলে ইবনুল দাগানের ঘরে গিয়ে হাজির হল। তারা তাঁকে অভিযুক্ত করল কেন তিনি এরূপ একটি মানুষকে মক্কায় আমাদের প্রতিবেশীত্ব দিলেন। যিনি আপন কথা রক্ষা করতে জানেন না। তখন ইবনুল দাগান সঙ্গে সঙ্গে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোরেশদের আনা অভিযোগগুলো তুললে তিনি কালবিলম্ব না করেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আবুবকর জীবনে `কথা ভঙ্গ করেন না, মানুষকে কোনদিনই কোন কষ্ট দেন না। শঠতা, ষড়যন্ত্র কি জিনিস তিনি তাও কোনদিনই জানেন না। মানুষের উপকার ও হিতসাধন করাই তাঁর জীবনের মহান ব্রত। এই কথাগুলো আমার নয়, এই কথাগুলো আপনারই, আপনিই এই সেদিন মাত্র আমার সম্পর্কে এই কথাগুলোই কোরেশ প্রধানদের সম্মুখে সজোরে উচ্চারণ করেছিলেন। এখন যদি আপনার অসুবিধা হয় আমাকে প্রতিবেশীত্ব দিতে, আমাকে সাহায্য করতে, আমার বন্ধু হতে, তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আপনার দেওয়া সমস্ত জিনিস প্রত্যাহার করে নিন। কেননা আমি জানি, (১) কাফা বিল্লাহেশাহিদান, আল্লাহ্ আমার চলার পথে সাক্ষী রূপে যথেষ্ট। (২) কাফা বিল্লাহে ওলিয়ান, আল্লাহ্ আমার অবিভাবক রূপে যথেষ্ট।

(৩) কাফা বিল্লাহে নাসিরান, আল্লাহ্ সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। (৪) কাফা বিল্লাহে ওয়াকিলান, আল্লাহ্ আমার কার্য সম্পাদনকারী রূপে যথেষ্ট। অর্থাৎ আমি আপনার দেওয়া সমস্ত কিছু ফেরত দিলাম ও এক আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম।

যে জন নির্ভর করে একের 'পরে
তিনিই যথেষ্ট জানি তাহার তরে,

কোরআন: (১) ৪ : ৭৯, (২) ৪ : ৪৫, (৩) ৪ : ৪৫, (৪) ৪ : ৮১, ১৭১।

অতঃপর আবুবকর কোরেশদের পরম শত্রুতে পরিণত হলেন। আবুবকরের মনোবাঞ্ছা আল্লাহই পরিপূর্ণ করলেন। কেননা আবুবকর একদিনের জন্য মহানবীকে ত্যাগ করতে চাননি। পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাঁকে বাধ্য করেছিল মক্কা ত্যাগে। কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল মহানবীর নিকট। তাই আজ আমরা দেখলাম আবুবকরের মনের জোর, ইচ্ছার জয়। আজ তিনি আবার মহানবীর পাশে। আজ তাঁর আনন্দের সীমা নেই। দুঃখ-শোক-তাপ-যন্ত্রণা, অত্যাচার-অবিচার, ষড়যন্ত্র সবকিছুই চলছিল, কিন্তু কোন কিছুই তাঁর মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। তিনি একেবারেই দৃঢ় ছিলেন পাহাড়ের ন্যায়, প্রশান্ত ছিলেন মহা সাগরের ন্যায় মহানবীর পাশে। এখন আবার মহানবী ও আবুবকর সুখে-দুঃখে, চরম বিপদে পাশাপাশি। এই সময় অত্যাচার সীমা অতিক্রম করল। এককথায় মহানবী ও আবুবকরের এই অত্যাচারের চোটে দেওয়ালে যেন পিঠ ঠেকে গেল।

গিরি দুর্গে বন্দী আবুবকর

শেব বা আবু তালিব নামক গিরি দুর্গটি পূর্ব হতেই বনি হাশিম গোত্রের অধীনে ছিল। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর উর্ধ্বে উঠল, স্বয়ং মহানবীই একটি বিকল্প চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন—শেব গিরি দুর্গে তাঁর আপন লোকজনদের নিয়ে কিছুটা শান্তিতে থাকবেন। মহানবী আপনজনদের নিয়ে গিরি দুর্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণ মহানবীকে সদলবলে এক ঘরে করলেন। কোরেশগণ সমস্ত রকমের সামাজিক সম্পর্ক ও লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় যাবতীয় জিনিস বন্ধ করে দিল। সঙ্গে আবুবকরও তাঁর পরিবার-পরিজনগণ। অবস্থা এমনি ভয়াবহ রূপ ধারণ করল দিনের পর দিন সকলকে অনাহারে কাটাতে হতো। গাছের পাতা, শুকনো চামড়া প্রভৃতি খেয়ে দিন কাটাতে থাকল। শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করতে থাকে। সকলেরই যেন সহ্যের বাঁধ আজ ভেঙে যাচ্ছে। হেনকালে আবুবকরের

নেতৃত্বে কিছু কোরেশ বৃদ্ধের মন ও হৃদয় বিগলিত হল। তাঁরা ছিলেন মুতিম বিন আদি, আবুল বখতারি ইবনে হাশিম, জামাহ বিন আসওয়াদ, হাশিম বিন আমর এবং জুহাইর বিন উমাইয়া। আবুবকরের মাধ্যমে এঁদের প্রচেষ্টায় মহানবী আবার সদলবলে বন্দীমুক্ত হলেন। এই সময়টা মহানবী ও আবুবকরকে কি অসহনীয় দৈহিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। এই মহা দুর্দিনে মহানবীর পাশে ইসলাম প্রচারের প্রধান সহায়ক ও প্রধান পরামর্শদাতা রূপে যিনি ছিলেন, তিনিই আবুবকর।

নিঃস্ব জীবনে শুধু নৈতিক বল
তোমাকে পাহাড় হতেও করেছে সবল।
বিরামবিহীন অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ
এক আল্লাহ্ অদ্বিতীয়ের করিছে জয়গান।

সিদ্দিক আবুবকর

মহানবীর জীবনে এল এক মহাক্ষণ। এই মহাক্ষণেই তিনি স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে এলেন। এই মহাক্ষণটির নাম "মেরাজ"। যার অর্থ স্বর্গে আরোহণ। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলে—"তিনি পবিত্রতম, যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়েছিলেন—মাসজেদুল হারাম (খানায়ে কাবা) হতে মাসজেদুল আক্সা (বায়তুল মোকাদ্দস) পর্যন্ত, যার সীমাকে আমি সৌভাগ্য যুক্ত করেছি, যেন আমি তাকে কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" কোরআন-বনী ইজরাইল: ১৭:১।

ফজরের নামাজান্তে মহানবী তাঁর এই মেরাজের কথা সকল সাহাবীর মধ্যে ঘোষণা করলেন। একথা শুনে কেউ বা হতবাক, কেউ বা বিস্মিত, কেউ বা দ্বিধান্বিত, কেউ বা চিন্তিত। সকলেই ছুটে গেলেন আবুবকরের নিকট। তাঁকে সব কথা বললেন। তিনি সমস্ত কথা শুনে এককথায় বললেন—সত্য। দ্বিধাহীন চিত্তে আবার বললেন—এটি সত্য, পূর্ণ বিশ্বাস-সহ ঘোষণা করলেন—এটি সত্য। সকলেই আবার অবাক, হতভম্ব, হতবাক। মহানবীর মিশন ইসলামকে পুরুষকুলের মধ্যে প্রথম আলিঙ্গণ করেছিলেন আবুবকর। আবার আজ মেরাজের বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে প্রথম বিশ্বাসী সেই আবুবকর। মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি ঐ কথা বলেছেন। যখন তিনি বললেন—হ্যাঁ, তখন আবুবকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি আল্লাহর রসুল, আল্লাহর রসুল যা বলেন, সবই সত্য। তখন উত্তরে মহানবী বলেন—তুমি

সিদ্দিক (সত্যবাদী বিশ্বাসী)। এইদিন হতে আবুবকর জগতের বুকে সিদ্দিক নামে অভিহিত হলেন। এখন আমরা লক্ষ্য করছি—মহানবীর মহাজীবনের এমন কোন মহাক্ষণ নেই, মহাকাজ নেই, যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ আবুবকরে হলো না, এ কত বড় সৌভাগ্য, মহান আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ তাঁব মহানবীতে, আবার মহানবীর বহিঃপ্রকাশ তাঁর জীবন ছায়া আবুবকরে। আবুবকর তাঁব প্রাণকে পূর্ণ করে ফেলেছিলেন মহানবীকে সদাই সম্মুখে রেখে। তিনি জগতের সমস্ত কিছুকেই পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন একমাত্র মহানবীর জন্য।

"এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা।
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে —
তোমায় দিতে ঠাঁই।"

গীতাঞ্জলি-৬৬

[এই মেরাজ সম্পর্কে যদি কোন আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা বিস্তারিতভাবে জানতে চান, তাহলে তাঁকে লেখকের 'মহানবী' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 'মেরাজ' পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।]

গুহা মধ্যে গোপনে দু'জন

এইবার মহানবীর মক্কা জীবনের চরম পরিণতি এগিয়ে এল। মক্কার কোরেশ-কুল একেবারেই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে মহানবীকে নিয়ে। তারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—হয় মহানবী মক্কাতে থাকবেন, কিংবা কোরেশকুল সগৌরবে থাকবেন। সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাত্র বাকি সিদ্ধান্ত নিতে। অত্যাচারের এমন কোন অধ্যায় আর বাকি নেই, যাকে আবার প্রয়োগ করা যায়, আজ সকল কোরেশ সন্তানই যেন একমত—একটা কিছু কর। যা সকল অশান্তির চির যবনিকা টেনে দেবে। সকলেই এক একটি পরামর্শ দিল। কিন্তু কোনটাই টিকল না। অবশেষে টিকল—আবু জেহলের প্রখ্যাত প্রস্তাব, চোদ্দ গোত্রের চোদ্দজন বীর একত্রিত হোক মহানবীর দরজায়। প্রভাত-কালে মহানবী নামাজ পড়তে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ চোদ্দজন

বীর যুবকের চোদ্দটি বিশাল আরবী তরবারি এক সাথে মহানবীব নশ্বর শরীরকে নিমিষে চোদ্দ খণ্ড করে দেবে। এই প্রস্তাবটিই সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হল।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক ভেবে আল্লাহর নবী তাঁর লোকদের একের পর এক ইযাসরেবে (মদিনায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মক্কাতে তেমন আর কেউ ছিল না বললেই চলে, শুধুমাত্র আবুবকব ব্যতীত। আল্লাহব নবী আল্লাহরই নির্দেশের অপেক্ষায় মাত্র ছিলেন। আল্লাহও যেন অপেক্ষা করছিলেন—কোরেশগণ কতদূর আগাতে পারে।

পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখ সব ঘেরি'
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেরি। কোরআন—১:৩।

এবার মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন কোবেশদের গোপন কথা, সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যেতে। মহানবী সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হলেন মদিনার পথে যাত্রা করার জন্য। একথা কেউই জানত না, একমাত্র আবুবকব ব্যতীত। মহানবী তাকে এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন—হয়তো তুমি আমার সাথে থাকবে। আবুবকর এ কথা শুনে যেন আনন্দে আত্মহারা। মহাকাল, মহাক্ষণ, মহারাত্রি ঘনিয়ে এল। মহানবী তাঁর শয্যাতে তরুণ আলীকে ঘুমাবার যথাযথ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হলেন। হেনকালে আবুবকর হাজির। নিবিড় অন্ধকাব বাত্রি। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আবুবকর মহানবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ির দিকে রওনা হলেন। অথচ মহানবীর দরজায় ১৪ জন বীর যুবক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে কোরেশদের জটলা। এরই মাঝে আবুবকর মহানবীকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা কবল কে? আবুবকর উত্তর দিলেন, আমি আবুবকর। আবার প্রশ্ন, তোমার সঙ্গে কে? উত্তরে আবুবকর 'মহম্মদ' (দঃ)। কোরেশ কুল হো হো করে হেসে উঠল। তারা ভেবেছিল আবুবকর তাদের উপহাস করছে; কেননা যে মানুষটিকে হত্যার জন্য আজ সমস্ত মক্কাবাসী একত্রিত ও একমত, তাঁকে প্রকাশ্যে নিয়ে যায় কোন সাহসে। এটা উপহাস মাত্র। কোন কোন রাবী বা হাদিস বর্ণনাকারী এই রূপ বর্ণনা দিয়েছেন। আবার এই ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে লক্ষ্য করি "আমি ওদের সামনে ও পেছনে অন্তরাল স্থাপন করেছি, এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি, ফলে ওরা দেখতে পায না।" সূবা ইয়াসীন—৩৬:৯। এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি মানুষকে শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি বা যাবতীয় শক্তি দিয়েছেন, তিনি যে কোন মুহূর্তেই যে কোন শক্তিটিকেই কেড়ে নিতে পারেন। এইভাবেই তিনি তাঁর নবী

ও নবী-সহচরকে সাহায্য করলেন। হয়তো কেউ কেউ বলবেন সমগ্র মদিনার পথে এই সাহায্য তো দেখি না। কথাটা ঠিকই। আল্লাহ্ তাঁর নবীগণকে তখনই সাহায্য করেছেন, যখন প্রয়োজন মনে করেছেন। যাই হোক মহানবী আবুবকরের সাথে তাঁর বাড়িতে পৌঁছালেন। যেখানে তখন হাজির ছিল আবুবকরের পুত্র আব্দুল্লাহ, কন্যা আসমা ও আয়েশা।

কন্যা আসমা তাঁদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করে দিলেন। মহানবী পূর্বেই ঠিক করেছিলেন কিছু সময় মক্কার বাইরে গোপনে থাকবেন। যাতে মক্কার কোরেশকুল সঙ্গে সঙ্গে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের বিপদে ফেলতে না পারে। তাই করলেন মক্কার অদূরে সওর পাহাড়। এই পাহাড়ের গুহা মধ্যে দু'জনে গোপনে আশ্রয় নিলেন। আবুবকর প্রথম গুহার মধ্যে ঢুকে দেখে নিলেন। অতঃপর মহানবীকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের বিদায়বেলায় পুত্র ও কন্যাদের নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন তারা কিভাবে গোপনে রাত্রিকালে মহানবী ও পিতাকে খাবার দিয়ে আসবে। তারা তিনদিন ও তিন রাত এই নির্দেশ পালন করেছিল।

এদিকে সকালবেলায় কোরেশকুল হতবাক, হতভম্ব। নেই মহানবী, নেই অনুচর আবুবকর। বিছানাতে আলী একি দৃশ্য। মহানবী কোথায় গেলেন, কেমন করে গেলেন। সারা মক্কাতে হৈ হৈ রব পড়ে গেল। নিষ্ঠুর আবুজেহেল আবুবকরের বাড়িতে গিয়ে কন্যা আসমাকে জিজ্ঞাসা করায় কোন মনোমত উত্তর না পেয়ে বালিকার গালে সজোরে চপেটাঘাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কাতে ঘোষণা করা হলো যে কেউ মহানবীকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কার লোভে ছোট বড় সকলেই মরিয়া হয়ে উঠল।

এদিকে গুহা মধ্যে আবুবকর ও মহানবী। মহানবী অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। তাই আবুবকরের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবুবকর গুহা মধ্যে একটি গর্ত লক্ষ্য করে তাকে বন্ধ করার জন্য কিছু হাতের কাছে না পেয়ে নিজ পা দ্বারাই বন্ধ করলেন যাতে মহানবীর কোন বিপদ না ঘটে। কিন্তু ঐ গর্তে ছিল বিষধর সর্প, সে আবুবকরের পায়ে কামড়ে দেওয়ায়, আবুবকর ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। এমনকি আবুবকরের চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে। হঠাৎ কয়েক বিন্দু অশ্রু মহানবীর শরীরে পড়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন। যন্ত্রণার উপশম হল। কিছুক্ষণের মধ্যে গুহামুখে বন্য বড় মাকড়সা ডালপালার ওপর একটা জাল বুনে দিল। অতঃপর বন্য কবুতর ঐ জালকে নিরাপদ বাসা ভেবে ডিম পাড়ে, ও তা' দিতে থাকে। সকালে কোরেশগণ আকাশ-পাতাল

তোলপাড় করে তোলে—মহানবী ও আবুবকরের খোঁজে। সওর পাহাড়ের চারিদিকে লোক ঘুরতে থাকে, কোথায় তাঁরা! কয়েকজন গুহার দ্বারে হাজির হয়ে দেখল—দ্বারে কবুতরের বাসা, ডিম ইত্যাদি। বুঝে নিল এখানে কেউই নেই। কিন্তু গুহা মধ্যে দু'জন। বাইরের লোকের কোলাহল ও কলরবে আবুবকর অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোন কোন সময় তাদেরকে লক্ষ্যও করছিলেন অতি ক্ষীণভাবে। মহানবীর জন্য চিন্তায়, ভাবনায়, আবুবকর একেবারেই যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তখন মহানবী তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আজ আবুবকর ধন্য হলেন—তাঁকে উল্লেখ করেই কোরআন অবতীর্ণ হলো—"যখন অবিশ্বাসীরা তাকে বহিষ্কৃত করেছিল; এবং সে ছিল দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল; তখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবুবকরকে) বলেছিল—তুমি চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। সূরা তওবা ৯:৪০। এইভাবে তিনদিন তিন রাত্রি কেটে গেল। আবুবকরের পুত্র আব্দুল্লাহ ও ভৃত্য আমরও তাঁদের সাথে যোগদান করলেন। আবুবকর পূর্ব হতেই তিনটি উটকে প্রস্তত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুত্র ও ভৃত্য প্রতিরাত্রে অত্যন্ত গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করত।

মদিনার পথে তিনজন

তিনদিন তিন রাত্রি পর একটি বিশেষ ক্ষণে মহানবী সঙ্গে আরো তিন জনকে নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা করলেন। কারো কারো মতে, একটি উটে মহানবী নিজে, দ্বিতীয়টিতে আবুবকর এবং তৃতীয়টিতে পুত্র আব্দুল্লাহ ও ভৃত্য আমর। কিন্তু আমাদের মতে, একটি উটেই তিনজন আরোহী ছিলেন—মহানবী, আবুবকর এবং পথপ্রদর্শক আব্দুল বিন ওরিফাত। যাতে কারো কোন লক্ষ্যে না আসে, তাই অজানা পথ দিয়ে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে তাঁদের ক্ষুদ্র কাফেলাটি চলতে থাকল। হঠাৎ বিপদ ঘনিয়ে এল—মক্কার এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি সুরাকা পুরস্কারের লোভে এই ক্ষুদ্র কাফেলাটির পশ্চাদ্ধাবন করল। তাঁদেরকে কোরেশদের হাতে ধরিয়ে দেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কাফেলার অতি নিকটবর্তী হয়ে সুরাকা অস্ত্রাঘাত করার জন্য যেন প্রস্তুত। হেনকালে তার ঘোড়ার পা বালুকাময় মাটিতে বসে যায়। ঘোড়ার চিৎকার শব্দে সুরাকা দেখল সে নিজেই বিপদগ্রস্ত। তখন তার সম্বিৎ ফিরে এল। ভাবান্তর হল। অতঃপর সে মহানবীর নিকট কিছুদূর পায়ে হেঁটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মহানবী তাকে সেখানেই হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু দয়ার নবী তাকে ক্ষমা করলেন।

কাফেলা চলতে থাকে, মদিনার দ্বার প্রান্তে প্রায় হাজির। এমন সময়

হঠাৎ আবার বিপদের ঘন্টা যেন বেজে উঠল। বারিদা নামক এক ব্যক্তি ৭০ জন দুর্দান্ত অশ্বারোহী যোদ্ধা-সহ অতি দ্রুতগতিতে এই কাফেলাটিকে আক্রমণ করার জন্য আগতপ্রায়। সকলেই অত্যন্ত বিচলিত। মহানবী তখনও প্রশান্ত, ধীর। মহানবী বারিদার প্রতি একটিবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, মনে হল সপ্তকুণ্ড আগুন যেন এক নিমিষেই নিভে গেল। ভীষণ শত্রু বারিদা একেবারেই পরমভক্ত শিষ্যে পরিণত হল। অতঃপর ঐ বারিদাই তাঁর সমস্ত লোকজন-সহ মিছিল করে মদিনার পথে এগিয়ে যেতে থাকল ঐতিহাসিক অভিবাদন-সহ:

এসেছেন শান্তিরাজ শান্তি দিতে মানবে
সন্ধির স্থপয়িতা রুখে দিবে দানবে।
নিখিলের মহানন্দ নিরুপম নিষ্ঠা
ন্যায় ও বিচারে হবে শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

এইরূপে মক্কা হতে মদিনা ২৭০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, সমস্ত বাধাকে জয় করে, মদিনার অতি নিকট কোবা নামক স্থানে হাজির হলেন। তখনও কোবাবাসীগণ জানেন না—কে মহানবী, কে আবুবকর। পরে সকলেই অভিবাদন করলেন মহানবীকে। মহানবী আবুবকর ও অন্যান্যদের নিয়ে এখানে একটি মসজিদ বানালেন। এখানে তাঁরা পৌঁছলেন—৮ই রবিউল আওয়াল; ২৩ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীঃ। এখানে তাঁরা ১৪ দিন অবস্থান করেন। এখানেই ইসলামের প্রথম মসজিদ, এবং কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বনি সালেম গোত্রের পল্লীতে ইসলামের প্রথম জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মহানবীর সাথে আবুবকরের মদিনার জীবন।

তৃতীয় অধ্যায়

মদিনায় মহানবীর সাথে আবুবকর

মসজিদ-ই-নববী ও আবুবকর :

নতুন ইতিহাসের সূচনা করে আবুবকর মহানবীর সাথে ইয়াস্‌রেবে (মদিনায়) পৌঁছলেন। তখন ৬২২ খ্রীস্টাব্দ। এই ৬২২ খ্রীঃ হতেই মুসলিম জগতের হিজরী সন গণনা করা হয়। মহানবী আশ্রয় নিলেন আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে। অতঃপর তাঁর প্রথম চিন্তা হল একটি মসজিদ তৈরি করা। একটি বিশাল খালি প্রাঙ্গণ তাঁর খুবই মনঃপূত হল। সন্ধানে জানতে পারলেন—তার মালিক দু'জন অনাথ বালক। তিনি তাদের ডাকলেন। তাদেরকে আপন ইচ্ছার কথা বললেন। তারা মহানবীর প্রস্তাবকে সাদরে সমর্থন জানাল। কিন্তু বিরোধ বাধল অন্য স্থানে। মহানবী ঐ স্থানটিকে কিনে নিতে চান। কিন্তু অনাথ বালকদ্বয় ঐ স্থানটিকে বিনামূল্যে মহানবীর হাতে অর্পণ করতে চায়। কিন্তু দূরদর্শী মহানবী। আল্লাহর দূত মহানবী, বিশ্বমানবের মুক্তিকামী মহানবী। এই পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর মসজিদ কিভাবে তৈরি হওয়া উচিত, তা তিনি সম্যকভাবেই জানতেন। রোজ-হাশর পর্যন্ত তাঁর কার্যধারা বিশ্ব মুসলমানদের নীতি নির্ধারণ করবে। তাই তাঁর কাজ শুধুই কাজই ছিল না, বরং বিশ্বনীতির গতিনির্দেশক ছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করে তিনি অনাথ বালকদের বুঝিয়ে বললেন—তোমরা কিছু গ্রহণ করো। কেননা আজ যদি মহানবী স্বয়ং বিনামূল্যে স্থানটি গ্রহণ করে মসজিদ করেন, তাহলে মহাকালের গর্ভে আগামীকাল এইটাই একটি নীতিতে পরিণত হয়ে বিশ্ব মুসলমানকে গতি নির্দেশ করবে। মহানবী এটা মোটেই চাননি। তিনি চেয়েছিলেন—মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবে পুত-পবিত্র স্থানে, যে স্থানটি সম্পর্কে কারো এতটুকুও পর্যন্ত বলার কিছুই থাকবে না। তাই বালকদ্বয়ের নিকট হতে দশটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে ঐ স্থানটি ক্রয় করলেন পরিশেষে।

তখনও মহানবী মদিনাতে কপর্দকহীন। কে এই দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দেবে। মহানবী চিন্তিত। পাশে আবুবকর দণ্ডায়মান। মহানবীকে চিন্তিত দেখে আবুবকর কালবিলম্ব না করেই দশটি স্বর্ণ মুদ্রা মহানবীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি বালকদের হাতে দিয়ে দোয়া করলেন। এবার মসজিদের স্থান কেনা হল। এবার ভাবীকালের মসজিদে-নববীর স্থান স্থিরীকৃত হল। এখন আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি—মুসলিম জাহানের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মসজিদ

'মসজিদ-ই-নববী' (নবীর মসজিদ)-এর স্থানটি শতাব্দীর ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে কার অবদানের কথা অবলীলাক্রমে চিরদিন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছে, তিনি আর কেউই নন—হযরত আবুবকর। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে মানুষের মনে ও আল্লাহর মসজিদে। এইভাবে দূর অতীতের কোলে ইসলাম প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করল হযরত আবুবকরের মনে এবং তাঁরই ক্রয়কৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে।

অতঃপর এই বিশাল মসজিদ প্রাঙ্গণেই তৈরি হল—মহানবীর কুঁড়েঘর (হুজরা শরীফ)। এবার যে যেখানে ছিলেন, সকলেই সমবেত হলেন মহানবীর পাশে। একদিন মক্কাতেও নিবিড় অন্ধকারে মহানবীর বন্ধু ছিলেন আবুবকর। আজ মদিনাতেও আবুবকর তাঁর প্রথম বন্ধু।

কর্মী চলিয়া যায় রেখে যায় কাজ
মহাকাল স্মৃতিভারে বহে তার তাজ।

মদিনাতেও মহানবী শত্রু পরিবেষ্টিত :

মহানবী মদিনাতে পৌঁছলেন। মদিনার পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াস্‌রেব'। মহানবীর আগমনের পর এর নামকরণ করা হল 'মদিনাতুন নবী' অর্থাৎ নবীর শহর। মহানবীর নিকটের মানুষেরা যে যেখানে ছিলেন, সকলেই সমবেত হলেন মদিনাতে। আবুবকর মদিনার উপকণ্ঠে নিজের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করলেন। মহানবীর চারপাশে সকলেই একত্রিত হয়ে মনে করলেন এবার তাঁরা একটু শান্তির সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। কিন্তু তা হল না। অধিকাংশ সময়ই গোপন শত্রু প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও ভয়ঙ্কর হয়। এবার মহাজীবনে তাই ঘটল। এতদিন মহানবী মক্কাতে প্রকাশ্য দুষমন কোরেশদের সাথে মোকাবিলা করলেন, এবার তাঁকে মদিনাতে গোপন শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করতে হল। মদিনার ইহুদি, নাসারা ও পৌত্তলিকগণ ছিল বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। তারা মহানবীকে মুখোমুখি বা সোজাসুজি কোন বিরক্তিকর কিছু বলত না। কিন্তু সর্বদাই গোপনে তাঁকে আঘাত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। মক্কার কোরেশগণ এই সুযোগটি কাজে লাগাতে মোটেই ভুল করল না। উভয় দলই মিলিত হল—একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কি করে মহানবীকে দুনিয়া হতে মুছে দেওয়া যায়। উভয় দলের পরামর্শমতো আরব-কোরেশ প্রধান আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করল। উদ্দেশ্য সিরিয়া হতে বহু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে মহানবীকে দুনিয়ার মাটি হতে একেবারেই বিদায় দেওয়া। এবার তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে একেবারেই বদ্ধপরিকর ছিল। মক্কার লড়াকু দল বীরসেনা, মদিনার ছলে ভরা সুচতুর ইহুদিগণ এবং সিরিয়ার বিখ্যাত অস্ত্রসম্ভার, সকল কিছু এক যোগে ঝাঁপিয়ে

পড়বে মহানবীর ক্ষুদ্র শিবিরে। নেকড়ে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরপরাধ ছাগলের পালে। তারাও সেই রকমই চিন্তা করল—এক নিমিষেই শেষ করে দেবে মহানবীর অস্তিত্ব। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৌশল সবার ওপর—তারা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করলেন, আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। কোরআন ৩: ৫৪, ৮: ৩০, ৮৬: ১৫ ১৭।

বদর যুদ্ধ ও আবুবকর (১৪ জানুয়ারি, ৬২৪ খ্রী:):

বদর একটি স্থানের বা কূপের নাম। মদিনার অনতিদূরে অবস্থিত। মক্কার কোরেশ বাহিনী মদিনার ইহুদিদের সাথে শলাপরামর্শ করে বদর প্রান্তরে উপনীত। যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠেছে। মহানবী আর স্বস্তির সাথে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করতে পারলেন না। বন্ধু আবুবকরকে ডাকলেন, সামান্য মাত্র লোকজন। তাও আবার অস্ত্রবিহীন। মহানবী যেন কোন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না, কি হবে, কি করবেন। হতদারিদ্র্যের মধ্যে হতবিহ্বল অবস্থায় আল্লাহ্‌র নবী আল্লাহকেই ডাকলেন।

তুমিই বলেছ মোরে ডেকো বারে বারে
সাড়া দিই প্রত্যেকের ভীত চিৎকারে।
প্রাণের আকুতি নিয়ে ডাকে যে নিদান
(উজিবু দাওয়া তাদ্‌দায়ে এজা দা'য়ান)
প্রার্থীর প্রার্থনায় দিই উত্তর দান।

মহানবী এত কাতর প্রাণে ডাকলেন, এত করুণ সুরে বললেন, বিধাতা যেন উত্তর দিলেন—

হে পান্থ পথে তুমি ভীত কেন
জগৎ আমার হাতে নীত যেন।
উদাস কেন গো আজি হৃদয় বিকল
ঘুচাব হৃদয় ভার রও অবিচল।
মম হাতে সে বিন্দু, তুমি যে পাথারে
উতারিব ভয় নাই আমি পারাবারে।
প্রাণের নীরব রবে ডাকে যে নিদান
তার ডাকে সাড়া দিই নাহি মোর কান।

কোরআন— ২:১৮৬, ২৭: ৬২, ৩৯:৫৩

মহানবী আপন হুজরাতে ধ্যানমগ্ন, কোথাও কেউ নেই, শুধু শিয়র দেশে দণ্ডায়মান আবুবকর। আল্লাহ্‌র নবীর মাথার উপর স্বয়ং আল্লাহ্‌, পাশে বন্ধু আবুবকর। কি মহান দৃশ্য! কি পবিত্র মহাক্ষণ! নবীর পবিত্র মুখনিঃসৃত

বাণী কখনও ঊর্ধ্বে গগনে মহান আল্লাহ্‌র আরশকে আন্দোলিত করছে, কখনও বা বন্ধু আবুবকরের হৃদয়কে প্রকম্পিত করছে, এ যেন স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান বিহীন মিলনের মহাক্ষণ ছিল। এই সন্ধিক্ষণে, এই সন্ধিস্থানে আবুবকরের মুখ হতে নিঃসৃত হল—"হে মহানবী, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনার আকুল প্রার্থনা শুনেছেন, আল্লাহ্ আপনাকে জয়যুক্ত করবেনই, আল্লাহ্ আপনাকে জয়যুক্ত করবেনই। ক্ষান্ত হন, ক্ষান্ত হন, হে মহাসাধক, হে মহানবী।" বন্ধু আবুবকরের মুখে এই কথা শুনে মহানবীর হৃদয় যেন ভারমুক্ত হয়ে উঠল। এটাও ছিল সেই মহান আল্লাহ্‌রই মহাদান। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর সর্বপ্রথম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সেদিন তিনিই ছিলেন মহানবীর পরামর্শদাতা ও প্রথম যোদ্ধা।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, এবং কোরেশদের ছিল এক হাজারের মতো। এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহিদ হন, এবং বিরোধীপক্ষের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। সকল বন্দীকে সাদরে মদিনাতে আনা হল। বন্দীদের ব্যাপারেও আবুবকর যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা জগৎ-বন্দীর ইতিহাসে আজও দুর্লভ। আবুবকর ইসলামের এই প্রথম যুদ্ধেই তুলে ধরলেন একটি মহান আদর্শ— প্রতিহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না। আবুবকরের এই উদার অমায়িক ব্যবহারে সকল বন্দীই একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সকলেই ইসলামের এই মহৎ আদর্শকে পঞ্চমুখে অতীব প্রশংসার সাথেই ঘোষণা করেছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় ছিল আদর্শের জয়, সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, ইসলামের জয়।

ওহোদ যুদ্ধ ও আবুবকর (২৫ জানুয়ারি, ৬২৫ খ্রীঃ) :

বদর যুদ্ধের পর ইসলামের আসল অগ্নিপরীক্ষার দিন—ওহোদ যুদ্ধ। বদর যুদ্ধে ইসলামের শত্রু এসেছিল ইসলামের দীপশিখাকে চিরতরে নির্বাপিত করে দিতে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। অধিকন্তু নিজেরাই নির্বাপিত হতে বসেছিল। বদরের সেই গ্লানি, সেই ক্রোধ, সেই আক্রোশ সমস্ত কিছু সঞ্চারিত হয় ওহোদ প্রান্তরে। মহানবীর কঠোর নির্দেশাবলীকে অবমাননা করায়, তীরন্দাজদের মারাত্মক ভুলের জন্য সম্পূর্ণ জেতা যুদ্ধে ইসলাম চরমভাবে আঘাত পেল। রণকুশলী খালিদ মুসলমানদের এই মহাভুলের সুযোগ নিতে ভুল করেনি। তীরন্দাজগণ গিরিপথ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই খালিদ পেছন দিক হতে ছত্রভঙ্গ মুসলমানদের আক্রমণ করে এক মহাবিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মনুষ্য সমাজের চিরকলঙ্ক অভিশপ্ত ইবনে কামিয়া নামক এক দুরাত্মার তরবারির আঘাতে মহানবী জ্ঞানহারা হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। তখনও প্রবল বেগে যুদ্ধ চলছে। আবুবকরের দৃষ্টি সদাই দু'দিকে ছিল মহানবীর দিকে ও শত্রুর

দিকে। যখনই আবুবকর লক্ষ্য করলেন—মহানবীকে দেখা যাচ্ছে না, তৎক্ষণাৎ একটি গর্ত হতে তাঁকে তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এসে গেল মুসলিম বাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যে মহানবী জ্ঞান ফিরে পেলেন। এই যুদ্ধে আরো একটি ঘটনা—আবুবকরের পুত্র আব্দুর রহমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবুবকর প্রথম তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধেই তরবারি ধারণ করতে প্রস্তুত হলে মহানবী ক্ষান্ত করেন তাঁকে। ইসলামের সেবায় আবুবকরের নিকট পিতা ও পুত্র সম্পর্কের কোন মূল্যই ছিল না।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে আবুবকর (২৩ মার্চ, ৬২৭ খ্রী:):

কোরেশ কুলনেতা আবু সুফিয়ান মদিনার বুকে মহানবীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করল। মহানবী এই দুঃসংবাদ পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিচক্ষণ সাহাবীগণকে পরামর্শের জন্য ডাক দিলেন। হযরত সালমন ফারসির পরামর্শ মতো মহানবী মদিনার তিনদিকে দশ হাত চওড়া ও দশ হাত গভীর খাল খননের নির্দেশ দিলেন। এই কাজে আবুবকর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রায় এক মাস কাল আবু সুফিয়ান মদিনা অবরোধ করে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয় মুসলিম বীরগণ। এই বীরত্বে আবুবকরের নাম চিরস্মরণীয় থাকবে (বিস্তারিত মহানবী গ্রন্থ দেখুন)।

ঐতিহাসিক হোদাইবিয়ার সন্ধি: (২২ মার্চ, ৬২৭ খ্রীঃ):

তখন ষষ্ঠ হিজরী। মহানবী ওমরা বা ছোট হজ পালন করার জন্য একটি বিশাল দল-সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি সাধু। যখন তিনি যুল হুযাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন—মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কাতে প্রবেশ করতে দেবে না। তিনি সবার সাথে পরামর্শ করলেন। বিশেষ করে আবুবকরের সাথে। এবং সদলবলে এগোতে থাকলেন। যখন মহানবী হোদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বুদায়িল ইবনে ওয়ারাকা খাজায়ি মহানবীকে জানালেন কোরেশগণ কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। বুদায়িল যখন মহানবীকে নানা ব্যঙ্গময় কথার দ্বারা নিরস্ত করার চেষ্টা করছিল, তখন আবুবকর পাশেই ছিলেন। তিনি বুদায়িলিকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় উত্তর দিয়ে তার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিলেন। যাই হোক ঘটনাপ্রবাহ বইতেই থাকল। শেষপর্যন্ত সন্ধি হল। এই সন্ধি মুসলমানদের মনঃপূত হল না। এখানে কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আবুবকর। তিনি অন্যান্য সকল সাহাবীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—মহানবী

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহব ইঙ্গিতেই একাজ কবছেন। পববর্তীকালে পবিত্র কোবআন এই সন্ধিকে 'ফতুহুম মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয বলে ঘোষণা কবেছে। মহানবী ছিলেন আল্লাহব ঐশীবাহী দূত এবং আবুবকব ছিলেন মহানবীব ইঙ্গিতবাহী দূত (বিস্তাবিত মহানবী দেখুন)।

মক্কা বিজয় ও আবুবকর :

আজ অষ্টম হিজবী। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুব পুনবাবৃত্তি। হোদাইবিযাব সন্ধি ভঙ্গের পব মহানবী দশ হাজাব সৈন্য-সহ বিনা বাধায মক্কা জয কবলেন। সকলেবই মনে আছে একদিন গভীব নিশীথ বাতে দুই বন্ধু মহানবী ও আবুবকব নীববে একটি উটেব ওপব বসে মক্কা ত্যাগ কবেছিলেন। আজ আবাব সেই দুই বন্ধুই একটি উটেই বসে মক্কায প্রবেশ কবলেন বিজযীবেশে। দূব অতীতেব সাথে আজকেব কি মহান সাদৃশ্য! সমগ্র মক্কাবাসীকে ইতিহাস আজ কি নিষ্ঠুব উত্তবদান কবল। তখনও আবুবকবেব নব্বই বছবেব বৃদ্ধ পিতা আবু কোহাফা জীবিত। পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে মহানবীব নিকট হাজিব কবে বললেন—এঁকে ইসলামেব আলো দান করুন। চিববিনীত মহানবী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—এই বৃদ্ধকে কেন আমাব নিকট আনলে, আমি সংবাদ পেলে নিজেই যেতাম। সেদিন মহানবীব নিকট মক্কাব আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন স্বেচ্ছায সানন্দে ইসলামেব তৌহিদেব বাণী পাঠ কবে চিবশান্তি লাভ কবলেন। মহানবীব মহাজয ছিল এইখানেই। তিনি কোনদিনই দেশেব মাটিকে জয কবতে চাননি, তিনি চেযেছিলেন মানুষকে জয কবতে, মানুষেব অন্তবকে জয কবতে। এইখানেই অন্যান্য বাজা বাদশাদেব সাথে মহানবীব জযেব পার্থক্য।

হুনায়েন অভিযানে আবুবকর :

ওহোদ যুদ্ধেব কথা যাঁদেবই স্মবণে আছে, তাঁবা হুনাযেন যুদ্ধেব কথাটি অতি সহজেই বুঝতে পাববেন। ওহোদ যুদ্ধে ইসলামেব প্রথম জয এবং পবে বিপর্যয। হুনাযেন যুদ্ধে ইসলামেব প্রথম বিপর্যয ও পবে জয। মক্কা ও মদিনাব বিশাল বাহিনী পেয়ে মুসলমানগণ একটু অসর্তক হযে উঠেছিলেন। ওটা ছিল সম্পূর্ণ পার্বত্য এলাকা। তখন দিনেব আলো পূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। কোথাও ঝাপসা, কোথাও অন্ধকাব, কোথাও বা ক্ষীণ মিটিমিটি আলো। এবই মধ্যে দু'ধাবে লুকিযে ছিল হাওযাজীনগণ তীব ধনুক-সহ। মুসলমানদেব এই অসতর্কতাব সুযোগ তাবা গ্রহণ কবল। দু'দিক হতে বৃষ্টিব ন্যায তীব বর্ষণ হতে থাকায মুসলমানগণ নিমিষেব মধ্যে ছত্রভঙ্গ হযে গেল। এমনকি মহানবীব জীবন বক্ষাই কঠিন হযে দাঁড়াল। এই ভীষণ বিপদেও আবুবকব তাঁব সাহস না হাবিযে বজ্রকণ্ঠে মুসলিম বাহিনীকে একত্রিত কবাব জন্য

আহ্বান দেওয়া মাত্রই সকলেই আবার একত্রিত হয়ে সম্মুখ সমরে ঘুরে দাঁড়াল বীরের বেশে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হল। আবুবকরের কৃতিত্ব চিরদিনের জন্য ঘোষিত হল।

হজের অধিনায়ক আবুবকর:

নবম হিজরীতে মহানবী মদিনাতে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিছু সংখ্যক সাহাবী মক্কাতে হজ করার জন্য মহানবীকে অনুরোধ জানালেন। তখন তিনি আবুবকরকে ঐ তিনশো হজযাত্রী দলের 'আমির-উল-হজ' লকব বা উপাধি দান করে মক্কা যাত্রার অনুমতি দিলেন। মহানবী জীবিতকালে এইরূপ সম্মান অন্য কোন সাহাবীর ভাগ্যে জোটেনি।

বিদায় হজে আবুবকর:

এবার শেষের পালা, এবার বিদায় বেলা। দশম হিজরী। এই হজটি 'বিদায় হজ' নামে বিখ্যাত। এইটিই মহানবীর মহাজীবনের শেষ হজ। প্রায় দু'লক্ষ মুসলমান সেদিন এই হজটিতে যোগদান করেছিলেন। আরাফাতের ময়দান। আজ মহানবী মহাসাফল্যের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। আনন্দ ও আবেগে কণ্ঠ আজ তাঁর রোধ হচ্ছে। অব্যক্ত কথা কোনদিনই ব্যক্ত করা যায় না। তবুও আজ মহানবীকে সারা জীবনের কথা অতি সংক্ষেপে বলতেই হল—'হে প্রভু আমি কি তোমার রেসালতের গুরুদায়িত্ব, নবুয়তের গুরুভার সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি'? লক্ষ কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কেবলমাত্র একটি কণ্ঠ নীরবে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আনন্দে ও আবেগে অশ্রু বিসর্জন করল, সেই কণ্ঠটি—আবুবকর।

মহানবী মদিনায় ফিরে এলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর মিশন সমাপ্তপ্রায়। দূতের কাজ সাঙ্গপ্রায়। মহান আল্লাহ্‌ও তাঁর দূতকে জানিয়ে দিলেন মহাজীবনের মহান দায়িত্ব আজ সমাপ্তপ্রায়। "যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং যখন তুমি লোকদের দলে দলে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন আল্লাহ্‌র গুণগান করো, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।" কোরআন—১১০:১-৩।

কোরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবনে আবুবকর:

মহানবীর সময়ও কোরআনের বহু হাফেজ ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবনে আবুবকর যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তার কোন তুলনা ছিল না। সূরা এজাজা (১১০) অবতীর্ণ হওয়ার পরই সর্বপ্রথম আবুবকরই অনুধাবন করেছিলেন মহানবীর

কাজ সমাপ্তপ্রায়। অতীব বেদনার সাথেই বুকভরা ব্যথা নিয়েই তিনি সেদিন একথা সকলের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। মহানবী শেষবারের মতো 'জান্নাতুল বাকী' নামক গোরস্থানে গেলেন, যেখানে বহু সাহাবী চিরবিশ্রামে, চির-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁদের কথা স্মরণ করলেন, সবার জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে এলেন। এবার মহানবী অসুস্থ। এই অবস্থাতেই মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। দ্বিতীয় দিনের খোতবায় হঠাৎ বললেন—"আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করতে চাইলেন, কিন্তু বান্দা তা গ্রহণ না করে আল্লাহকেই গ্রহণ করলেন।" একথাটি সকলেই শুনলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিরই কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না, একমাত্র আবুবকর ব্যতীত। আবুবকর আকুলভাবে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সকলেই হতবাক। কেউ বা জিজ্ঞাসা করছে—আবুবকর কাঁদছেন কেন। আবুবকর সেদিন ঐ কথা হতে বুঝতে পেরেছিলেন—মহানবীর বিদায়ক্ষণ আর বেশি দূরে নয়। আবুবকরের এই ক্রন্দন শুনে মহানবী তৎক্ষণাৎ বললেন—"নিশ্চয়ই আমি সকলের মধ্যে প্রেম ও ভক্তিতে আবুবকরকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এই মসজিদের সমস্ত দরজা আজ হতে বন্ধ থাক, কেবলমাত্র খোলা থাক আবু বকরের দরজা।" সুতরাং কোরআন ও হাদিসের যথার্থ ভাব ও মর্মাথ অনুধাবনে আবুবকর ছিলেন অদ্বিতীয়।

মহানবীর প্রতিনিধি আবুবকর:

মহানবীর শরীর দিন দিন অধিকতর দুর্বল হতে থাকল। অসুখ ও অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকল। ৮ রবিউল আওয়াল হতে মহানবী আর তাঁর প্রাণপ্রিয় মসজিদে নববীতে হাজির হতে পারলেন না। আবুবকরকে তাঁর স্থলে ইমামতি (নামাজ পরিচালনা) করার ভার দিলেন। কিন্তু মহানবীর স্ত্রী ও আবুবকরের কন্যা বিবি আয়েশা এই কাজে বাধা দিলেন। কেননা তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি অধিকাংশ সময়ই ক্রন্দনরত অবস্থায় কোরআন পাঠ করেন। হয়তো এই গুরুভার, এই গুরুদায়িত্ব পালনে তিনি যথেষ্ট হবেন না। মহানবীকে অনুরোধ করলেন—অন্যজনকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। কিন্তু মহানবী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেই আপন আদেশ বলবৎ রাখেন।

মসজিদ নববীতে ইমাম আবুবকর:

কি মহা সৌভাগ্য, আবুবকর শুধুমাত্র মসজিদে নববী-তে মহানবীর জীবিতকালে ১৭ বার ইমামতিই করলেন না, স্বয়ং মহানবীর সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতির সুযোগ পেলেন। এহেন ভাগ্য শুধু বিরল নয়, একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

শুক্রবার জুম্মার আযান ধ্বনিত হলে অসুস্থ মহানবী দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে মসজিদে জামাতে সামিল হলেন। তখন সবেমাত্র নামাজ আরম্ভ হয়েছে। আবুবকর যেন বুঝতে পারলেন, মহানবী স্বয়ং হাজির হয়েছেন। তখন তিনি ইমামতির স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলে মহানবী ইঙ্গিতে তাঁকে নামায পরিচালনা করতে নির্দেশ দিলেন। এবং নিজে তাঁর পাশে বসে নামাযে আদায় করলেন। আজ মহানবীর নামাযে ইমামতি করে আবুবকরের ইসলামের সেবায় ত্যাগ-তিতিক্ষা, সারা জীবনের সংকল্প-সাধনা, সমস্ত কিছুই যেন এক নিমিষেই পূর্ণত্ব লাভ করল। তাই আবুবকর পূর্ণ মানবের পূর্ণ প্রতিনিধি, ইসলাম জগতের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী অদ্বিতীয় ইমাম। মহানবীর অবর্তমানে ও বর্তমানে আবুবকরের এই ইমামাত ছিল সুদূরপ্রসারী এক ইঙ্গিত ভাবী নিদর্শন প্রথম খেলাফতের জন্য। সুতরাং অন্যান্য সকলের মাঝে আজ আবু-বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ভাবীকালের জন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষাই রাখল না। মহানবী আপন জীবিতকালেই যাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজে আপন স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি যে ইসলামের প্রথম ইমাম ও প্রথম খলিফা হবেন, একথা সন্দেহাতীত ছিল সবার চোখেই।

মহানবীর পরলোকগমন ও আবুবকর :

১২ রবিউল আওয়াল, ১১ হিজরী, ৭ জুন ৬৩২ খ্রীঃ, সোমবার, মহানবী নিজেকে যেন একটু সুস্থ বোধ করলেন। মসজিদে-নববীতে গেলেন ফজরের নামায পড়তে। তখন নামাযে আবুবকর ইমামতি করছেন। মহানবী তাঁর পেছনেই নামায আদায় করলেন। সকালের দিকে তাঁর শরীব একটু ভালই ছিল। সকলেই আনন্দ পেলেন। সকলেই ভাবলেন এ যাত্রায় মহানবীর কঠিন অবস্থা কেটে গেল। কিন্তু দ্বিপ্রহরে তাঁর শরীর আবার যেন অন্য দিকে মোড় নিল। তখন অনেকেই ঘর ছেড়ে এদিকে-ওদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে চলে গেছেন। স্বয়ং আবুবকর মদিনার প্রান্তভাগে চলে গেছেন। দিনের তৃতীয় প্রহর। বিবি আয়েশা বললেন—'আমার মনে হতে থাকল তিনি আমার কোলে খুব ভারী হয়ে উঠলেন। তখন বিবি আয়েশা তাঁর মাথা আপন বুকে তুলে নিলেন। মহানবীর শেষ বাণী—"সাবধান—নামায, নামায, সাবধান— গরিব মানুষ, গরিব মানুষ। হে আল্লাহ্, হে আমার পরম বন্ধু"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী তাঁর পরম বন্ধু মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জগৎ হতে বিদায় নিলেন।

এই সংবাদ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নবীর শহর মদিনা হল নবী-বিহীন। সমগ্র মদিনাতে কি যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা কোন লেখকই লিখে বোঝাতে পারবেন না। কেউ বা শোকে অস্থির, কেউ বা শোকে পাথরপ্রায় নিশ্চল,

কেউ বা জ্ঞানহারা, কেউ বা অজ্ঞান, এমনকি বিজ্ঞ ওমরের মতো মানুষ ঘোষণা করলেন—মহানবী মরেননি, যে বলবে—তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান নামিয়ে দেবো। হেনকালে আবুবকর মদিনার প্রান্তভাগ হতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলেন। সোজা গেলেন বিবি আয়েশার ঘরে। দেখলেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠমানব দুর্গত মানুষের কাণ্ডারী, এই পৃথিবীর শেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী মহানবী একটি ইয়ামনি চাদরে আবৃত, চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, চির বিশ্রামে শায়িত। আর যেন কোনদিনই বলবেন না, হে আবুবকর এটা করো না, ওটা করো, এটা বলো না, ওটা বলো। চারিদিকে শোকের মাতন, কিন্তু শান্ত আবুবকর আজও শান্ত, আজও সংযত। মহানবীর শিয়রে কিছুক্ষণের জন্য বসলেন। চাদর উন্মোচন করলেন। মহানবীর মুখের দিকে ক্ষণকাল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। অব্যক্ত বেদনায় ললাটদেশে চুমু দিলেন। বললেন—"জীবনে যেমন মিষ্টি ছিলে, মরণে তাই রয়ে গেলে। ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।"

মসজিদে নববীতে ভীষণ কলরোল চলছে। সমগ্র মদিনা উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। ধীরমতি আবুবকর সবার মাঝে দাঁড়ালেন—"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহম্মদ (দঃ)-এর এবাদত করত, সে জানুক মহম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই মারা গেছেন। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এবাদত করত সে জানুক, আল্লাহ্ জীবিত, তিনি মরেন না।" স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—"মহম্মদ একজন দূত ব্যতীত কিছু নহেন, তাঁর পূর্বেও বহু দূত অতীত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথ হতে) বিমুখ হবে। হ্যাঁ, যারা বিমুখ হবে, তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ্ সত্বর কৃতজ্ঞ মানুষদের প্রতিদান দেন।" আল্লাহ্ আরো বলেন—"হে মহম্মদ, তোমাকে ও তাদের সকলকেই মরতে হবে।" মানুষ-নবী এসেছিলেন মানুষের জন্য। এবং "প্রত্যেক মানুষই মরণশীল"।

কোরআন—৩:১৪৪, ২১:৩৫, ৫৫:২৬-২৭।

শোকবিহ্বল সমগ্র জনতা আবুবকরের কথাগুলোকে যেন নতুনভাবে অনুধাবন করলো। শেষ হল সারা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জীবনকাল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মহানবীর জানাযা নামায দোয়াখায়ের সম্পন্ন হল। এই জানাযা নামাযেও প্রথম ছিলেন—আবুবকর।

যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়।
মহত্ত্বে গৌরবে তুমি এত সুমহান
জগৎ জুড়িয়া দান নাহি প্রতিদান।

কোরআন—৫৫ : ২৬-২৭।

চতুর্থ অধ্যায়

খেলাফতের সঙ্কট কাল:

খলিফা শব্দের অর্থ 'প্রতিনিধি'। খেলাফত অর্থ প্রতিনিধিত্ব। মহানবীর পরলোক গমনের পর মুসলমানদের সম্মুখে সর্বপ্রথম যে মহাসমস্যাটি দেখা দিয়েছিল, তা মহানবীর স্থলে একজন সর্বসম্মত খলিফা নির্বাচন। কিন্তু এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কেননা সকলেই জানতেন—আর কোন নবী আসবেন না। অথচ নবীর স্থানটিকে একজন সাধারণ মানুষকে দিয়েই পূরণ করতে হবে। মহানবী ছিলেন একদিকে আধ্যাত্মিক গুরু, আবার অন্যদিকে ছিলেন শাসক বা পরিচালক। এই দুই মিলিয়ে খলিফা নির্বাচন করাটা একেবারেই মহাশক্ত কাজ ছিল। কিন্তু যত শক্তই হোক না কেন, মদিনাবাসীকে এটা করতেই হবে। মহানবীর পর কে প্রথম খলিফা নির্বাচিত হবেন, এ-নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হল।

তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রধানত দুটো দল ছিল, একটি মোহাজির ও অন্যটি আনসার। মোহাজির যারা মক্কা হতে মদিনায় এসেছিলেন এবং আনসার মদিনাবাসী মুসলমানগন, যাঁরা মোহাজিরগণকে সাহায্য করেছিলেন। দু'দলেরই দাবি ছিল—খলিফা তাঁদের মধ্য হতেই হবেন। দাবিটা খুব যে অসঙ্গত ছিল, তা বলা যাবে না। ঠিক এই সময়টিতে প্রধান ব্যক্তিগণ তিন স্থানে কর্মরত দেখছি। আবুবকর, আলী ও অন্যান্য কয়েকজন মহানবীর দাফন-কাফনের জন্য তাঁর ঘরেই ব্যস্ত। অন্যদিকে ওমর, আবু ওবায়দা ও অন্যান্য সা'হাবীগণও ঐ একই কাজের অন্যান্য দিক সামলানোর জন্য মসজিদে নববীতে কর্মব্যস্ত। এবং আনসারগণের কিছু ব্যক্তি তাঁদের মধ্য হতে খলিফা করার জন্য সফিফায়ে বনিসাদায় (জনসাধারণের সভাস্থল) মিলিত হয়ে কথোপকথন চালাচ্ছেন।

মোহাজিরগণ মসজিদে নববীতে ও আনসারগণ বনিসাদায ভাবী খেলাফত নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করছেন। একমাত্র আলী মহানবীর লাশ ফেলে রেখে ঐরূপ কোন তর্কে-বিতর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলাটাকে বেয়াদবি বলে মনে করেছিলেন। যাই হোক ইতিমধ্যে এক আনসার মসজিদে নববীতে সংবাদ দিলেন—বনিসাদায় আনসারগণ খলিফা নির্বাচন করছেন তাঁদেরই মধ্য হতে। এবং এই কাজে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই খবর শোনামাত্র ওমর অতিমাত্রায বিচলিত হয়ে উঠলেন। একি, এও কি হতে পারে নাকি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবুবকরের নিকট গমন করলেন। প্রথমদিকে আবুবকর অত্যন্ত বিবক্ত হলেন এবং ওমরের সঙ্গে আপাতত দেখা হবে না, জানিয়ে দিলেন। ওমব আবাব

সংবাদ দিলেন অত্যন্ত জরুরি। তখন আবুবকর বিরক্তি সহকারেই বেরিয়ে এলেন। এবং মসজিদে নববীতে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। সমস্ত সংবাদ পেলেন। বুঝতে পারলেন এটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। ওমর ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে আবুবকর বনিসাদায় অভিমুখে গমন করলেন। সত্যিকারেই ধীরমতি আবুবকর আজ যেন চরম ভাবেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন—আজ যদি আনসারগণ ভাবাবেগের বশে আপনাদের মধ্য হতেই একজন খলিফা নির্বাচন করে বসে, এবং তিনি যদি সর্বসম্মত হতে না পারেন, তাহলে মহানবীর পবিত্র লাশ সমাধিস্থ হওয়ার পূর্বেই ইসলামের প্রাণশক্তি চিরতরে কবরস্থ হয়ে যাবে। যে ইসলামের জন্য মহানবীর মহাজীবন কতই না অত্যাচার ও অবিচারের সম্মুখীন হয়েছিল। সমস্ত কিছুকেই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন ইসলামের জন্য। আনসারগণ একদিন ইসলামেরই নবীকে প্রথম প্রাণ দিয়েই ভালোবেসেছিলেন, আজ তাঁরাই কি ইসলামকে প্রথম ক্ষতবিক্ষত করবেন। এরূপ নানা চিন্তা আজ আবুবকরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। আজ মহানবী নেই। কে এই মহাসমস্যার সমাধান করবেন। হঠাৎ সমাধানের সূত্র পেলেন "ওয়া কাফা বিল্লাহে ওয়াকিলান"—কার্য সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট। ৩৩ : ৩।

ওদিকে সফিফায়ে বনিসাদায় আনসারগণের উত্তাল সভা চলছে। প্রায় সকল আনসারই একমত হয়ে পড়েছেন খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদবিন ওবাযদাকে খলিফা নির্বাচিত করার জন্য। তাঁকে সভাস্থলে আমন্ত্রণ জানানো হল। তিনি তখন কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবুও তাঁকে সভাস্থলে আনা হল। তিনি এসে একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন :

সাদ বিন ওবায়দার ভাষণ :

"প্রিয় আনসারগণ! আল্লাহর রসুলকে সাহায্য করার জন্য ও ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আপনাদের যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা, আপনারা যে আত্মমর্যাদার অধিকারী, আরবের কোন বংশই আপনাদের সমকক্ষ নয়। মহানবী মক্কায জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং সেখানেই নবুয়তও লাভ করেছিলেন, এবং সেইখানেই দীর্ঘ তেরো বছর কাল ইসলাম প্রচার করলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহর রসুলকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তারা নিজেরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না। তারা সকলেই কোরেশদের অত্যাচারে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ইসলামের ঠিক এই মহাসঙ্কট ক্ষণে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্বাচিত করলেন—ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। তোমাদের ওপর এল এক মহা গুরু দায়িত্ব। ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ও মহানবীকে সাহায্য করার জন্য তোমরা ছিলে আল্লাহব

করুণাপ্রাপ্ত বান্দা। সেদিন তোমরাই এই দুটোকে রক্ষা করলে। তোমরা সেই ব্যক্তি, যাদের তরবারি মহানবীর শত্রুদের প্রতি ছিল একেবারেই ক্ষমাহীন, যা ইসলামের বিজয়কে করেছে ত্বরান্বিত। যার ফলে আজ আরবের সমস্ত গোত্র ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলামের পতাকাতলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তোমরা ছিলে মহানবীর বড়ই প্রিয়, এবং তিনি ছিলেন তোমাদের নয়নমণি। তিনি তোমাদের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করলেন। তাঁর নশ্বর দেহকেও এই মদিনাই বরণ ও ধারণ করবে। সুতরাং এককথায় তাঁর অবর্তমানে তোমরাই তাঁর একমাত্র খলিফা বা প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। আজ তিনি পরলোকগমন করেছেন, এখন মহাসঙ্কট, অতএব তোমরা কালবিলম্ব না করেই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে মহানবীর যোগ্য উত্তরসুরি বা উত্তরাধিকারের প্রমাণ দাও।"

ভাষণ সমাপ্ত হল। তখনও আবুবকর ও ওমর এসে পৌঁছননি। পথিমধ্যে আসেম বিন আদি ও উয়ায়েম বিন সাদ নামক দু'জন মোহাজিরের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। তাঁরা জানালেন—"আর গিয়ে কোন লাভ হবে না। এতক্ষণ তারা সাদবিন ওবায়দাকে খলিফা নির্বাচন করে ফেলেছে, অথবা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র কোন আমির ঠিক করেছে। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম।" আনসারগণ বলল—"তোমরা চলে যেতে পার, তোমাদেব কোন কথাই শোনা হবে না। আমরা আত্মসম্মান নিয়েই পালিযে এলাম, আপনাদেরও উচিত ওখানে না যাওয়া।" ওমর বললেন —না, আমরা ওখানে যাবই।

আবুবকর, ওমর ও আবু ওবায়দা সভাস্থালে হাজির হলেন। তাঁদের উপস্থিত হওয়ার পরও জনৈক আনসার নেতা সাদ ইবনে আসাদ প্রস্তাব রাখলেন—"খলিফা মদিনার আনসারদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হবেন। কেননা আনসারগণই মহানবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মোহাজিরগণকে সাহায্য করেছিলেন, ইসলাম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মক্কার কোরেশদের দ্বারা, প্রাণ পেয়েছে মদিনার আনসারদের দ্বারা, মহানবী বিতাড়িত হয়েছেন কোরেশদের দ্বারা, আশ্রিত হয়েছেন আনসারদের দ্বারা। সুতরাং আনসাররাই একমাত্র খেলাফতের সুযোগ্য দাবিদার, খলিফাদের ন্যায়ত হকদার।" তখন সমস্ত আনসার সজোরে সমর্থন জানালেন।

এবার মোহাজিরগণের পক্ষ হতে কথা উঠল। "মোহাজিরগণ কোন্ দিকে নগণ্য! তারাই তো সর্বপ্রথম ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছে, মহানবীকে সাহায্য করেছে, মার খেয়েছে, অত্যাচার সহ্য করেছে, ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছে, অনেকেই প্রাণ পর্যন্ত কোরবান করেছে। অনেকেই ছেলে-মেয়ে সকল কিছুকেই আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিয়েছে। সুতরাং মোহাজিরদের দান ও অবদান কোন অংশেই কারো অপেক্ষা কম তো নয়ই, বরং তুল্যাংশে বেশি। সুতরাং খেলাফত তাঁদেরই প্রাপ্য। খলিফা তাঁদের মধ্য হতে হবে।" তখন সকল মোহাজিরগণই একথা এক বাক্যে সমর্থন করলেন। এবার সৃষ্টি হল খেলাফতের মহাসঙ্কট।

এবার সংকট মোচনের চেষ্টার পালা। কতিপয় লোক উভয়পক্ষের কথা শুনে মন্তব্য করলেন—"উভয়পক্ষের বক্তব্যেই কিছু না কিছু সারবস্তু আছে। সুতরাং এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যাতে উভয়পক্ষই খুশি হবে। সিদ্ধান্তটি ছিল উভয় দল হতে একজন করে খলিফা বা আমির নির্বাচন করা হোক।" অনেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে একে নাকচ করে দিলেন।

অতঃপর আবার একটি প্রস্তাব এল। এক দল হতে আমির বা খলিফা নির্বাচিত হোক এবং অন্য দল হতে উজির নির্বাচিত হোক। এই প্রস্তাবটিও বিজ্ঞগণের নিকট খণ্ডিত হল। তাঁরা বললেন—প্রশাসনে পৃথক কোন দুটো দলের অস্তিত্ব মানাই চলবে না। সুতরাং এটাও খারিজ হল।

এতক্ষণে মুশকিল আসানের দিকে মোড় নিয়েছে। মদিনাতে দুটো প্রধান গোত্র ছিল—আস্ ও খাজরাজ। সাদ বিন ওবায়দা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের নেতা। তিনি খলিফা হন, আস্ গোত্র এটা মোটেই চায় না। আবার আস্ গোত্র হতে কোন খলিফা হোক, খাজরাজ গোত্র এটা মোটেই বরদাস্ত করবে না। সুতরাং মদিনাবাসীদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ বা গৃহবিবাদ কোথায় যেন নীরবে দানা বেঁধে উঠল। দূরদর্শী আবুবকর ও বিজ্ঞ ওমর এই সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না। খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন ওবায়দা তখনও সভাস্থলে অসুস্থ অবস্থায় চাদর মুড়ি দিয়েই শুয়ে আছেন। এবার বিজ্ঞ ওমর বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ালে দূরদর্শী আবুবকর তাঁকে সজোরে বাধা দিয়ে নিজেই প্রথম বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন:

খেলাফতের সঙ্কটকালে আবুবকরের ভাষণ:

"সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যাঁর কোন অংশীদার নেই। যিনি ব্যতীত মানুষের কোন উপাস্য নেই। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) যাঁর প্রেরিত দূত। আমরা সকলেই তাঁর উম্মত। তিনি এতদিন আমাদের মধ্যেই ছিলেন। দুঃখ, আজ তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন। দুঃখের বিষয় যাঁর লাশ এখনও দাফন করা হয়নি, অথচ আমরা এখন খলিফা নির্বাচন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কি দুর্ভাগ্যের কথা, মহানবীর লাশ ও খলিফা পদ, কোন্‌টা আমাদের নিকট বেশি মূল্যবান ও মর্যাদাশীল হওয়া উচিত ছিল। মহানবীর বিদেহী আত্মা আমাদেব শিয়রে এখন দণ্ডায়মান, তাঁর দেহ মুবারক এখনও আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান। মহানবীর সেই পবিত্র দেহ ও জগতের খলিফা পদ কোন্‌টা আমাদের নিকট বেশি প্রিয় হবে! আমি যদি নিঃসন্দেহে একবার স্বীকার করি খলিফা পদের নির্বাচন এখন একটি জরুরি বিষয়, তাহলে শতবার ঘোষণা করব মহানবীর পবিত্র লাশের দাফন কাজটি আরো জরুরি বিষয়। যদি আমরা সকলেই

আজ একযোগে ইসলামের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র হতে না পাবি মহানবীকে সামনে রেখে, তাহলে আজকের ঐ খলিফা পদ আগামী দিনে শূন্যে বিলীন হতে দেরি হবে না।

আজকের এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের একজন নেতা নির্বাচন করতেই হবে। এবং আনসারগণ সেই জরুরি বিষয়টি নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন। এটা অন্যায় কিছু না। কিন্তু আনসার ভাই এই খলিফা নির্বাচনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা ঠিক হয়নি। কোন ভাবাবেগে না গিযে আপনাবা চিন্তা ও যুক্তির প্রয়োগ করুন, কোন মোহে মোহাভিভূত না হযে, কোন জাগতিক লোভে বা লালসায় না পড়ে আপানারা ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয দিয়েছেন, আপনারা মহানবীকে ভালোবাসার যে-কষ্টিপাথরে নিজেদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন, তা যেন একটিবারও ভুলে না যান। আপনারা ঐ ব্যক্তি, যাঁরা একদিন মহানবী ও ইসলামের জন্য আপনাদের সমস্ত কিছুকেই অবলীলাক্রমে কোরবানি দিয়েছিলেন। আজকে যেন অবহেলায় ঐ দুর্লভ সম্মান হারাবেন না।

আপনারা যদি একবার নিরপেক্ষভাবে চিন্তা কবেন, তাহলে স্বীকাব করবেন—খলিফা পদের জন্য যে কোন একজন যোগ্য কোবেশ ব্যক্তিব দাবি অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কেননা সমগ্র আরবে সকল দিক থেকেই কি প্রাচীনত্বে, কি বংশ-মর্যাদায়, কি জ্ঞানে-গুণে, আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষা-দীক্ষায, দানে ও ধ্যানে, বীরত্বে-বাহুত্বে কোরেশ বংশ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বংশেই নবীবর ইব্রাহিম হতে নবীশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী রসূলে আকরাম হযবত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর আগমন। আল্লাহ্‌র ঘর কাবা শবীফ সারা বিশ্বের একটি আকর্ষণীয় পবিত্র স্থান। সেই মর্যাদাশীল স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণের ভাব কোরেশদের ওপরই। সুতরাং যে বংশে ইব্রাহিমের আবির্ভাব, মহানবীর আগমন, কাবার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব নিহিত, ঐ একটিমাত্র বংশকেই সমগ্র আবব একবাক্যে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারের যুগে সমগ্র আরব সমাজ যখন ঘোর পাপে নিমগ্ন, পৃথিবীর এমন কোন জঘন্যতম পাপ ছিল না, যে পাপরাশি আরবকে গ্রাস করে নেয়নি, তখন মহান আল্লাহ্ অপার করুণাবশত তাঁর দূত শ্রেষ্ঠ মহানবীকে পাঠালেন—ঐ সমূহ পাপরাশিকে দূরীভূত করতে। মানবতা যখন মৃত্যুপ্রায়, মনুষ্যত্ব যখন মুমূর্ষুরোগী তখনই তিনি এলেন—

বিশ্বজোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

তখন আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র কোরেশই ঐ সত্যের দীপশিখাটিকে দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকলাম, ইসলামের বীজকে আমরা আরবের পবিত্র

মাটি মক্কার বুকে রোপণ করলাম। আমাদেরই ওপর আরম্ভ হল—ঝড় ও ঝঞ্ঝা, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উৎপীড়ন-নিপীড়ন। অতঃপর কখনও গালাগালি-ভর্ৎসনা, কখনও শারীরিক অত্যাচার, প্রহার, কখনও মানসিক নিষ্ঠুর অত্যাচার, কখনও জুলুমের সীমাহীন বর্বরতা, কখনও লোভ ও লালসা, কখনও প্রলোভন-প্রবঞ্চনা, কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে কোন কিছুই আমাদের সামান্য কতিপয় মানুষের ঈমানকে-মনোবলকে টলাতে পারেনি। আমরা এই সমস্তই সহ্য করেছিলাম কার জন্য, কিসের জন্য; সবকিছুই ছিল—এক আল্লাহ্র জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য। এই তিনটির প্রেমে আমরা একেবারেই অজ্ঞান ছিলাম, এখানে ছিলাম আমরা চির আপোসহীন, চির ব্যতিক্রম, চির উন্নত। দীর্ঘ ২৩ বছর আমরা মহানবীকে এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে দেখে এসেছি। যখন মহানবী একেবারেই নিঃস্ব ছিলেন, শক্তিহীন ছিলেন, দুর্বল ছিলেন; যখন তাঁর ধৈর্য ও সহ্য ব্যতীত কোন উপায় ছিল না, তখন আমরা ছিলাম তাঁর দুর্দিনের বন্ধু, দুঃখের সাথী, নির্মম অত্যাচরের চির নির্ভীক সেনা। সুতরাং আমরা অর্থাৎ এখানকার মোহাজিরগণ মহানবীর মহা-জীবনের সাথে যতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, আর কেউ কি তা কোনদিন পাবে! আমরা একদিন এই মহানবীর জন্যই আমাদের জান-মাল, বিবি-বাচ্চা, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, প্রিয় দেশের মাটি স্বদেশভূমি সকল কিছুকেই ত্যাগ করেছি। এই সর্বস্ব ত্যাগের মহিমাই মোহাজিরদেরকে করেছে চির গরীয়ান, চির মহীয়ান। অতএব আজকের খেলাফতের প্রকৃত হকদার এই গরীয়ান ও মহীয়ান মোহাজিরগণই।

আপনাদের সম্মুখে আমি আর একটি কথা উত্থাপন করছি আপনারা বিবেচনা করুন। খেলাফত কোন একটি বিশেষ স্থানের রাজনীতি নয়। এটি সমগ্র আরবের তথা ইসলাম জগতের রাজনীতি। যদি আমরা আজ আনসারদের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচন করি, তাহলে সমগ্র আরবের অন্যান্য বংশ সেটাকে মান্য করবে না। কেবলমাত্র মদিনার কিছু মানুষকে নিয়ে খেলাফত নয়। সুতরাং মদিনাবাসীদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এমন কাজ করতে হবে, যা সমগ্র আরব মেনে নেবে। নচেৎ চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় একদিন সাধনার ফুলটিই বৃন্তচ্যুত হবে, ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কোন আনসারের পক্ষেই এটা সুখের কথা হবে না। সমগ্র আরবের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে আরব সমাজ যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে একমাত্র কোরেশ বংশেরই কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে। একথাটি এ ধারণাটি আরবদের জাতীয় ইতিহাস, শতাব্দীর সংস্কৃতি, চির বহমান অলিখিত নীতি। সুতরাং এই নীতির অপপ্রয়োগ আরব মেনে নেবে না। তাই খেলাফত কোরেশদেরই প্রাপ্য বস্তু। আপনারা আমার কথা একবার বিবেচনা করুন।

প্রিয আনসাবগণ! আপনাদেব মধ্যে কেউ কেউ দুই আমিবেব কথা বলেছেন। একজন মোহাজেব ও অন্যজন আনসাব হতে। কিন্তু কোনদিনই ইসলামেব আদর্শ এটা নয়। মহানবী আমাদেবকে যেটা শিখিযেছেন—ইসলাম কোনদিনই কোন ভৌগোলিক সীমাবেখায আবদ্ধ থাকবে না, কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীব মধ্যে সীমিত থাকবে না, কোন বিশেষ সময বা কালেব মধ্যে গণ্ডীভূত থাকবে না, দেশকালপাত্র ভেদে তাব আদর্শ সকল কিছুকেই অতিক্রম কববে শতব্দীব পব শতাব্দীব ইতিহাসে। মহানবী বাববাব বলে গেছেন ইসলামেব আদর্শ-'ভাই ভাই', তাব নেতা হবে কোন যোগ্য ব্যক্তি, সে যদি আফ্রিকাব নাককাটা নিগ্রোও হয। সুতবাং ইসলামেব খেলাফতেব প্রশ্নে কোন দেশেব কোন গোষ্ঠীব বা অন্য কোন কিছুব স্থান নেই যোগ্যতা ব্যতীত। অধিকন্তু শাসনকার্যেব একই পদে দুই ব্যক্তি সমাসীন থাকা অর্বাচীনেব পবিচয। এতে শান্তি বা শৃঙ্খলা না এসে আসবে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। সুতবাং একই পদে দুই আমিব মাবাত্মক ক্ষতিকব।

হে আমাব বন্ধুগণ! আপনাবা যেন কিছুতেই একথা মনে কববেন না যে, আমি মোহাজিবদেব প্রশংসা কবে আপনাদেব ছোট কবছি। আমি জানি ইসলামেব দৃষ্টিতে আপনাদেব মর্যাদা অপবিসীম। ইসলামেব মহাপবীক্ষায মোহাজিব যখন প্রথম উত্তীর্ণ হল মক্কাব মাটিতে, তখন আপনাবাও দ্বিতীয বাবে উত্তীর্ণ হলেন মদিনাব মাটিতে। মোহাজিবগণ প্রাণ দিযে মক্কাব মাটিতে ইসলামেব বীজ বপন কবেছে, আনসাবগণ প্রেম দিযে সেই চাবা বৃক্ষটিব লালন পালন কবেছে মদিনাব মাটিতে। মহানবীকে আশ্রয দেওয়া ও ইসলামকে জযযুক্ত কবাব জন্য গৌবব আপনাদেবই। আপনাদেব তববাবি আবব অন্ধকাবকে বিদূবিত কবে মানব সভ্যতাব পথকে উন্মুক্ত কবেছে। সভ্যতাব ইতিহাসে কালস্রোতে আপনাদেব অবদান কোনদিনই মলিন বা বিস্মৃত হওযাব নয। মহানবী স্বদেশকে ত্যাগ কবে কেবলমাত্র আপনাদেব মধ্যে বসবাসই কবেননি; মহানবী জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপই নিতেন না আপনাদেব সাথে একান্তে পবামর্শ না কবে। মহানবী দুর্দিনে স্বদেশ ছেড়ে ছিলেন, কিন্তু সুদিন আগত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে আবাব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবতে পাবতেন, কিন্তু আপনাদেব অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, গভীব ভালবাসা তাঁকে এতখানিই মুগ্ধ কবেছিল যে, তিনি পববর্তী জীবনেও স্বদেশভূমিকে ত্যাগ কবলেন। তাহলে আনসাবগণ যে জিনিসটিকে চিবতবে জয় কবলেন, তা মহানবীব ভালোবাসা। এককথায তাঁবা জয কবলেন স্বযং মহানবীকে। যে জযেব কোন তুলনা নেই, যে জয ইসলামেব ইতিহাসে চিবদিনেব জন্য সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জয। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ক্ষণজন্মা বিজযীদেব জন্য আমাব একান্ত অনুবোধ—তাঁবা যেন তাঁদেব চিবদিনেব তুলনাবিহীন বিজযকে দুনিযাব ক্ষণিক মোহ বা আপাত সম্মানেব আশায মিথ্যা আকাঙ্খাব

মরীচিকা ও দুরাশার মরু-বালুরাশিতে পরিণত না করেন। সুতরাং ইসলামের শান্তি ও সভ্যতার পতাকাকে তুলে ধরার জন্য মোহাজিরদের মধ্য হতে আমির ও আনসারদের মধ্য হতে উজির নির্বাচিত হোক। আমি আশা করি ইসলামের শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সভ্যতার অনির্বাণ শিখা কোনদিনই নির্বাণ লাভ করবে না। আমাদের শেষ কথা—সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র জন্য।"

হাবাব্‌বিন মানজারের ভাষণ:

হযরত আবুবকরের ভাষণটি এতই গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলপূর্ণ ও ভারসাম্য বিশিষ্ট ছিল যে, তিনি আনসারগণের মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়েই অনেকখানি কার্যসিদ্ধি করলেন। খাজরাজ গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী আস্ গোত্র মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমনকি খাজরাজ গোত্রের অনেকেই আবুবকরের ভাষণটিব প্রশংসা না করে থাকতেও পারলেন না। কিন্তু হাবাব বিন মানজার নামক জনৈক খাজরাজ আবুবকরের বক্তৃতার তীব্র বিরোধিতা করলেন:

"হে আনসারগণ! তোমরা আজ শাসন ক্ষমতা কিছুতেই হাতছাড়া করো না। তোমাদের পক্ষেই বহু মানুষ। তোমাদের বিরুদ্ধে কেউই কিছু বলে পার পাবে না। অধিকন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতেও পারবে না। তোমরা মর্যাদাশালী, বিত্তশালী, সংখ্যায় তোমরা অধিক, অভিজ্ঞতাও তোমাদের অসামান্য বহুদিনের। তোমরা ভীরু নও। তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বীর সন্তান। দেশ ও দেশের মানুষ তোমাদের প্রতি তাকিয়ে আছেন। তোমরা একে অপরের বিরোধিতা করে নিজেদের সর্বনাশ করো না। মোহাজিরগণকে তোমরা ভালোবেসেছ, সম্মান দিয়েছ। তার অর্থ এই নয় যে, তোমরা তোমাদেব ভবিষ্যৎকেও জলাঞ্জলি দেবে। তোমরা আজ বড় জোর এইটুকু করতে পার যে মোহাজিরদের মধ্য হতেও একজন আমির গ্রহণ করতে পার।"

ওমরের ভাষণ:

হাবাবের এই বক্তৃতায় ওমর চরমভাবেই ব্যথা পেলেন। এতক্ষণ তিনি আবুবকরের কথার কোন প্রতি উত্তর করতে বা তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিতে পারেননি। এখন তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন—"একটি খাপে দুইটি তরবারি কখনই থাকতে পারে না। আল্লাহ্র শপথ, আরবের অধিকাংশ মানুষ তোমাদের আমির নির্বাচনে সমর্থন করবে না! কেননা তারা জানে—রসুল কোন বংশের মানুষ ছিলেন, কারা তাঁর নিকট আত্মীয়, কারা তাঁর সাথে দেশত্যাগ করেছে, কাদেরকে তিনি সর্বদাই প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন। সমগ্র আরব এখনও কাদের কথায় চলে। সুতরাং শাসনক্ষমতার ব্যাপারে আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার কে আছে! আমাদের সাথে এই ব্যাপারে তাঁরাই প্রতিযোগিতা করবে, যারা উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী ও বিপথগামী।"

ওমরের কথায় হাবাব আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন:

"হে আনসারগণ! তোমরা শিথিল হয়ো না, তোমরা দুর্বল হয়ো না। আবুবকর ও ওমরের কথায় তোমরা নিরাশ হয়ো না। আজ যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও, তাহলে খেলাফত বা সুলতানাৎ তোমাদের হাত ছাড়া হতে বাধ্য। তখন দুর্বলতাই তোমাদের চিরদিনের জন্য ধরে বসবে। আজ যদি মোহাজিরগণ তোমাদের কথা না শোনে, তাহলে তাদের নির্বাসন দাও। তবুও ক্ষমতাকে ত্যাগ করো না। আমি জানি তোমরাই এর একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী। তোমাদের ত্যাগ ও তলোয়ারের জন্যই ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে। ইসলামের আজ যে অচিন্ত্যনীয় উত্থান, তার মূলে তোমাদেরই দান ও অসামান্য অবদান। তোমরা ইচ্ছা করলেই ইসলামের এই উত্থানকে আবার রহিত করতে পার।"

ইসলামের মহাসঙ্কট কাল:

পরিস্থিতি যেন একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেল। ওমর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—"তোমরা যদি এ ধরনের চেষ্টা কর, আল্লাহ্ তোমাদের ধ্বংস করবেন।" হাবাবও তার উত্তরে বলে উঠলেন—"আল্লাহ্ আমাদের নয়, বরং তোমাদেরই ধ্বংস করবেন।" এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাবাব খাপ হতে তরবারি বের করলেন। ওমর তৎক্ষণাৎ তরবারিটিকেই কেড়ে নিয়ে সাদ বিন ওবায়দার দিকে অগ্রসর হলেন। তখন এক চরম মুহূর্ত। দাবানল জ্বলে উঠতে আর মোটেই দেরি ছিল না। যদি উত্তেজিত ওমর ও ক্রুদ্ধ হাবাব পরস্পর আর একটু মাত্র এগিয়ে যেতেন; তাহলে কে বলতে পারে সেদিন মহানবীর পবিত্র লাশ সমাধিস্থ হওয়ার পূর্বেই ইসলামের দেহ ও প্রাণ একসাথে মহাকালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে যেত না, কে বলতে পারে আরব আবার তিমির আঁধারে নিমজ্জিত হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ই ইসলামের মহান রক্ষক। কোরআন—১৫: ৯, ৩: ১৯১, ২৩: ১১৫, ৩৪: ২৮, ১০: ৩৭, ৩৮, ৬৪, ৩৩: ৪৬, ৬: ৩৪, ১১৫, ৩৫: ৪৩।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে:

"পথ ভাবে আমি দেব
রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব
হাসে অন্তর্যামী।" —রবীন্দ্রনাথ

এইভাবে ইসলাম যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে গেছে, ইসলামের মহান কাণ্ডারী যখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, ইসলামের প্রকৃত আশ্রয়দাতা, মহা-দুর্দিনের

বন্ধু আনসারগণ যখন মোহাজিরদের বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছে, খেলাফতের আসনলাভে উত্তেজিত উন্মত্ত, তখন রক্ষাকারী আর কে আছে! এহেন দুঃসময়ে, এ হেন দুর্দিনে আল্লাহ্ই ছিলেন একমাত্র রক্ষাকারী। মহান আল্লাহ্ কখন কোন্ কৌশলে কাকে রক্ষা করেন, কাকে বধ করেন, তা তিনিই একমাত্র জানেন, যে-জ্ঞান মানুষ কোনদিনই লাভ করতে পারে না। একদিন ইসলামের মহান দূত মহানবীকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য, নির্বাসিত করার জন্য মক্কার কোরেশগণ মহাচক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তাঁর রক্ষার্থে আল্লাহই ছিলেন 'শ্রেষ্ঠতম কৌশলী'। কোরআন ৮: ৩০, ৩: ৫৪, ৮৬: ১৫-১৭। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি—মহান অল্লাহর কৌশল কিভাবে ইসলামকে রক্ষা করল।

ইসলাম যখন মক্কার মাটিতে অত্যাচারে জর্জরিত, তার জীবনদীপ যখন নির্বাপিতপ্রায়, মহাপ্রচারক মহানবী হতে অন্যান্য সকলেই যখন রণক্লান্ত, হতাশা নিরাশা ব্যতীত আর কিছুই যখন তাদের চোখে পড়ছে না, তখনই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দিলেন মহা আশ্বাস:

হে পান্থ পথে তুমি ভীত কেন
জগৎ আমার হাতে নীত যেন।
উদাস কেন গো আজি হৃদয় বিকল
ঘুচাব হৃদয় ভার রও অবিচল। কোরআন—৬৫ :৩।

ঠিক ঐ একই সময়ে ইয়াসরেবে (মদিনার বুকে) সুচতুর ইহুদির প্রতারণায়, উত্তেজনায়, উৎসাহে ও চরম দুরভিসন্ধিতে সেখানকার দুই প্রধান গোত্র আস্ ও খাজরাজ পরস্পর পরস্পরের সাথে সুদীর্ঘকালের বিরামবিহীন দ্বন্দ্বে, কলহে এতই রণক্লান্ত, এতই বিরক্ত; তাঁরা আর মোটেই দ্বন্দ্বে ও কলহে নিজেদের ব্যাপৃত করতে মোটেই ইচ্ছুক নন। তাঁরা যেন মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন—এমন একটি মহান ব্যক্তিত্বকে যাঁর হস্তক্ষেপে তাঁরা ঐ চিরদ্বন্দ্ব হতে, ঐ কুটভরা ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষা পান। যোগাযোগও হয়ে গেল মক্কার মাটিতে মহানবীর সাথে। এই যোগাযোগ ও সাক্ষাৎই পরবর্তীকালে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত। মহানবীর মাধ্যমে আউস বা আস্ ও খাজরাজ গোত্র মিলিত হল। একে অন্যের বন্ধু হল, চিরদিনের শত্রুতা পরম মিত্রতাতে পরিণত হল। ইসলামের ইতিহাসে আস্ ও খাজরাজ গোত্রের এই মহামিলনই একদিন মদিনার বুকে ইহুদিদের হাত হতে, শত ষড়যন্ত্রের হাত হতে ইসলামকে রক্ষা করল। মহান আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হল আস্ ও খাজরাজের মিলনের দ্বারাই।

কি অপূর্ব কৌশল! দীর্ঘদিন পরে আবার যখন মদিনার বুকে খেলাফতের

মহাসঙ্কট কাল দেখা দিল, যখন আনসার অর্থাৎ আস্ ও খাজরাজ গোত্র এবং মোহাজিরগণ অর্থাৎ মক্কার কোরেশগণ খলিফা পদ নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছেন, কেউই কাউকে বরদাস্ত করছেন না, এমনকি উভয়পক্ষের তরবারিও ঝন্ ঝন্ রবে বেজে উঠেছে; তখনই মহান আল্লাহ্ আবার তাঁর সেই একই কৌশল প্রয়োগ করলেন। শতাব্দীর সুপ্ত বিচ্ছেদ ও কলহের কথা আবার দুই গোত্রের অন্তরকে আঘাত করল। দুই গোত্রই মনে মনে স্থির করে নিল মোহাজিরদের মধ্যে হতেই খলিফা নির্বাচিত হোক, তবুও যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী হতে কোনক্রমেই খলিফা নির্বাচিত না হয়। পরিণতিতে তাই ঘটল। মোহাজিরদের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচিত হলেন। মহান আল্লাহ্ একবার ঐ দুই গোত্রের মিলন দ্বারা ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন, আবার একবার বিচ্ছেদ দ্বারা আল্লাহ্ তাকে সুরক্ষিত করলেন।

বশির বিন সাদের চমৎকার ভাষণ :

ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞ আবু ওবায়দা একটি কথা আনসারদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, "হে আনসারগণ! তোমরা কি ভুলে গেছো, ইসলামকে বক্ষার্থে সেদিন তোমাদেরই তরবারি প্রথম খাপমুক্ত হয়েছিল, আজ আবার ইসলামের ধ্বংসার্থেও তোমাদেরই তরবারি কি প্রথম খাপমুক্ত হবে!" এই ছোট্ট কথাটি সমস্ত আনসারগণকে ক্ষণিকের মধ্যেই ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা যেন হঠাৎ আপন আপন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ঐ কথাটি শোনার পর আনসাব নেতা বশির বিন সাদ আর স্থির থাকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে পড়লেন :

"আল্লাহর কসম! হে আনসার ভাইগণ! আমরা একদিন মহানবীকে ও তাঁর সকল সহচরবৃন্দকে অকৃত্রিম প্রাণে ভালবেসেছি, সাহায্য করেছি; নিজেদের সমস্ত সম্পদকে দু'ভাগ করে তাঁদের ভাই রূপে দান করেছি, এমনকি নিজেদের সর্বাপেক্ষা পরমা সুন্দরী স্ত্রীকেও বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাদের দান করেছি। কিন্তু আমি আজ কসম করে বলতে পারি যে, এই সমস্ত করার পেছনে এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, আমরা মহানবীর পর খেলাফতের পদ দখল করব। আমি আবার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমরা ঐ সমস্ত করেছিলাম, কেবলমাত্র এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পরকালের জন্য, মহানবীর ভালবাসার জন্য, ইসলামের প্রচারের জন্য ইত্যাদি। আমি আনসার ভাইদের জিজ্ঞাসা করি এর জন্য আমাদের কোন গর্ব বা অহঙ্কার করা কি উচিত হবে, অথবা দুনিয়ার কোন সুখ-সম্পদ কামনা করা কি আদৌ সমীচীন হবে! আল্লাহই কি আমাদের সকল প্রকার ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট নন! আমরা কি আমাদের আল্লাহর দরবারের অসীম পুরস্কারকে দুনিয়ার দুদিনের ক্ষুদ্র পুরস্কারের জন্য চির জলাঞ্জলি দেব। হে আমার আনসার

ভাইগণ! দুনিয়ার ইতিহাসে, ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক—আমরা একদিন আমাদের মোহাজির ভাইদের জন্য যেমন সব কিছু বিলিয়েছিলাম, আজও সেই মন, সেই প্রাণ নিয়ে ইসলামের খলিফা পদটিকেও তাঁদের উপহার দিলাম।" অপূর্ব ফল ফলল এই ঐতিহাসিক ছোট্ট ভাষণটিতে।

আবুবকরের প্রস্তাব :

বশির বিন সাদের ঐ ঐতিহাসিক ভাষণে সকল আনসারই যেন নীরব হয়ে গেলেন। যেন সকলেই মৌন সমর্থন জানিয়ে দিলেন। বিজ্ঞ আবুবকর আর কালবিলম্ব না করেই একদিকে ওমর ও অন্যদিকে আবু ওবায়দাকে রেখে ছোট্ট একটি ভাষণে শেষ প্রস্তাব রাখলেন—

"হে আনসার ভাই! আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আমরা ও তোমরা সকলেই একই আল্লার বান্দা, একই নবীর উম্মত, আমরা সকলেই ভাই-ভাই। আমাদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি যেন নষ্ট না হয়, তাহলে আমরাও নষ্ট হয়ে যাবো। আমরা কথা দিচ্ছি যে তোমাদের পরামর্শ ব্যতীত আমরা কিছুই করব না। আমার এক পাশে হযরত ওমর, ও অন্য পাশে হযরত আবু ওবায়দা। উভয়েই উপযুক্ত মানুষ, তোমরা যাঁকে ইচ্ছা খলিফা নির্বাচিত কর।"

ওমরের বয়াত গ্রহণ :

আবুবকরের এই প্রস্তাব শোনার পর আনসারগণ একে অন্যের দিকে লক্ষ্য করছেন। এর মূলে গুরুতর একটা কারণ ছিল। এই দু'জনেরই অপেক্ষা আবুবকর ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তি খলিফা পদের জন্য। এঁদের দু'জনকেই ওঁর নিকট বেশ কিছুটা ম্লান দেখাচ্ছিল। তাই ওমর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—" হযরত আবুবকর! আমি আপনার এই প্রস্তাবে শ্রদ্ধার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করলাম। আমি মনে করি, আপনিই খলিফা হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। মহানবীর জীবিতকালে কে মসজিদে-নববীতে ইমামতি করার সম্মান লাভ করেছিলেন, তিনি ছিলেন—আপনিই। স্বযং মহানবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নামাজে ইমামতির মহাসম্মান কে লাভ করেছিলেন, কাকে মহানবী প্রতিনিধিত্বের এই মহাগৌরব দান করেছিলেন, তিনি—আপনিই। সুতরাং জ্ঞানে-গুণে, সম্মানে-সেবায় সকল কিছুতে আপনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। অতএব আপনিই আমাদের মধ্যে খলিফা হবেন। আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমরা সকলেই বয়াত হবো।" এই বলে হযরত ওমর প্রথম আবুবকরের হাতে হাত রেখে বয়াত হলেন। আবু ওবায়দা

তৎক্ষণাৎ ওমরের অনুসরণ করে বললেন—"সওর পাহাড়ের গুহায় আপনি ছিলেন মহানবীর একান্ত ও স্বনামধন্য সঙ্গী—দুজনের একজন" ৯:৪০। আপনিই মসজিদে নববীর মহানবীর জীবিতকালের ইমাম। সুতরাং আপনি আমাদের মধ্যে অতুলনীয় মানুষ। আপনি হাত রাখুন। আমি বয়াত হবো।" অতঃপর তিনি বয়াত হলেন। অর্থাৎ শপথ নিলেন।

ওমর ও আবু ওবায়দা আবুবকরের হাতে বয়াত করার পর বশির বিন সাদ দ্রুত অগ্রসর হলেন এবং শপথ নিলেন। হাবাব বিন মানজার এটি দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে বলে উঠলেন—বশির বিন সাদ! তুমি তোমার স্বজাতির মান-সম্মান মাটিতে লুটিয়ে দিলে। তুমি কি তোমার চাচাতো ভাই সাদ বিন ওবায়দাকে আমির পদে দেখতে চাও না! উত্তরে বশির বললেন—আমি স্বজাতির মর্যাদা আদৌ নষ্ট করিনি। মোহাজিরদের সাথে আমি বিবাদ করতে মোটেই রাজি নই। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দিতে আমি দ্বিধা করি না। আল্লাহ্ যাঁকে সম্মান দিয়েছেন, মহানবী যাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাঁকে আমরা কি করব! কোন চোখে দেখবো! হে আনসারগণ! আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলের খাতিরে তোমরা বিবেককে বন্ধক রেখো না। একদিন যেমন ইসলামেরই খাতিরে সমস্ত কিছুকেই বিসর্জন দিয়েছিলে অবলীলাক্রমে, আজ সেই প্রতিষ্ঠিত ইসলামের খাতিরে আবার একবার জাগতিক লোভ-লালসাকে ত্যাগ কর, বিবেকের প্রয়োগ কর:

জিজ্ঞাসা তোমাকে আর তোমার চিত্তকে
তুমি যে-মানব সেই মানব-বিত্তকে।
যে জন অক্ষম এই জীবন-জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু-মহিমায়।
আগাছা গুল্মলতার রূপ বিদ্যমানে
কি ফুল ফুটিবে তব হৃদ্ কুঞ্জবনে।

বশির বিন সাদের কথাগুলো আস্ ও খাজরাজ উভয় গোত্রের লোককে একেবারেই মুগ্ধ করে তুলল। সকলেই পরম আগ্রহে একের পর এক আবুবকরের হাতে বয়াত গ্রহণ করতে থাকলেন। তখনও দিনের সূর্য অস্তমিত হয়নি, এদিকে দ্বীনের রবি ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন।

মাহ্বুবে রসুল, মাহ্বুবে খোদা:

হযরত আবুবকর ওমর ও আবু ওবায়দার সঙ্গে গৃহে ফিরলেন। নানা কথা, নানা ঘটনা আবুবকরের মনকে আজ আলোড়িত করতে থাকল। তখনও মহানবীর নশ্বর লাশ শায়িত। আবুবকরের নিজেকে খুবই ভারাক্রান্ত মনে

হচ্ছিল। যে গুরুভার, যে গুরুদায়িত্ব এতদিন মহানবীর কাঁধে ছিল, সেই ভার আজ তাঁর কাঁধে এল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুভার। কেননা মহানবী ও তাঁর মধ্যে ছিল আসমান ও জমিনের পার্থক্য। তিনি ছিলেন নবীশ্রেষ্ঠ, আর ইনি ছিলেন উম্মতশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন আল্লাহর দূত, ইনি ছিলেন নবীর দূত। তিনি ছিলেন—'বিশ্বকরুণা', ইনি ছিলেন দয়ালু মানুষ। সুতরাং তাঁর মত মানুষের দায়িত্ব এঁর কাঁধে অর্পিত হলে, তা একটু বেশি ভার মনে হওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। তাই তাঁকে ভারাক্রান্ত মনে হয়েছিল।

আবুবকর একান্ত নিষ্ঠার সাথেই ইসলামের সেবায় নিজকে নিয়োজিত করেছিলেন। যেখানে ছিল না কোন লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, যশ-মান, ধন-জন ইত্যাদি। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার এক ঘণ্টা পূর্বেও তিনি জানতেন না যে, তিনিই খলিফা হতে চললেন। চিরদিনের সরল মানুষ, সহজ মানুষ, সত্যবাদী মানুষ, মানুষের পরোপকারী মানুষ, গরিবের আশ্রয়স্থল আবুবকর ধ্যানে ও জ্ঞানে একটিমাত্র জিনিসকেই স্থান দিয়েছিলেন—সেটি ইসলাম। ইসলামের সেবায় যা কিছুই করতে হোক, তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন। আজ খলিফা নির্বাচনেও তিনি মন-প্রাণ দিয়ে নেমে পড়েছিলেন। যাতে ইসলামের কোন ক্ষতি না হয়। তিনি তাঁর দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন আনসারদেব মধ্যে খলিফা নির্বাচিত হলে ইসলামের কেবল ক্ষতিই হবে না, ইসলামের অস্তিত্বই টিকবে কিনা সন্দেহ। তাই তিনি ঐ কাজের মনেপ্রাণে বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধিতা কোন মানুষের বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিল না। কারো স্বপক্ষে বা বিপক্ষেও ছিল না। তাঁর মনের কোণে কোথাও এরূপ চিন্তাও ছিল না। তিনি যা কিছু করতেন, তা ইসলামের জন্যই করতেন। আজও যা করলেন তা ইসলামের জন্যই করলেন। মোহাজির বা আনসার বলে পৃথক কোন বস্তু তাঁর নিকট ছিল না। তাই আজ সমস্ত কলহ, সমস্ত ঝগড়া, সমস্ত বিসংবাদ, পরামর্শ হতে গোপন পরামর্শ, কৌশল হতে মহা-কৌশল, কত জনের ষড়যন্ত্র, কত জনের গোপন সাধ, কত জনের উচ্ছৃঙ্খলতা, উসকানি, কত বাগ্মীর ক্ষুরধার বক্তৃতা, কত বীরের তর্জন-গর্জন, কত দুরাচারের কত দুরাশা!, কত পাপীর কত পরিক্রমা, বিশ্বাসঘাতক-বেঈমান, কত ইহুদির আত্মহারা আহ্লাদ সমস্ত কিছুই নতি স্বীকার করল এক আত্মিক বলে বলীয়ান মাহবুবে রসুল, মাহবুবে খোদা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট।

এই জয়টি ছিল—আল্লাহর জয়, আল্লাহর রসুলের জয়, ইসলামের আদর্শের জয়, পুণ্যাত্মা হযরত আবুবকরের পবিত্র আত্মার জয়, তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার জয়।

হে মোর মাবুদ আল্লাহ্ অন্তরতব
আমার সকল কাজ সহজ কর।
হে মোর মাবুদ আল্লাহ্ অন্তরতর
সকল কাজেতে মোরে সফল কর।
হে মোর মাবুদ আল্লাহ্ অন্তরতর
বিনীত প্রার্থনা মোর বিজয়ী কর।

কোবআন: ৪:৪৫, ২০:২৫-২৬, ২২:৭৮, ৩৩:৩, ৩৫:১১, ৩৯:৫৩, ৫৮:৭, ৬৫:৩, ৭৭:২০।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর

একদিকে মহানবীকে হারানোর ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা, অন্যদিকে ইসলামের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী সম্পর্কে ভয়াবহ পরিস্থিতি আবু বকর ও ওমরের মতো মানুষকে বিচলিত করে তুলেছিল। সাফিফায়ে বনি সাদায় বহু কথা কাটাকাটির পর, বহু তর্ক-বিতর্কের পর আবুবকর সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, ক্লান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে আবুবকর ও ওমর বাড়ি ফিরলেন। সারা রাত্রি নানা চিন্তা, নানা ভাবনার মধ্যেই কাটল। তখনও মহানবীর পবিত্র দেহ সমাহিত হয়নি। এরই মধ্যে একটি মহাপবিত্র যুগের অবসান হল।

ভোরের আযান শোনা মাত্রই সকলেই ব্যাকুলভাবে একত্রিত হলেন নবীবিহীন মসজিদ-ই-নববীতে অর্থাৎ নবীর মসজিদে। তখনও হয়তো অনেকেই জানেন না বিগত সন্ধ্যাতে আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। সমস্ত মানুষকে সম্যকভাবে অবগত করানোর জন্য হযরত ওমর সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দিলেন—

"হে মুসলিম ভ্রাতাগণ! রসুলে করিম এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের আশা ছিল, তিনি আরো বহুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদেব পথ নির্দেশ দেবেন। কিন্তু মানুষের জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে। এখানে কোন ব্যতিক্রম হয় না। সকলকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবেই। আমি গতকাল আবেগবশত, মহানবীর প্রতি চরম ভালবাসাবশত বলেছিলাম—তিনি মরেননি, মরতে পারেন না। কিন্তু আজ অতীব দুঃখের সাথেই বলছি—কোরআন ও হাদিসে এরূপ কথা কোথাও নেই। ববং বিপরীতটাই আছে। সুতরাং গতকালের কথার জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাই। আমাদের প্রিয় 'রসুল' সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমাদের কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। যার জন্য আমাদের সম্মুখে আছে পবিত্র কোরআন ও হাদিস। অধিকন্তু আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে নবী ও রসুলগণ কখনও সাধারণ মানুষের মতো নহেন। তাঁদের মৃত্যু কি সাধারণ মানুষের মৃত্যু নহে। তাঁরা কেবল মাত্র পর্দার অন্তরালে চলে যান। তাঁবা সশরীরে আমাদের মধ্যে হাজির না থাকলেও তাঁদের আত্মা আমাদের মাঝে সদা জাগ্রত। তিনি আমাদের চলার পথে যা কিছু দরকার, সমস্ত কিছুই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁর বাহ্যিক অন্তর্ধানে আমাদের চলাব পথ

কোনক্রমেই বিঘ্নিত হবে না। অধিকন্তু আমাদের মধ্যে মহান আল্লাহ্ তাঁর পরম করুণাবশত এমন একজনকে দিয়েছেন, যিনি ছিলেন মহানবীর বিপদে বন্ধু, অকৃত্রিম পরামর্শদাতা, অফুরন্ত অনুরাগী, অকাতরে সমস্ত উৎসর্গকারী, অবলীলায় সমস্ত বিপদ বরণকারী এবং অসীম বিশ্বাসী। তিনি কে! তিনিই তো মহান আবুবকর। তিনি গতকাল সফিফায়ে বনি সাদায় খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। আসুন আমরা সকলেই তাঁর সম্মানে দণ্ডায়মান হই, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি; এবং নব উদ্যমে চলার পথে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করি।" হযরত ওমরের ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকলেই হযরত আবুবকরের নিকট বয়াত গ্রহণ করলেন।

অতঃপর সর্বপ্রথম ইসলামের প্রথম খলিফা হিসাবে মসজিদে নববীতে মহানবীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে একটি ছোট্ট ভাষণ দিলেন—

"হে মুসলিম ভাইগণ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি সর্বশক্তিমান, চির জীবিত, নিত্য বিরাজমান। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। আপনারা সকলেই জেনে রাখুন যে, খেলাফতের জন্য আমার কোনদিনই এতটুকুও আগ্রহ বা কোন আকাঙ্খাই ছিল না। এ বিষয়ে আমি কোনদিনই এতটুকু চিন্তাও করিনি। আমি নিজেকে এরূপ কঠিন দায়িত্ব হতে অনেক দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। এই গুরুভার আপনারা আমার ওপর অর্পণ না করলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু যে কারণেই হোক গুরুদায়িত্ব আজ আমার কাঁধে। আমাকে আজ শতবার চিন্তা করতে হবে, যে গুরুদায়িত্ব আজ আপনারা আমার ওপর ন্যস্ত করলেন, আমি যেন সেই গৌরবজনক গুরুদায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান করতে পারি। অবশ্যই আল্লাহর অপার রহমত ব্যতীত তা কোনদিনই সম্ভব নয়।

আমার ধারণা ছিল, আপনারা আমার অপেক্ষা কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব দেবেন। কেননা আমি আপনাদের মধ্যে মোটেই যোগ্যতর ব্যক্তি নই। আমা অপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে আছেন। তবুও আপনারা আমাকে খলিফা নির্বাচিত করলেন। এখন আমি আল্লাহর রহমত ও আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি আজ প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি, আমি যত দিন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে যতটুকু অনুসরণ করব, আপনারা ততদিন ততটুকুই আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যদি ঠিক পথে চলি, তবে আমাকে অনুসরণ করবেন, আর আমি যদি ভুল পথে চলি, তাহলে আমাকে সংশোধন করবেন। সত্য ও ন্যায়ই হবে আমাদের একমাত্র নীতি, অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা কোন জাতি বড় হতে পারে না। আপনারা উঠুন, নামাযে দাঁড়ান, আল্লাহ্ আমাদের সবার ওপর তাঁর অসীম রহমত বর্ষণ করুন।" এখানেই আবুবকর সর্বপ্রথম 'খলিফাতুর রসুল' (অর্থাৎ রসুলের খলিফা) এই উপাধি গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের নিকট প্রথম যে কাজটি সর্বাপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দিল, তা ছিল মহানবীর দাফন পর্ব। মহানবীর সমাধি কোথায় হবে, এই নিয়ে মহাসমস্যা দেখা দিল। কেউ বলে—মদিনায়, কেউ বলে মক্কায়, কেউ বলে মদিনার এখানে, কেউ বলে ওখানে, কেউ বলে মক্কার ঐ স্থানে, কেউ বলে অন্য স্থানে। এককথায় অফুরন্ত গোলযোগ দেখা দিল। ধীরমতি আবুবকর এগিয়ে এলেন সবার মাঝে। সামান্য একটি কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে কথার দাবালন এক নিমিষে নিভে গেল। তাঁর কথাটি ছিল—আমি জীবিতাবস্থায় মহানবীকে বলতে শুনেছি—'নবীগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁদের সমাহিত করতে হয়; এই কথানুযায়ী অপরাহ্নে বিবি আয়েশার কক্ষেই মহানবীকে সমাহিতো করা হল। জানাজা নামায অনুষ্ঠিত হল। মহানবীর এই ঐতিহাসিক জানাজা নামাজে কোন ইমাম ছিলেন না, সকলেই সারিবদ্ধভাবে দলে দলে দোয়া-খায়ের করলেন। এখানেই এই পর্বটি শেষ হল।

খেলাফতের অন্তর্বিপ্লব :

আরব জাহান কোনদিনই কোন তন্ত্রের অন্ধভক্ত ছিল না। যখন যেটির প্রয়োজন বুঝেছে, তখন সেটির প্রয়োগ করেছে। তবে তাদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্যের একটা স্থান ছিল। তবুও সে স্থানটিও অন্ধ ছিল না। বয়োজেষ্ঠ্যকেও জ্ঞানে এবং গুণেও বড় হতে হতো। এককথায় আরব জাহান তাদের শাসনতন্ত্রকে ইজতেহাদী করে তুলেছিল। অর্থাৎ সকলে বসে পরামর্শ করে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিত। এখানে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কোন কিছুবই স্থায়ী মূল্য ছিল না। ইসলামে বা কোরআনেও কোন তন্ত্রের প্রতি প্রকাশ্য বিশেষ কোন ঘোষণা নেই। সেখানেও সকলের সাথে পরামর্শ কবেই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। মহানবীও তাঁর জীবিতকালে তাই করেছিলেন। মদিনার বুকে নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা গোষ্ঠীকে নিয়ে তিনিই প্রথম বিশ্বের বুকে নিখুঁত Republican State গঠন করেন। সুতরাং তিনি নিজেও বিশেষ কোন তন্ত্রকে গুরুত্ব দেননি। নানা ব্যাপারে, নানা কাজে তিনি শুধু মানব-কল্যাণে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানব-কল্যাণ, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া নয়। কোন কাজেই ছলনা, চাতুরি, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা যেন না থাকে। তিনি বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন—মানুষের কাজ তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যকে তিনি অত্যন্ত খাঁটি রাখার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি জীবিতকালেই তাঁর কোন উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে যাননি। সবার মাঝে জিনিসটিকে মুক্ত রেখে গেছেন। যাতে সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মহানবীর তিরোধানের পর আরবে যে সমস্যাটি মাথা চাড়া দিল, তা কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, গোত্রগত নয়, এটি ছিল রাষ্ট্রগত সমস্যা। সেদিনের অসভ্য আরব আর নেই। এখন তারা এক ও একত্রিত। এই পরিস্থিতিতে এমন একজন মানুষের দরকার, যিনি ইসলামের মশালকে দিক-দিগন্তে ছড়িযে দিতে পারবেন। আমরা পূর্বেই বলেছি—আনসার ও মোহাজিবিনদের মধ্যে হতে দাবি উঠেছিল নেতৃত্বের। শুধু তাই নয়, উমাইয়া দলের পক্ষ হতে ওসমানের নাম এবং আব্বাসীয় দলের মধ্য হতে আলীর নামও উঠেছিল। কিন্তু যেভাবেই হোক সেখানে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

আবুবকরের নিকট সকলেই আনুগত্য স্বীকার করলেন। কিন্তু বাকি রয়ে গেলেন স্বয়ং আলী, বিবি ফাতেমা ও হাশেমী বংশের আরো কিছু মানুষ। বিবি ফাতেমার ধারণা ছিল মহানবীর ইন্তেকালের পর তাঁর স্বামী হযরত আলী প্রথম খলিফা হবেন। কেননা তিনি ছিলেন জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, বীরত্বে অতুলনীয় ব্যক্তি। আবার বংশের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তি, অধিকন্তু স্বয়ং মহানবীর জামাতা। এতগুলো কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে খলিফা নির্বাচন না করায় খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা মনের দিক থেকে অপরিসীম কষ্ট পান। এবং খুবই অসন্তুষ্ট হন। এই অসন্তোষের সাথে আরো একটি অসন্তোষ দানা বাঁধল। মহানবীব ফিদকনামে একটি ফলের বাগান ছিল। তাঁর ওফাতের পর বিবি ফাতেমা তাঁব একমাত্র উত্তরাধিকাররূপে সেটিকে পাওয়ার জন্য আবুবকরকে বলেন। কিন্তু আবুবকর তাঁর দাবি বাতিল করে দেন এই বলে যে—আমি নিজ মুখে শুনেছি মহানবী বলেছেন—"নবী ও রসুলগণের কোন ওয়ারিস নেই।" সুতরাং তাঁদেব পবিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁদের মিল্লাতের প্রাপ্য। এতে বিবি ফাতেমা নাকি আবুবকরেব ওপব খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনেকের মতে, হযরত আলী, জুবায়ের এবং আব্বাস ও আবো কতিপয ব্যক্তি বিবি ফাতেমার গৃহে একত্রিত হয়ে আলোচনা কবেন। তাঁদের কথায—নবুয়ত এক রুহানি সম্পদ। এর উত্তরাধিকার ভোটে নির্ণীত হতে পাবে না। এর সাথে রক্তের ও আত্মার সম্পর্ক থাকা চাই। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বিবি ফাতেমাই মহানবীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করলে হযরত আলীই খেলাফতের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত দাবিদার। এই মতের সমর্থনে আলীর ভক্তবৃন্দ একটি হাদিসেরও উল্লেখ কবেন। বিদায হজ্জে মহানবী আরাফতের ময়দানে বলেছিলেন—"আমাকে যারা ভালোবাসবে, তারা আলীকে 'মওলা' রূপে গ্রহণ করবে। আলিকে যারা সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন। আলীর যারা শত্রু হবে, আল্লাহ্ তাদের শত্রু হবেন।" 'মওলা' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর অর্থ 'শাসক এবং বন্ধু'

দুই হতে পারে। আলীর ভক্তবৃন্দ আরো বলেন—সাফিফায়ে বিন সাদায় হযরত আলীকে কোন রূপ সুযোগ না দিয়েই অতি সত্বরতার সাথে খলিফা নির্বাচন করাটা আলীর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই মত আজও শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এখানে একটি কথা অতি নিরপেক্ষভাবেই বলা যেতে পারে, সেদিন ইসলামের খেলাফত নিয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তখন ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত না করলে, অবস্থা নিঃসন্দেহে আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। এই মহাবিপদ থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। এই তরান্বিত করার পেছনে বিশেষ করে হযরত আবুবকরের যে কোন রকমেরই কপটতা, দুরভিসন্ধি, চতুরতা, ছলনা ইত্যাদি কিছুই ছিল না, একথা সত্যবাদী শিয়াগণও আজও স্বীকার করেন মুক্ত কণ্ঠে। নিরপেক্ষ বিচারে বলতে গেলে বলতে হয়—সেদিনের ঘটনাস্রোতের আকস্মিক অস্থিরতাই আবুবকরকে খলিফা হতে বাধ্য করেছিল। এবং একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যেতে পারে যে, সেদিনের আবুবকরের তৎপরতাই ইসলামকে আশু বিপদ হতে রক্ষা করেছিল। এককথায় সমস্ত কথার মীমাংসা হয়ে যায়, যদি আমরা একটি কথা অকপট প্রাণে স্বীকার করি। মহানবীর জীবিতকালেই মসজিদে নববীতে মহানবীর প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য কে লাভ করেছিলেন! যিনি লাভ করেছিলেন, তিনিই ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। এবং এই ব্যক্তিই হযরত আবুবকর।

ধীরমতি আবুবকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ওমরকে সঙ্গে নিয়ে আলীর বাড়িতে গমন করলেন। তখন আলি বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁরা গৃহ দরজায় বিবি ফাতেমাকে সালাম জানালেন। তিনি গৃহ হতে বের হয়ে আবুবকর ও ওমরকে দেখামাত্র ক্ষোভভরে বলে উঠলেন—আপনারা খলিফা নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব কবেছেন। তারপরও আপনারা কোন মুখে জনগণের নিকট হতে বয়াত গ্রহণ করেছেন। আবুবকর ও ওমরের সেখানে আগমনে বহু মানুষ একত্রিত হয়। তখন বিবি ফাতেমা সকলকে লক্ষ্য করেই অত্যন্ত আবেগভরে বললেন—"আপনারা রসুলের উম্মত, আপনারাই বলুন, খলিফা নির্বাচনে কি ন্যায়-নীতির অনুসরণ হয়েছে! শের-ই-খোদা হযরত আলী কি মহানবীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতম নন! তাছাড়া তাঁর গুণাগুণ সকলের অপেক্ষা কি কোন অংশেই কম। তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা, জ্ঞান-গরিমার কথা, বীরত্বের কাহিনী কে না জানেন। বিদায় হজে আব্বাজান (মহানবী) তাঁর সম্পর্কে জনগণকে কি বলে গেছেন! সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন—আপনাব কথা একেবারেই সত্য। হযরত আলী খলিফার দাবিদার হলে আমরা তাঁরই হাতে বয়াত করতাম। কিন্তু তা হয়নি। এখন আমরা আর কি করতে পারি!

এই পরিস্থিতিতে ওমর তখন নীরব। আবুবকর ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন—আমার এতটুকুও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, বা নেই খলিফা হতে। এবং তিনি ওমরকে অনুরোধ করলেন—"আমাকে মুক্তি দাও, আমি পদত্যাগ করি। ইতিমধ্যে বাইরে হতে আলী এসে পড়েন। সকলে মিলে সৌজন্যমূলক আলোচনা হল। কিন্তু বয়াতের কথা আর উঠল না। অনেকের মতে, এই ঘটনার কয়েকদিন পবে আলী আবুবকরের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন, এবং সর্বান্তকরণে সকল ব্যাপারে সাহায্য করেন।

অনেকেই বলেন আলী আবুবকরের দরবারে হাজির হলে আবুবকব তাঁকে সাদরে আপ্যায়িত করেন। এবং তিনি আবুবকরের সকল গুণাবলীকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃতি দেন। তখন আবুবকর তাঁকে খোলামনে প্রস্তাব দেন—আপনি খেলাফত গ্রহণ করুন। আপনি মহানবীর অত্যন্ত নিকটজন, জামাতা, জ্ঞানে গুণে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। আবুবকর বারবার আলীকে বোঝাবাব চেষ্টা করলেন অকপট মনে, তিনি ইসলামের সেবক হতেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসেন, কোন পদের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। তিনি আলীকে বারবার খলিফাপদ গ্রহণ করতে অকৃত্রিমভাবে অনুরোধ করতে থাকায আলী তাঁব কথায অত্যন্ত মুগ্ধ হযেই দ্বিধাহীন চিত্তে আবুবকবেব হাতে হাত বেখে বযাত গ্রহণ করেন।

হযরত আলীর বয়াত গ্রহণের বিলম্বের কারণ:

হযরত আলীর খলিফা আবুবকরের হাতে বয়াত গ্রহণ সম্পর্কে নানা মুনিব নানা মত আছে। অনেকে বলেন হযরত আলী অন্যান্যদেব মতোই সঙ্গে সঙ্গে বয়াত গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলে—যখন অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণ বয়াত গ্রহণ করেন, তখন আলী সেখানে ছিলেন না। তিনি মহানবীর কাফন-দাফন ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এই কাজ সমাধা হওয়ার পরই তিনি কালবিলম্ব না কবেই বয়াত গ্রহণ কবেন। আবাব কেউ কেউ বলেন—হযরত আলীর মনঃক্ষুন্ন হয়েছিল আবুবকর খলিফা হওযায। তাই বয়াত গ্রহণে তাঁর বিলম্ব হয়েছিল। অনেকেই বলেন ব্যক্তিগতভাবে হযরত আলীর তেমন কোন মনঃক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু বিবি ফাতেমা তাঁর স্বামী আলী খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর মন বা মান রক্ষার জন্য আলী বিবি ফাতেমার জীবিতকালে বয়াত গ্রহণ করেন নি। মহানবীর ইন্তেকালের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা ইন্তেকাল করেন। এরপরই হযরত আলী আবুবকরের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

সুদূর অতীতের ঘটনা, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই হলফ করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়—কোনটা একেবারেই সত্য, কোনটা মিথ্যা। সকলেই নানা জল্পনা-কল্পনা, নানা উৎস, নানা ঘটনা ইত্যাদিকে বিচার-বিবেচনা করেই নানা মত দিয়েছেন। সেইজন্যই কোন ব্যক্তি হলফ করে কিছুই বলতে পারবেন না। হলফ করে শুধু একটি কথা বলা যেতে পারে সেটি হচ্ছে—যাঁদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন—সুমহান চরিত্রের অধিকারী, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কোন সীমা ছিল না। সুতরাং আলোচনা যে দিকেই যাক, কারো সম্পর্কে কোনদিনই যেন সামান্যতমও কটাক্ষ করা না হয়। তাহলে মহা ভুল হবে, মহা অন্যায় হবে। হযরত আবুবকর ছিলেন সে যুগের একজন তুলনাবিহীন মানুষ। আবার হযরত আলী ছিলেন ঐ যুগের শের-ই-খোদা, মহাজ্ঞানী, মহাবীর, মহামানব। বিবি ফাতেমাকে এককথায় বলা হয়—খাতুনে জান্নাত, অর্থাৎ স্বর্গীয় মহিলা; বা স্বর্গের সম্রাজ্ঞী। সমগ্র মুসলিম জাহান একাকী তাঁকে যে সম্মান দেন, সারা দুনিয়ার নারী সম্মিলিত-ভাবে তার অর্ধেক পান কিনা সন্দেহের কথা।

সিরিয়া অভিযান ও তার ফলাফল (৬৩২ খ্রীঃ)

খলিফার প্রথম পদক্ষেপ—মানসিক প্রস্তুতি:

খলিফা আবুবকর খেলাফতের আসনে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন দুর্যোগের মহা ঘনঘটা। একটির পর একটি দুর্যোগের দুঃসংবাদ আসতে থাকল। আজ মুসলমানরা কিছুটা শোকাহত, কিছুটা বিমর্ষ, কিছুটা ম্রিয়মাণ, কিছুটা চিন্তিত। আজ মহানবী নেই। তরী যেন মহাসাগরে, কিন্তু তরীর মহান কাণ্ডারী ওপারে। একদল ভণ্ড-নবীর আর্বিভাব হল। যারা নবুয়তের মিথ্যা দাবি উত্থাপন করে একদিকে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হল, অন্যদিকে ইসলামের অপরিমিত ক্ষতি সাধনও করতে মনস্থ করলেন। আবার একদল দেখা দিল, যারা মুরতাদ নামে পরিচিত, অর্থাৎ স্বধর্মত্যাগীর দল। এদের অনেকেই আপন আপন প্রাচীন ধর্মে ফিরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। এরাও ইসলামের এক মহা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করল। আবার একদল দেখা দিল, যারা ইসলামের একটি প্রধান শর্ত যাকাত দিতে অস্বীকার করল। খলিফা আবু-বকরের সম্মুখে এক সাথে এতগুলো ঝামেলা দেখা দিল। অথচ মহানবীর বর্তমানে এগুলোর কোনই মূল্য ছিল না। ভিতরে ভিতরে কোথাও

কোন দাবানল সামান্য জ্বলে উঠলেও বহিঃপ্রকাশের কোন সাহস ছিল না। কিন্তু আজ সকল নীরব বিদ্রোহ সরবে আকার ধারণ করল। কর্মনিষ্ঠ লৌহ মানব, খরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজদীপ্ত মনস্বী ধীরমতি আবুবকর সকল কিছুরই সম্মুখে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেবলমাত্র মনে রাখলেন, "আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, তুমি ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি শীর্ষস্থানের অধিকারী হবে, কার্য সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট। তুমি চিন্তা করো না, তুমি শিথিল হয়ো না, তুমিই বিজয়ী, যদি তুমি বিশ্বাসী হও।" ৩৯ :৫৩, ২০ :৬৮, ৩৩ :৩, ৬৫ :৩, ৩ :১৩৯। পবিত্র কোরআনের এই অমোঘ বাণী কয়েকটিকে মনে রেখে হযরত আবুবকর তাঁর মনকে স্থির করলেন এবং মানসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। চিরদিন তিনি শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন মহানবীর নিকট হতে, আজ শক্তি সংগ্রহ করলেন, মহানবীর দেওয়া পবিত্র কোরআন হতে।

কর্মনিষ্ঠ মহানবী :

ইসলামের ইতিহাসের সাথে বিজড়িত প্রায় সকলেই জানেন, মুতা যুদ্ধের কারণ ও তার করুণ পরিণতি। এটি সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীর জমাদিয়ুল আওয়াল মাসে, ৬২৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। মহানবী তাঁব সমগ্র জীবনে যে কয়েকটি জিনিসকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন, তাদের মধ্যে ছিল অত্যাচার অন্যতম। তিনি অত্যাচার ও অত্যাচারীকে কঠোর হস্তে দমন করার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কেননা পবিত্র কোরআনের অমোঘ বাণীর তিনিই ছিলেন প্রথম প্রয়োগকারী। " অত্যাচার করো না, অত্যাচার সহ্যও করো না।" ২ :২৭৯। এই মুতা যুদ্ধে অত্যাচারী রোমানরা বিশ্বের অজেয় বীর ইসলামের মহাবীর খালেদ বিন ওয়ালিদের দ্বারা মুখের মতো জবাব পেয়েছিলেন। যদিও এই যুদ্ধে স্বনামধন্য জায়েদ, জাফর, ও আব্দুল্লাহ শহিদ হয়েছিলেন। এই তিন জনের শাহাদতে মহানবী কত যে দুঃখ পেয়েছিলেন তা বর্ণণাতীত। জায়েদ ছিলেন তাঁর আজীবন ভৃত্য, জাফর ছিলেন অতীব সুপণ্ডিত, অসাধারণ বাগ্মী, হযরত আলীর ভ্রাতা, আব্দুল্লাহ ছিলেন মহানবীর একান্ত আপনজন। বিজয়ী খালেদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—আবার সিরিয়া প্রান্তে অভিযান পাঠাবেন।

তিন বছর পর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহানবী স্থির করলেন সিরিয়া প্রান্তে আবার অভিযান পাঠাতে। এবার অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন সেদিনের শহিদ জায়েদের পুত্র যুবক উসামাকে। যাঁর অধীনে ছিলেন বহু গণ্যমান্য বয়স্ক সাহাবীবৃন্দ। অনেকেই আপত্তি তুললেন উসামার বয়স কম, অধিকন্তু তিনি

একজন ক্রীতদাসের পুত্র। তাঁর অধীনে বয়স্ক সম্মানী ব্যক্তিগণ কি করে যুদ্ধে যোগদান করবেন। মহানবী কারো কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করেই বুঝিয়ে দিলেন যোগ্যতার সাথে বয়সের বা সম্মানের কোন সাথ বা শর্ত নেই। ঠিক তিন বছর পূর্বে উসামার পিতা ক্রীতদাস জায়েদকেও মহানবী ঐ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তখনও কথা উঠেছিল, কি করে আরব-সম্মানিত ব্যক্তিগণ একজন ক্রীতদাসের অধীনে কাজ করবেন। মহানবী সেদিনও ইসলামের সাম্যবাদকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বংশের গরিমা, বংশের মহিমা, গোষ্ঠীর অহমিকা, সম্প্রদায়ের আত্মম্ভরিতা, সকল কিছুকেই মহানবী চিরদিন পদদলিত করে মাথায় তুলেছিলেন মানুষের যোগ্যতাকে। মানুষের কর্মকে।

কর্ম যার নাহি জ্বালে জীবন বাতি
শুধাবে না কেহ তারে সে কোন জাতি।
মানব সমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ কুলের দাবি জাতের প্রলাপ।
তুমি এ সমাজ বুকে ফুল যদি হও
ছড়াবে সুবাস তব যে জাতেও রও।
আমি এ সমাজ বুকে অমানুষ হলে
শ্রেষ্ঠ আমার জাতি কি ফল বলে।
তুমি এ সমাজ বুকে চন্দ্র যদি হও
ছড়াবে তোমার জ্যোতি যে জাতেই রও।

সুতরাং আরব জাহান বুঝল, জগৎ জানলো মহানবীর নিকট নিছক জাত-পাতের বিশেষ কোন মূল্যই নেই। সকলেই শিরধার্য করলো মহানবীর চিন্তাধারাকে, মানুষের যোগ্যতাকে, মানুষের কর্মকে। ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র যুবক উসামা সেনাপতির পদে বহাল থাকলেন। চিরদিনের জন্য মানুষের যোগ্যতার জয় বিঘোষিত হল। বংশের গরিমা, বয়সের মহিমা সমাধিস্থ হল। মানব সমাজে মহানবীর জয় এখানেই, বিশ্বের বুকে ইসলামের জয় এখানেই।

মহানবী জীবিতকালে যে কাজটি করতে করতে অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, সেটি সিরিয়া অভিযান। তিনি নিজ হাতে উসামার হাতে ইসলামের পতাকাকে অর্পণ করে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথা অনুসারে উসামা মদিনার অনতিদূরে জর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে বিশাল সেনাবাহিনীসহ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হেনকালে মহানবীর অসুস্থতার

সংবাদ শ্রবণ করে উসামা তাঁর যাত্রা স্থগিত করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মহানবী ইন্তেকাল করলে উসামা সত্বর মদিনায় ফিরে এসে সেনাবাহিনীকে সাময়িকভাবে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ভাগ্যাকাশেও লাল মেঘ দেখা দিল। আকাশ বাতাস সকল কিছুই যেন স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা-ঝটিকা আরম্ভ হবে।

সেনাপতি উসামা :

হযরত আবুবকর খলিফা পদ বরণ করার কয়েকদিনেব মধ্যেই প্রথম দেখে নিলেন কোন্ কাজটির কত গুরুত্ব, কোন্ কাজটি কতখানি সত্বর সমাধা করার প্রয়োজন। বিজ্ঞ আবুবকর সর্বপ্রথম বুঝলেন মহানবীর অসমাপ্ত কাজটিকেই সবার আগে সমাপ্ত করার প্রয়োজন। তাই তিনি কালবিলম্ব না করেই সেই ক্রীতদাস পুত্র যুবক উসামাকেই নির্দেশ দিলেন সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে। উসামা খলিফার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জর্ফে হাজিব হলেন। সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকল। ইতিমধ্যে ইসলামের ভাগ্যাকাশেও বিপদের নানা ঘনঘটা দেখা দিল। যুবক উসামা অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই সেগুলো লক্ষ্য করছিলেন। লক্ষ্য করলেন ইসলামের ঘরে বাইরে যেন বিপদ আসন্ন। মেধাবী উসামা কয়েকজন বয়স্ক জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। অতঃপর মনে মনে স্থির করলেন আপতত এই অভিযানটি বন্ধ থাক। কেননা কেন্দ্রীয় বিশাল সেনাবাহিনী যদি বাইরে চলে যায় এবং অতর্কিতে মদিনা আক্রান্ত হলে রক্ষা করার কেউই থাকবে না। নানা চিন্তা ভাবনার পর আপন মনের সিদ্ধান্ত বা মতামত হযরত ওমরের ন্যায় সাহাবীর দ্বারা খলিফার নিকট পেশ করলেন। বহু বিশিষ্ট সাহাবীগণও উসামার ন্যায় খলিফার নিকট একই প্রস্তাব রাখলেন। খলিফা সবার কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু কারো পরমর্শ গ্রহণ করলেন না। তিনি সকলকেই একটি কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বুঝিয়ে দিলেন—স্বয়ং মহানবী তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা অভিযানের যে পতাকা বেঁধে গেছেন, সারা বিশ্ব এক নিমিষে শেষ হয়ে গেলেও সেটাকে খুলে ফেলা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথাও জানিয়ে দিলেন—স্বয়ং মহানবী যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাকে লঙ্ঘন করা বা অমান্য করা বা বাতিল করা আবুবকরের জন্য কোনদিনই তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এখানে আবুবকর ছিলেন একেবারেই অবিচলিত।

ভক্তপ্রাণ আবুবকর :

যখন কারো কোন কথায় আবুবকর কর্ণপাত না করেই দ্বিধাহীন চিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ দিলেন, তখন আনসার ও মোহাজেরিনদের পক্ষ হতে আবার একটি প্রশ্ন উঠল, তাঁরা সকলেই সমবেত ভাবে হযরত ওমরকে অনুরোধ করলেন খলিফা আবুবকরকে একটি কথা বলার জন্য। তাঁদের ইচ্ছা ছিল উসামার পরিবর্তে একজন বয়স্ক সাহাবীকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা। হযরত ওমর যথা সময়েই কথাটি খলিফার কর্ণগোচর করলে খলিফা ওমরকে বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"হে ওমর! তুমি মৃত্যুকে বরণ কর, আমি কি খেলাফতের আসনে বসে সর্বপ্রথম মহানবীর দেওয়া নির্দেশকে বাতিল করব, আমি কি মহানবীর দ্বারা নিযুক্ত সেনাপতিকে বরখাস্ত করব; আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে, আমি আমার জীবনে সমস্ত কিছুকে মেনে নিতে পারবো, শুধু পারবো না মহানবীর একটি স্নায়ুবিহীন লোমের সাথেও ধৃষ্টতা করতে। এখানে আমি চির আপসহীন, চির প্রতিজ্ঞ-প্রাণ। এইভাবে আমরা সিরিয়া অভিযানে মহান আবুবকরের মহৎ চরিত্রকে এক নিমিষে অবলোকন করার সুযোগ পেলাম। মহানবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য কত যে গভীর ছিল, কত যে অসীম ছিল, কত যে অবিচল ছিল, কত যে অকৃত্রিম ছিল; তাকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য সিরিয়া অভিযান ছিল আমাদের অফুরন্ত সুযোগ। মুসলিম জাহানে আজ কোটি কোটি মুসলমান আছেন, কিন্তু ভক্তপ্রাণ আবুবকর কি একটিও আছেন!

কখনও কোমল হৃদয় কুসুম সম
কোথাও পাহাড় হতেও কঠোরতম
কখনও প্রশান্ত প্রাণ সাগর সম
কোথাও আকাশ হতেও উদারতম।
বেগবান নদী তুমি কে তোমাকে রুখে
স্বয়ং বিধাতা ছিলেন স্রোতের সম্মুখে।
মহানবীর ছায়া তুমি তোমার প্রকাশ
ইসলামের মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত বিকাশ।

উসামার যুদ্ধযাত্রা :

অতঃপর হযরত আবুবকর অবিচলিত কণ্ঠে যুবক উসামাকে নির্দেশ দিলেন সিরিয়া অভিযানের জন্য সত্বর প্রস্তুতি নিতে। খলিফার নির্দেশমত উসামা

সেনপতির পদ গ্রহণ করে জর্ফে গমন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খলিফা এও নির্দেশ দিলেন, যাঁদের মহানবী এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যেন সত্বর জর্ফে গমন করতে সেনাদলে যোগদান করেন। এই নির্দেশমত হযরত ওমরের মত ব্যক্তিও জর্ফে গমন করলেন, কেননা মহানবী তাঁকেও সাধারণ সেনা বেশে যোগদান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর খলিফা আবুবকর জর্ফে উপনীত হলেন। সকল কিছুকে আপন নজরে পরিদর্শন করলেন। সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে উসামাকে কিঞ্চিত উপদেশও দিলেন। খলিফার আদেশক্রমে সেনাপতি উসামা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক সেনাবাহিনীকে ধীর পদে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। যখন খলিফা পদব্রজে উসামার পাশে পাশে গমন করছেন, তখন সেনাপতি উসামা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন এবং খলিফাকে করজোড়ে অনুরোধ করলেন—হয় আপনি ঘোড়াতে চাপুন, কিংবা আমাকে নামতে অনুমতি দিন। খলিফা উত্তর দিলেন—আমিও ঘোড়াতে চাপবো না, তুমিও ঘোড়া হতে নামবে না। কি ক্ষতি আছে, আমি যদি কিছুর্দূর পায়ে হেঁটে তোমাদের সাথে চলে আমার পদযুগলকে ধন্য করি।

এখন সেনাবাহিণী সম্পূর্ণভাবে জর্ফ শিবির ছেড়ে চলে এসেছে। এবার পুরোদমে যাত্রার পালা। হঠাৎ খলিফা সেনাপতি উসামার নিকট একটি আবেদন পেশ করলেন।—হে উসামা! তোমার অনুমতি পেলে আমি হযরৈত ওমরকে আমার সাথে মদিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমার উপদেষ্টা রূপে। আমি মনে করি, বিপদে-আপদে তিনি আমার পাশে থাকলে আমাকে যথাযথভাবে উপদেশ দিতে পারবেন। উসামা সঙ্গে সঙ্গে খলিফার আবেদনকে মঞ্জুর করে ওমরকে সেনাবাহিণী হতে মদিনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন ওমর খলিফার সঙ্গী হলেন মদিনার পথে।

মহানবীর যুদ্ধনীতি :

এবার খলিফা সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন—কয়েক মিনিটের জন্য সমস্ত সেনাবাহিণীকে নীরবভাবে দাঁড়িয়ে যেতে। সেনাপতি উসামা তাই করলেন। সেনাবাহিণী নীরব নিস্তব্ধ। অতঃপর খলিফা সেনাপতি ও সকল সৈন্যকে একবার ধীরকণ্ঠে মহানবীর যুদ্ধনীতিগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁরা যেন ঐ নীতিগুলোর বাইরে একটি পদক্ষেপও না রাখে। মহানবীর ঐতিহাসিক অমর যুদ্ধনীতি :

১) মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—যুদ্ধের উদ্দেশ্য অত্যাচার নয়, বরং

অত্যাচারীকে দমন করা, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, হিংসা নয় ভালবাসা, অশান্তি নয় শান্তি আনা, সম্পদ লুট নয় সম্পদের সৎ ব্যবহার, অবৈধ সঞ্চিত ধনকে সংগ্রহ করে অসহায় বঞ্চিত জনকে বণ্টন। দেশ জয় ও সম্পদ লাভের জন্য যে যুদ্ধ, তাকে একেবারেই হারাম বা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে এরূপ ঘোষণা আজ পর্যন্ত কেউই করা তো দূরের কথা, চিন্তাও করতে পারেন নি।

(২) সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ ছিল। মদ্যপান-ব্যভিচার ও লুঠতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) যুদ্ধক্ষেত্রকে তিনি আল্লাহর এবাদতখানায় ও বিচারাগারে পরিণত করেছিলেন। তাই সেখানে আল্লাহর উপাসনা ও ন্যায়বিচার অব্যাহত থাকত।

(৪) যুদ্ধলব্ধ মাল ১/৫ অংশ আল্লাহ্ ও রসুলের অর্থাৎ রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ বা গরিবদের জন্য; বাকি সব সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত।

(৫) যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথম আক্রমণ একেবারেই নিষিদ্ধ। অর্থাৎ অন্যায়কে প্রশমিত করা বা আত্মরক্ষা ব্যতীত ইসলামে কোন যুদ্ধ নেই।

(৬) ইসলামের যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র, তাই যে কোন রণহুঙ্কার নিষিদ্ধ, তকবির ব্যতীত। তাই ইসলামের সংগ্রামকে জেহাদ বলা হয়ে থাকে। জেহাদ অর্থ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(৭) ক. যুদ্ধে সৈন্য ব্যতীত যে কোন মানুষকেই আঘাত কবা একেবাবেই নিষিদ্ধ। মনুষ্য জগৎকে রক্ষা করো।

(৭) খ. যুদ্ধলিপ্ত প্রাণী ব্যতীত যে কোন প্রাণীকেই আঘাত করা একেবারেই নিষিদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের প্রাণীকেও কোনরূপ আঘাত করা নিষিদ্ধ। প্রাণীজগৎকে রক্ষা করো।

(৭) গ. প্রকৃতিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির গায়ে হাত দেওয়াটাও মহাপাপ। নদীর জল, পুকুরের জল কিংবা যে কোন জলাশয়কে বন্ধ করা বা বিষাক্ত করা নিষিদ্ধ। উদ্ভিদ জগৎকে রক্ষা করো।

(৭) ঘ. স্থাপত্য জগৎ-ঘর-বাড়ি উপাসনালয় প্রভৃতিকে রক্ষা করা সবার কর্তব্য। ধ্বংস করা মহাপাপ। স্থাপত্যজগৎকে রক্ষা করো।

(৮) রাজদূতকে হত্যা করা মহা অন্যায়, বিশ্বশান্তির পরিপন্থী।

(৯) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হোক, পূর্বে হোক, পরে হোক যে কোন শত্রু শান্তি বা সন্ধি প্রস্তাব দিলে, তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণের নির্দেশ। হোদাইবিয়ার সন্ধি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। পরবর্তীকালে সিফিফনের যুদ্ধে জয় অনিবার্য জেনেও হযরত আলী কুচক্রী মুয়াবীয়ার ছলে ভরা সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।

এটা ছিল মহানবীর শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(১০) শত্রু হোক, সৈন্য হোক, আত্মসমর্পণ বা আশ্রয় প্রার্থনা করলে সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করতে হবে।

(১১) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে। বিচারের পূর্বে বিন্দুমাত্র অবিচার বা অত্যাচার করা চলবে না।

(১২) সকল যুদ্ধই মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্যই, মানবতাকে বধ করার জন্য নয়। জেনে রেখো সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই অমনুষ্যত্বের বধ্যভূমি হবে।

অতঃপর খলিফা আবার উসামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—সতর্ক হয়ে চলবে, মহানবী তোমাকে যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা যথাযথভাবেই পালন করবে। আল্লাহ্‌র নামে অগ্রসর হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন, পরাজয়ের গ্লানি হতেও রক্ষা করবেন, তিনিই তোমাদের বিজয়ী করবেন। এইভাবে সেনাবাহিনীকে আল্লাহ্‌র নামে বিদায় দিয়ে ওমরকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা মদিনায় ফিরলেন।

যুদ্ধ :

সেনাপতি উসামা মহানবীর পরলোকগমনের ১৮ দিন পর তিন হাজার সৈন্য-সহ সিরিয়া যাত্রা করেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন এক হাজার অশ্বারোহী এবং বাকি পদাতিক। উসামার যাত্রা ছিল ওয়াদিউল-কোরার পাশ দিয়ে দুমার দিকে। এবং বনি কুদা নামক অঞ্চলে ছাউনি গাড়লেন। এই বনি কুদা ও খ্রীস্টান উপজাতিরাই একদিন উসামার পিতা যায়েদকে এই স্থানেই নিহত করেছিল। সুতরাং উসামার স্থির লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলটি। গুপ্তচরের দ্বারা নানা সংবাদ সংগ্রহ করে কে তাঁর পিতাকে বধ করেছিল, তা জেনে নিলেন। নীরব অত্যাচারের সরব উত্তর দিতে আজ সেনাপতি উসামা প্রস্তুত। যুদ্ধের স্থান নির্ণীত হল ঠিক যেখানে হযরত জায়েদ প্রাণত্যাগ করেছিলেন। একদিন যে স্থানে ইসলামের খ্যাতনামা তিনজন সাহাবী শহিদ হয়েছিলেন—সেনাপতি বেশে, আজ সেই স্থানেই সেনাপতি উসামা সেই তরবারি, সেই ঘোড়ায় চেপে ন্যায়ের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। উসামার নেতৃত্বে আকাশ-পাতাল মুখরিত হয়ে উঠল সেনাবাহিনীর তকবির ধ্বনিতে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-দামামা বেজে উঠল। এক একটি সৈনিক যেন মহান আল্লাহ্‌ব নামে তকবির ধ্বনিতে ("আল্লাহু আক্‌বার্") এক নিমিষে এক শত সৈনিকের শক্তি ধারণ করলেন। যখন সেনাপতি উসামা বিদ্যুৎবেগে বীর প্রবাহে রণভূমিকে কাঁপিয়ে তুলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুকুল বুঝতে পারল ইসলামের শক্তি কত দুর্বার, কত দুর্জয়। সঙ্গে

সঙ্গে সেনাপতি উসামার পিতৃহন্তা এবং জাফর ও আব্দুল্লার হন্তাগণ এবং অগণিত শত্রু-সেনা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আজ মনুষ্যত্বের বধ্যভূমি সিরিয়া প্রান্তরে বনি কুদা অঞ্চল মানবতার জয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ইসলামের ইতিহাসে পাঠক-পাঠিকা সকলেই জানেন, এই অঞ্চলেই একদিন মহানবী শান্তি প্রচারে বারবার বহু জ্ঞানীগুণীবৃন্দকে পাঠিয়েছিলেন। সেই নিরপরাধ নিরস্ত্র ব্যক্তিবৃন্দকে এই কুদাবাসীরাই অন্যায়ভাবে হত্যা করে এই যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল। তাই মহানবী চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের বধ্যভূমিকে মানবতার উপাসনালয়ে পরিবর্তন করতে। এই অভিযান শেষ করতে উসামার চল্লিশ হতে ষাট দিন সময় অতিবাহিত হয়েছিল। পরিশেষে ঐ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে এনে প্রচুর ধনরত্নসহ সেনাপতি উসামা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। খলিফা আবুবকর সবার কথা অগ্রাহ্য করে, সকল বিপদকে মাথায় নিয়ে মহানবীর প্রতি ভাবাতীত ভক্তি, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, অভাবনীয় ভালবাসা, নজিরবিহীন বিশ্বাস-সহ যুবক সেনাপতি উসামাকে যে গৌরবজনক গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন, উসামা তার সম্মানজনক সমাধানসহ সবার মুখ উজ্জ্বল করে দেশে ফিরলেন। আজ মহানবীর বিদেহী আত্মাও কত আনন্দিত।

ফলাফল :

মানব সমাজের উত্থান-পতনের ইতিহাসে, মনুষ্যত্বের মানবতার উত্থানে-উত্তরণে-বিবর্তনে সিরিয়া অভিযানের এক সুদূরপ্রসারী ফল দেখা দিয়েছিল সারা বিশ্বজুড়ে। অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো খ্রীস্টান ঐতিহাসিকগণ এর সমালোচনা করেছেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধ বলতে কেবলমাত্র ধনসম্পদ লুণ্ঠন, হত্যালীলা, সাম্রাজ্য জয়, ধ্বংস ইত্যাদি ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কিছুই বোঝেন না, তাঁরা মহানবীর যুদ্ধ বা জেহাদকে কিভাবে বুঝবেন। আমরা পূর্বেই মহানবীর ঘোষিত যুদ্ধনীতিতে মহানবীর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছি, যাঁরাই মহানবীর যুদ্ধ বা জেহাদ আলোচনা করেন, তাঁদের বোঝা দরকার, মহানবী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে বা ভাঙতে আসেননি। তিনি এসেছিলেন সমগ্র মনুষ্য সমাজের মুক্তির দ্বার খুলে দিতে। তাঁর খলিফা চতুষ্টয় ও তাঁকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছিলেন।

মহানবী জীবিতকালেই সিরিয়া প্রান্তে রোমানগণ ভীষণভাবেই ইসলামের বিরোধিতা আরম্ভ করেছিল। ঐ অসঙ্গত বিরোধিতার জন্যই মহানবীকে মুতা অভিযানের নির্দেশ দিতে হয়েছিল। মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিদ্রোহ তীব্ররূপ ধারণ করেছিল। রোমানগণ মানসিক প্রস্তুতি পর্যন্ত শেষ

করেছিল মদিনা অক্রমণের জন্য। হঠাৎ সিরিয়া প্রান্তে খলিফার বিশাল বাহিনীকে দেখামাত্র সকলেই হতবাক, হতভম্ভ ও নির্বাক। বিরাট রোমান শক্তি সেদিন শুধু স্তম্ভিত হয়নি, স্তিমিতও হয়েছিল। এই সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীকে দেখা মাত্রই রোমানদের মদিনা আক্রমণের সমর সাধ মিটে গিয়েছিল। তাঁরা আর একটি বারও চিন্তা করেনি মদিনা আক্রমণের। একদিকে যেমন খ্রীস্টান ও ইহুদিগণের মনোবল চুরমার হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ওখানকার স্থানীয় মুসলমানদের মনোবল একশত গুণ বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই অভিযানই ছিল মদিনা রক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং খ্রীস্টান-রোমান ও ইহুদিদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়।

সিরিয়া অভিযান কি করে মানব জাতির ইতিহাসে, মনুষ্যত্বের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করল, নতুন যুগের সূচনা করল। এটা একবার দেখবো। তখনকার দিনে সারা বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে বিশাল রোম সাম্রাজ্যে একটি মানুষ তিনি যত বড়ই বীর হতে মহাবীর হোন, তাতে কিছুই এসে যেত না। যদি তিনি বংশ গরিমায়, জাতপাতের নিরিখে কোন কুলীন পিতার ঔরসে ও কুলীন মাতার গর্ভে জন্ম না নিতেন, তাহলে তাঁকে কোন সেনাবাহিনীর সেনাপতি করা বহু দূরের কথা, একজন অশ্বারোহী সৈনিকেরও মর্যাদা দেওয়া হতো না। মহাবীর মহারণকুশলী হলেও পদাতিক সেনা হতে হত। এই ছিল সেদিনের সেনাদের ভাগ্যের কঠিন পরিহাস, নিষ্ঠুর ইতিহাস।

যখনই বিরাট রোমান বাহিনী দেখল বিশাল মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছেন একজন ক্রীতদাস পুত্র উসামা, বিশাল রোমান বাহিনীর অসংখ্য সেনাগণ এটা চিন্তাও করতে পারেননি, একজন ক্রীতদাস পুত্র সেনাপতির পদ অলংকৃত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনে প্রাণে শিহরণ দেখা দিল। এ কোন ধর্ম, এ কোন সমাজ। যে সমাজে মানুষের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, যে সমাজে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, যে ধর্মে মানুষের গুণাগুণ ও যোগ্যতাই তার মাপকাঠি, যে ধর্মে মানুষ একসাথে ওঠে-বসে, একসাথে খায়, একসাথে প্রার্থনা করে, একে অপরের সাথে অবাধ ভাবে বিবাহ বন্ধন গড়ে তোলে। এ সকল কিছুই তাদেরকে অবাক করল, মোহিত করল, মুগ্ধ করল। মহানবীর নীতি তাদের অন্তর আত্মাকে জয় করল। যে জয়ের পেছনে ছিল না কোন সেনাবাহিনী, কোন বিশাল শক্তিধর পুরুষের শক্তির হুমকি। মহানবীর নীতি যেন রোমান বাহিনীর মানুষকে জয় করার পূর্বেই তাদের মনকে জয় করল। তারা অভিভূত হল, তারা বুঝল এরা আমাদের শত্রু নয়, এরা আমাদের মিত্র, এরা আমাদের মুক্তিদাতা। সুতরাং তাদের অন্তর আত্মায় জেগে উঠল শ্রদ্ধা। হিংসা বিদ্বেষ বীতশ্রদ্ধা সকল কিছু হোল

শিথিল। তাই সেদিন বিশাল রোম সাম্রাজ্যের সীমানাতেই মহানবীর ক্ষুদ্র বাহিনী বিজয়ী হল। এ জয় ছিল মহানবীর মনুষ্যত্বের জয়, মানবতার জয়, মানুষের জয় এবং রোমানদের ঐ পরাজয় ছিল অমনুষ্যত্বের পরাজয়। অতএব কেউ যদি সিরিয়া অভিযানের জয়-পরাজয় কারণ নির্ণয় করতে চান, তাঁকে অনিবার্যভাবেই নির্ণয় করতে হবে মহানবীর নীতির জয় এবং রোমানদের দুর্নীতির পরাজয়।

বিশ্বের ইতিহাসে এই নীতির, এই জয়ের পরিণতি হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতের দাস বংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল এই নীতিরই জয়গান ঘোষণা করেছে। পরবর্তীকালে কত ক্রীতদাস, কত নিম্ন বর্ণ, কত গৌরবোজ্জ্বল পদমর্যাদা লাভ করেছে। মহানবীর মহান নীতি কত লাঞ্ছিত, কত বঞ্চিত, কত নিগৃহীত, কত অবহেলিত নরনারীর জন্য মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছে। আজও নতুন ভারতের মানুষের মুক্তির ইতিহাসে, দুর্গত মানবতাব ইতিহাসে, পরোক্ষে প্রত্যক্ষে মহানবীর ঐ নীতিরই চির জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। তাই সিরিয়া অভিযান ছিল দুর্গত নরনারীর মুক্তি অভিযান। সেনাপতি উসামা ছিলেন বিশ্ব নির্যাতিত সেনা-মানুষের প্রথম উন্নত প্রতীক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভণ্ড নবীর আবির্ভাব

হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযান ছিল পবিত্র নবী-জীবনের নির্ধারিত শেষ কাজ। যদিও আবুবকর এই কাজ সমাপ্ত করার গৌরবলাভ করেছিলেন। সিরিয়া অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম জগতে দেখা দিল—'গোদ' এবং 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'। গোদটি ছিল স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন, এবং ঐ গোদের ওপর বিষ ফোঁড়াটি ছিল—ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব।

সকল কালে, সকল দেশে ও সমাজে একটি জিনিস চিরাচরিত ভাবে ঘটতে দেখা যায়। যখন কোন দেশে বা সমাজে কোন কারণে যে কোন রকমের একটি বড় বিবর্তন আসে, তখন অধিকাংশ মানুষই গড্ডালিকা প্রবাহের মতো ঐ বিবর্তনে গা ঢেলে দেয়, বা প্রবেশ করে। এমনকি রাজনৈতিক বিবর্তনেও ওটা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, বিবর্তনের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে খুবই কম লোক আসে। কেউ আসে কিছু পাওয়ার আসায়, কেউ আসে হুজুগে মেতে, কেউ আসে অন্যের চাপে পড়ে ইত্যাদি। মহানবীর জীবিতকালে যে সমস্ত বেদুঈন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তারা আপন আপন পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। শুধু যে ফিরে গেল তা নয়, তারা মদিনা আক্রমণের জন্যও প্রস্তুত হতে থাকল। এর মূলে ছিল তাদের জন্মগত ও স্বভাবজাত প্রকৃতি, তারা ছিল চিরদিন দুর্বার, স্বাধীনচেতা, কোন নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা বলে তাদের জীবনে ছিল না। তারা ইসলামের মূল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামে প্রবেশও করেনি। তাই ইসলামের প্রতিও তাদের কোন আন্তরিক অনুরাগ বা ভালবাসা ছিল না। তারা চিন্তা করেছিল—ইসলাম একটি বড় গোষ্ঠী, তারা এর মাধ্যমে আরও বড় বড় লুটতরাজ করতে পারবে, তাদের শক্তি আরো অনেক গুণে বেড়ে যাবে। কিন্তু পরে তারা দেখলো ইসলামে মদ্যপান, ব্যভিচার, লুটতরাজ কোন কিছুই নেই, অধিকন্তু আছে নামায, রোযা, যাকাৎ প্রভৃতি কঠোব অনুশাসন ও কঠিন শাসনপদ্ধতি। এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন তারা মোটেই মেনে নিতে পারল না। তখন তারা আপন স্বভাবগত কারণেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এরাই ছিল স্বধর্মত্যাগীর দল, এবং এদের যারা নেতা ছিল—তারাই ছিল ভণ্ড নবী।

ঐ সময় অনেক ভণ্ড নবী দেখা দিয়েছিল। যাদের মধ্যে চারজন ইতিহাস কুখ্যাত। তাদের ধারণা ছিল একবার নিজেকে নবীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, তার মান-সম্মান-খ্যাতি-যশ-ধন-রত্নের আর কোন অভাবই থাকবে

না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করল নিজেদের নবীরূপে প্রতিপন্ন করতে। তাদের উদ্দেশ্যের মূলে কোন ভাল জিনিসই ছিল না। মহানবী বলেন—"মানুষের কার্যাবলী তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।" এদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই অসৎ এবং কার্যাবলীও ছিল একেবারেই নোংরা।

ভণ্ড নবীর প্রধান চারজনের তিনজন ছিল পুরুষ ও একজন ছিল মহিলা। পুরুষ—(১) আসওয়াদ আনসী, (২) মুসাইলামা, (৩) তুলাইহা, (৪) মহিলা—সাজাহ্।

আস্ওয়াদ আনসী :

ইয়ামেনের অধিবাসী আসওয়াদ আনসী ছিল আপন গোত্রের দলপতি। ধনে-জনে শক্তিশালী পুরুষ। হঠাৎ তার ইচ্ছা জাগল নবী হওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে দিল—তার নিকট ওহী (আল্লাহ্‌র বাণী) আসছে। সে এখন নবী। পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহে তার কথা বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই তার হাতে হাত মেলাল। তখন তার শক্তি আরো বেড়ে যাওয়ায় সে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মহানবীর নিযুক্ত শাসনকর্তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করে নাজরান প্রদেশ আক্রমণ করে ইয়ামেনের রাজধানী সানা নগরী দখল করল। তখন সেখানকাব শাসনকর্তা ছিলেন শাহার ইবনে বাজান। আনসী তাঁকে হত্যা করে তাঁর বিধবা পত্নীকে জোর করে হস্তগত করেন। এইভাবে মহানবীর জীবন সায়াহ্নেই ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে আসওয়াদ ইয়ামেন ও দক্ষিণ আরব আপন করতলগত করেন।

এই ঘটনা মহানবীর কর্ণপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুয়াজ ইবনে জবল ও অন্যান্য কয়েকজনকে আসওয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এঁরা ইয়ামেনে পৌঁছবার পর ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে ধাবিত হতে থাকে। নিহত শাসনকর্তা বাজানের নিকট আত্মীয়গণ বাজানের স্ত্রীকে উদ্ধার করার নিমিত্ত সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। একদিন নিশীথ রাতে আসওয়াদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাঁরা আসওয়াদকে হত্যা করে বাজানের স্ত্রীকে উদ্ধার করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল মহানবীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে। তখন মহানবীর তিরোধানের মাত্র দু'-একদিন বাকি ছিল। যখন এঁরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মহানবী আর ইহলোকে নেই। আবুবকর খলিফা। আসওয়াদ নিহত হওয়ার পর তার ভক্তরা প্রদমিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন মহানবীর তিরোধানের সংবাদ জানতে পারল, তখনই বিদ্রোহের আগুন আবার শত গুণে জ্বলে উঠল।

মুসাইলামা :

আরব দেশের ইয়ামামা প্রদেশের অন্তর্গত বনি হানিফা গোত্রের দলপতি মুসাইলামা। নবম হিজরীর ৬৩১ খ্রীস্টাব্দে যে সমস্ত আরব গোত্র মদিনাতে মহানবীর সাথে মিলিত হতে এসেছিল, তখন মুসাইলামা তার আপন গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। প্রতি সমাজে জ্ঞানী ব্যক্তি থাকে, যারা জ্ঞানী হলেও বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন—অর্থাৎ **Perverted genius.** মুসাইলামা ছিল সেই বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে মহানবীর সাথে কথা বলল এবং বুঝল মহানবী প্রকৃতই নবী, রসুল, মহামানব। যদি সে মহানবীকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো ও ভালবাসতো, তাহলে ইতিহাসে মুসাইলামা একজন উঁচুদরের সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারত। কিন্তু তার জ্ঞানকে সোজাপথে না নিয়ে বাঁকা পথে বসাল। মনে মনে স্থির করল—একবার ছলে-বলে-কৌশলে নিজেকে নবী প্রমাণ করতে পারলে, সমাজে মহানবীর মতো সেও হতে পারবে। এই বিকৃত ধারণা ও মতিভ্রম-সহ দেশে ফিরল। ফেরার পরই কতকগুলো সরস বাক্য রচনা করলো এবং জনগণকে জানাবার পূর্বেই কতকগুলো আপন লোককে পূর্বেই জানাল—সে এখন আল্লাহর নবী। এইভাবে সারা দেশে কথাটি ছড়িয়ে পড়ল। কেবলমাত্র তাইই নয়, সে চরম ধৃষ্টতা-সহ স্বয়ং মহানবীকে একটি পত্রও দিল—"আল্লাহর রসুল মুসাইলামার নিকট হতে আল্লাহর রসুল মহম্মদেব প্রতি—আল্লাহ্ আমাকে আপনার অংশীদার রূপে প্রেরণ করেছেন। এই দুনিয়ার অর্ধেক আমাকে এবং বাকি অর্ধেক কোরেশদের দিয়েছেন।"

এই পত্রে মহানবীর উত্তর: "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম। আল্লাহর রসুল মহম্মদের নিকট হতে ভণ্ড নবী মুসাইলামার প্রতি: সকল প্রশংসা আল্লাহর। সৎশীলদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। সমগ্র পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। এবং পরকালে পুরস্কার একমাত্র সৎ ব্যক্তিদের জন্য।"

মহানবীর নিকট হতে এই পত্র নিয়ে একজন দূত মুসাইলামার নিকট গেলেন। দূত মুসাইলামাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসাইলামা আপন বদ-বুদ্ধিতে অটল থাকলো।

তুলাইহা :

তৃতীয় ভণ্ড নবী তুলাইহা। বনি আসাদ গোত্রের দলপতি। নেজদ অঞ্চলের বিখ্যাত যোদ্ধা। কোন একবার মরুভূমি অতিক্রমকালে তার দলবল কোথাও পানি পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে বলে উঠল ঐ দিকে পানি পাবে। পানিও পাওয়া গেল। তখন তার মনে হল—সে এখন নবী হয়ে গেছে, তাই

তার কথা ফলে গেল। নবী হওয়ার স্বপ্নটাও সে কিছুদিন যাবৎ দেখছিল। সেই হতে প্রচার শুরু হয়ে গেল—তুলাইহা একজন নবী। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিরোধিতাও আরম্ভ হলো। পরে আবুবকরের খেলাফত কালে মহাবীর খালিদের হস্তে পরাজিত হয়ে তুলাইহা সিরিয়াতে পলায়ন করে। খলিফা ওমরের খেলাফত কালে তুলাইহা আবার তওবা করত ইসলামে দাখেল হয়ে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন।

সাজাহ :

সাজাহ্ ছিল মধ্য আরবের বনি ইয়ারবু গোত্রের পরমা সুন্দরী একজন বুদ্ধিমতি নারী। সাজাহ জাতিতে ছিল খ্রীস্টান। খ্রীস্টান উপজাতিদের মধ্যেই বসবাস করত। তার গোত্রের নাম ছিল মেসোপটেমিয়ার বনি তগলিব গোত্র। ছলে ভরা বুদ্ধিমতি সাজাহ বহুদিন হতেই লক্ষ্য করছিল মহানবীর অসাধারণ প্রতিপত্তি, নাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি। যখন দেখল আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে দারুন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, এবং আজ আর মহামানব মহানবীও বর্তমান নেই। তখন সে ভীষণ এক সুযোগ বুঝে সকল উপজাতিদের আহ্বান করল ভোজসভায়, সকলেই সুন্দরীর ভোজসভাতে যোগদান করল। একে সুন্দরী, তাতে আবার ভোজের আয়োজন। সকলেই আনন্দে যেন আত্মহারা। এই সুযোগে বুদ্ধিমতি নিজেকে একজন নবী বানিয়ে নিলেন। এবং বিপুল এক সেনাবাহিনী গঠন করে মদিনা আক্রমণে অগ্রসর হল। বনি তামিম অঞ্চলে এসে আপন পূর্বপুরুষ বনি ইয়ারবু গোত্রকে তার সাথে যোগদান করাব জন্য আমন্ত্রণ জানাল। যুদ্ধে জয় হলে তারা দেশের অর্ধেক পাবে। ইয়ারবু গোত্রের দলপতি মালিক ইবনে নুয়াইরা সদলবলে সাজাহর সাথে যোগদান করল। কিন্তু বনি তামিম গোত্রের সকলেই সাজাহর কথায় কান দিল না। এতে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তাদের আক্রমণ করে। যদিও আক্রমণের ফল ভাল হয়নি।

অতঃপর সাজাহ্ মালিক ইবনে নুয়াইয়ার পরামর্শমতো ইয়ামামা অঞ্চলের অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসাইলামাকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হল। সাজাহ এবং মুসাইলামার মধ্যে মূলত একে অপরের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। এটা মালিকের তৈরি। মালিকের মূল ইচ্ছা ছিল—সুন্দরী সাজাহ যেন হাত ছাড়া না হয়। কিন্তু ফল হল বিপরীত। চতুর মুসাইলামা সুন্দরী সাজার সাথে যুদ্ধ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। তারও মনের কোণে মালিকের মতো একটা গোপন ইচ্ছা কাজ করছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসাইলামা সুন্দরী সাজাহর নিকট বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে একটি সন্ধি প্রস্তাব পেশ করল। এবং অনুরোধ জানাল একটিবার আসার জন্য, সন্ধি প্রস্তাবকে

সম্পূর্ণ করার জন্য। সাজাহ্ প্রস্তাবে সাড়া দিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হল। শুধু সাক্ষাৎই হল না। সন্ধি এখন সুন্দর মুসাইলামা ও সুন্দরী সাজাহ্‌র মধ্যে পরিণয়ে পর্যবসিত হল। মালিক বেচারা হতাশাগ্রস্ত হয়েই ফিরে গেল। সুন্দর ও সুন্দরী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার আরম্ভ করলো। এবং স্বপ্নে বিভোর আছে—কবে মদিনা দখল করবে।

হেনকালে মহাবীর খালিদ সদলবলে উপস্থিত। সুন্দরী বুদ্ধিমতি সাজাহ্ দেখল এ বিপদ কাটাবার মতো শক্তি তাদের দুজনের কারোই নেই। তাই সে তিনদিন একত্রে অতিবাহিত করে আপন গোত্র বনি তগলিবদের নিকট প্রত্যাবর্তন করল। এখন মুসাইলামা-মালিক ও সাজাহ্ সকলেই পৃথক। একাকী মুসাইলামা মহাবীর খালিদের সম্মুখীন হয়ে অতি করুণভাবেই প্রাণ হারাল। সুন্দরী সাজাহ্ পরবর্তীকালে নিজ ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইভাবে চারজন ভণ্ড নবীর মধ্যে দুজন আসওয়াদ আনসী ও মুসাইলামা প্রাণ হারাণ, এবং দু'জন তুলাইহা ও সাজাহ্ পরবর্তীকালে ইসলামে ফিরে আসে।

মহানবী তাঁর জীবিতকালেই এই চারজনের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন বা রিদ্দার যুদ্ধ

(APOSTASY MOVEMENT)

(৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ)

নেতাদের চরম মূর্খামি :

সমগ্র আরব যখন বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গে, তখন সেই তরঙ্গে যারা প্রধান প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন, সেই চারজন ভণ্ড নবী সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে তাদের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব তরঙ্গটি কি এবং কেনই বা দানা বেঁধেছিল। মহানবীর স্ত্রী বিদূষী হযরত আয়েশা বলেন—'মহানবীর মৃত্যুতে আরবগণ ধর্ম ত্যাগ করায় চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইহুদি ও খ্রীস্টানগণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসলমানগণ মহানবীর মৃত্যুতে শীতে বর্ষণসিক্ত মেষপালের মতো হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের আবুবকরের নেতৃত্বে একত্রিত করলেন।' বিশ্ববিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক আত্-তাবারি (৮৩৮-৯২৩) বলেন,'আরববাসীগণ সর্বদিক হতে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, স্বধর্মত্যাগীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাথা তুলল, খ্রীস্টান ও ইহুদিগণ ঔদ্ধত্যের সীমা লঙ্ঘন করল, এবং নগণ্য সংখ্যক ধর্মভীরুগণ অসংখ্য শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাখালবিহীন মেষপালের মতো যত্রতত্র বিচরণ করতে লাগল। হিট্টি বলেন, 'স্বল্পকাল স্থায়ী আবুবকরের খেলাফতকাল (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ দ্বারা ব্যাপৃত ছিল। আমরাও তাই বলি—মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র হেজাজ ব্যতীত প্রায় সমগ্র আরব দেশে ইসলামধর্ম ও নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রে তীব্র বিদ্রোহ ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। তাদের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ আরো ভয়াবহ রূপ নিতো, যদি তাদের নেতাগণ চরম লোভ ও মূর্খামিবশত নিজদের 'নবী' বলে দাবি না করত। বিশাল জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই জানতে ও বুঝতে পারল—তারা কেউই 'নবী' নয়। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ নেতাদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলল। এইভাবে বিশ্বের ইতিহাসে বহু বড় বড় নেতা তাদের আপাত অতিরিক্ত লোভের জন্য নেতৃত্ব হারিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। এই স্বধর্মত্যাগী আন্দোলনকেই বলা হয় Apostasy Movement এবং এর বিরুদ্ধে খলিফা আবুবকর যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তারই নাম রিদ্দার যুদ্ধ।

আন্দোলনের প্রধান কারণগুলো :

১। **মহানবীর সান্নিধ্যলাভের অভাব :** সময়ের স্বল্পতা ও নানা কারণের জন্য মহানবীর জীবিতকালে সমগ্র আরবের $\frac{১}{৩}$ অংশ মানুষ মনেপ্রাণে ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল। তার প্রথম কারণ মহানবীর হাতে সময় খুবই কম ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থর ছিল। তৃতীয়তঃ আরবগণ মহানবীকে সদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রেখেছিল। আজকের মতো সেদিন রেডিও বা টিভি ছিল না। তখনকার দিনে একজন মহামানবের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়াটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তাই এই সমস্ত নানা কারণে জনগণ মহানবীর সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ লাভের অভাব হেতু ইসলামের সাথে নিগূঢ়ভাবে বিজড়িত হতে পারেনি।

২। **গোত্র প্রভাব :** তখনকার দিনে আরব শত শত দলে বা গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রের প্রধানকে ঐ গোত্রের মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করত। যখনই কোন দলপতি বা গোত্র প্রধান মহানবীর নিকট সরাসরি দীক্ষা গ্রহণ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হতো ঐ গোত্রের সকলেই ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করল। ৬৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিনিধি প্রেরণের বছরে আরব গোত্রের বিভিন্ন দলপতিগণ মহানবীর নিকট আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হন। কিন্তু এখানে একটা বিরাট ফাঁক থেকে গেল। দলপতিরা মহানবীর সংস্পর্শ পেলেও জনগণ পেল না। যারা চিরদিন আপন আপন দলপতির প্রেমে মুগ্ধ ছিল, তারা ইসলামের শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্ম অনুধাবন করার কোন সুযোগই পেল না। এইভাবে পরবর্তীকালে গোত্র প্রধানগণ যখন আপন আপন স্বার্থে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, তখন গোত্রও তাদের অনুসরণ করল।

৩। **সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা :** প্রাক-ইসলামি যুগে আরব ঘৃণ্য ও কলুষিত প্রথার উর্বর ভূমি ছিল। এমন কোন গর্হিত কাজ বা প্রথা ছিল না, যা আরব সমাজে প্রচলিত ছিল না। মহানবীর আবির্ভাবে ঐগুলো লোপ পেয়ে তাদের স্থানে এল সুষ্ঠু, সংযত ও সংঘবদ্ধ জীবনের সন্ধান। চিরদিনের অসংযত আরব, পাপাসিক্ত আরব, উচ্ছৃঙ্খল আরব শাশ্বত জীবনের স্বাদ ও সন্ধান পেল। কিন্তু ঐ স্বাদ ও সমাজ জীবন তাদের নাড়িতে মজ্জাগত হওয়ার পূর্বেই মহানবী পরলোক গমন করেন। তখন তারাও তাদের আদিম অভ্যাস, কুসংস্কারে ও কু-অভ্যাসে ফিরে যেতে চাইল। তাদের উচ্ছৃঙ্খল ও বাধাবন্ধনহীন জীবন আবার লাগামবিহীন হল।

৪। **নৈতিক অনুশাসন :** মহানবী মানুষকে শুধুমাত্র কয়েকটি প্রাণহীন শ্লোক শিখিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করেন নি। সত্য ও সুন্দরের পথে মানব জীবনকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করতে যা কিছুর দরকার, মহানবী তার জ্বলন্ত

দৃষ্টান্ত হাজির করলেন আপন আচারে, আপন জীবনে। কিন্তু মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই নৈতিক অনুশাসন মানা তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হল। তখন ব্যভিচারী-মদ্যপায়ী আরব আবার তাদের নোংরা জীবনে মেতে উঠল। এর মূল কারণ ছিল—ইসলাম তখনও তাদের অন্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়নি। তাদের জীবন ধারার মূল স্রোতটিই ছিল অনুশাসনমুক্ত, শৃঙ্খলামুক্ত, বন্ধন মুক্ত জীবন।

৫। **মদিনার প্রাধান্য:** আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন বলে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবে বন্ধনবিহীন আরবজাতি কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় একটি সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হল। সমগ্র আরবে মক্কা ছিল একটি প্রধান শহর। এখানেই ছিল হযরত ইব্রাহিমের কাবা। এই কাবাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র আরব যেন লাটিমের মতো ঘুরত। কিন্তু মহানবীর হিজরতের (৬২২ খ্রীঃ) পর মদিনার প্রাধান্য, গুরুত্ব সব কিছুই বেড়ে গেল। মদিনাই হল ইসলামের প্রথম রাজধানী। মদিনার অঙ্গুলি সংকেতেই তখন সমগ্র আরবকে চলতে হতো। মহানবীর পর অনভ্যস্ত আরব এই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে মানতে পারল না। এমনকি মক্কাবাসীগণও মদিনার প্রভুত্বে বাদ সাধল। এটাও রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল।

৬। **যাকাত দান:** মহানবী যখন জাতীয় অর্থনীতিকে একটি বিধিবন্ধনের মধ্যে এনে গরিব মানুষকে রক্ষা করার জন্য ধনীর ধনের ওপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত নামে (গরিব-কর) ধার্য করলেন, তখন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সকল ধনীকেই সেই কর বাধ্যতামূলক হিসাবে দিতে হল। কিন্তু আরব ছিল চিরদিনই স্বাধীনচেতা। ব্যক্তি স্বাধীনতা, পারিবাবিক স্বাধীনতা, গোষ্ঠী স্বাধীনতা ইত্যাদি ছিল তাদের অতি বড় প্রিয় ধন। তারা তাদের জীবনের সব কিছুকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাকে নয়। মহানবীর পরই তারা আপন তালে নেচে উঠল। তারা বলল—তাদের ধন তারা কাকে দেবে, না দেবে, সেটা তারাই জানে। সুতরাং ইসলামের যাকাত প্রথাও রিদ্দা যুদ্ধের একটি মূল কারণ ছিল।

৭। **নাসারা ও ইহুদিগণ:** নবদীক্ষিত মুসলমানদের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ইসলামের চিরশত্রু খ্রীস্টান ও ইহুদিগণ আনন্দে আত্মহারা। তারা নিজেদের টাকা-পয়সা ব্যয় করেই নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে এতটুকুও কসুর করেনি। তারা সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল এই আন্দোলনকে সার্থক ও সফল করার জন্য। এই আন্দোলন যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তার পেছনে ঐ দুই গোত্রের অবদান ছিল অসামান্য। তারা তাদেরকে ঘর-শত্রু বিভীষণ সাজাতে চেয়েছিল। ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস রচনা করতে

গিয়ে খ্রীস্টান ও ইহুদি লেখকগণও মুসলিম-চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে এই শতব্দীতেও কম চেষ্টা করেননি। যে সমস্ত ইংরেজ লেখক মহানবীর জীবনী প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই দোষে দুষ্ট।

৮। **নিরপেক্ষ দল :** একদল মানুষ ছিল, যারা মনেপ্রাণে ইসলামের সুন্দর নীতিকে পছন্দ করেছিল। কিন্তু নেতাদের চাপে, বিদ্রোহীদের ভয়ে তারা তখন আর মুখ খুলতে পারেনি। তারা ছিল নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতাও রিদ্দা যুদ্ধে কম অনুপ্রেরণা জোগায়নি। সবাই ভেবে নিয়েছিল সকল মানুষই রিদ্দা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বা পক্ষে।

ভণ্ড নবীগণ : আমরা ভণ্ড নবীদের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি পূর্ব অধ্যায়ে দিয়েছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও তাদের কথা আবার আলোচিত হবে। এরাই ছিল নাটের গুরু। এরাই চেয়েছিল আরব সমাজকে রসাতলে দিয়ে নিজদের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত তাদের মহৎ উদ্দেশ্য বলতে বিন্দুমাত্র কিছুই ছিল না। তবে প্রকৃত কথা বলতে গেলে এদের জন্যই স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন বিরাট রূপ নিয়েছিল। আবার পরোক্ষভাবে দেখতে গেলে এদের জন্যই আন্দোলন স্তিমিত হল, স্তব্ধ হল, চিরতরে বন্ধ হল। বিশ্বপ্রভু কার দ্বারা কখন কোন্ কাজ করিয়ে নেন, মানুষ তা বুঝতে পারে না। জনগণের নিকট এই ভণ্ড নবীগণের প্রকৃত স্বরূপ যখন উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল, তখন তারা 'ভণ্ড' প্রমাণিত হল। এই ভণ্ড প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দ্বারা পরিচালিত ঐ বিরাট আন্দোলনও হল ভণ্ডুল। যদি তাদের নৈতিক চরিত্র, আদর্শ ও সমাজ গঠনের শুভচিন্তা বলে কিছু থাকত, যদি তারা কোন চিন্তানায়কের সামান্যতমও পরিচয় তুলে ধরতে পারত, তাহলে ঐ আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত শিখা এত তাড়াতাড়ি নির্বাণলাভ করত না। তাই ভণ্ড নবীদের ভণ্ডামি ইসলামকে আপাত বাধা দিলেও পরোক্ষভাবে ইসলামের শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের নিকট জনগণকে আত্মসমর্পণে প্রকারান্তে সাহায্য করেছিল। এখানেই ছিল বিধাতার মহা কৌশল। কোরআন—৩ : ৫৪, ৮ : ৩০, ৮৬ : ১৫-১৭, ৪৮ : ২৮।

অষ্টম অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন দমন মদিনার রক্ষণাবেক্ষণ

ধুলকাশা ও রাবধার যুদ্ধ:

স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন যখন আরবের আকাশে-বাতাসে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত, যখন ভণ্ড নবীগণ সেই বেগকে আরো বেগবান করছে, যখন মদিনার কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানে ব্যস্ত, যেখানে বিদেশী রোমান বাহিনী ইসলামের দীপশিখাকে চিরতরে নিভিয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প নিচ্ছে, এককথায় ইসলামের মহাবিপদ ছিল ঘরে-বাইরে।

ইসলামের এই চরম দুর্বলতার বা দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীগণ চারিদিক হতে মদিনা আক্রমণে অগ্রসর হতে থাকল। বনি আসাদ গোত্র সুমাবাতে একত্রিত হল, ফেজারা ও গাতফান গোত্র মদিনার দক্ষিণ তীরে রণহুঙ্কার ছাড়তে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে সালাবা মুররাহ্ ও আবস প্রভৃতি উপজাতিদের একাংশ আব্‌রাতে এসে তাঁবু ফেলল, যাদের অপরাংশ ধুলকাশায় হাজির হল। তখন খলিফা আমর বিন আসকে সমস্ত কিছু তদন্ত করে ফলাফল জানাতে নির্দেশ দিলেন। তদানুযায়ী আমর খলিফাকে জানালেন—বিদ্রোহীগণ দাবা হতে আরম্ভ করে মদিনা পর্যন্ত এসে গেছে। তখন খলিফা বুঝতেই পারলেন মদিনা আজ শত্রু পরিবেষ্টিত।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল—সকল শত্রু একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল এবং একমতও হল যে তাদের মূল উদ্দেশ্য মদিনাকে আঘাত বা আক্রমণ করা নয়, বরং ইসলামকেই আঘাত করা তাদের মূল অভিপ্রায়। সুতরং তারা ঠিক করল সর্বপ্রথম ইসলামকেই আঘাত করবে। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রতিনিধিদল মদিনায় প্রবেশ করে ওমর, আব্বাস, তালহা, যুবাইর প্রমুখ বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব রাখল,—তারা দৈনিক পাঁচবারের পরিবর্তে দু'বার মাত্র সকাল সন্ধ্যায় নামায পড়বে, এবং যাকাত দিতে পারবে না। যদি খলিফা তাদের প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে তারা আর মদিনা আক্রমণ করবে না। একথা শুনে ওমর তাদের সাথে আলোচনা আরম্ভ করলেন। পরিশেষে বহু বাদানুবাদের পর ঠিক হল তারা নামায পড়বে নিয়মমত, কিন্তু যাকাত দিতে পারবে না বা দেবে না। অতঃপর ওমর খলিফার নিকট গমন করে তাদের কথাগুলো জানালেন। খলিফা একা

কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্যান্য বয়স্ক সাহাবীদের ডাক দিলেন। সকলেই উপস্থিত হলেন। আলোচনা আরম্ভ হল। খলিফা সাহাবীদের দুর্বলতা অনুভব করলেন। এমনকি ওমরের মতো সাহাবী প্রস্তাব দিলেন—"হে খলিফা আপনি দয়া করে এদের কথা রাখুন। যদি ওরা যাকাত না দেয় এবং কেবলমাত্র নামায পড়ে, তাহলেও ওরা মুসলমানই থাকবে। কাজেই মুসলমান হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। এবং আমাদের বর্তমান দুর্বলতার দিকটিও আপনাকে চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

ওমরের এই প্রস্তাবে খলিফা আবুবকর অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন—"হে ওমর! তোমার এ কোন্ অধঃপতন? ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তোমার স্বরূপ ছিল বজ্রের মতো কঠিন, আজ কেন এত দুর্বল। তুমি জেনে রেখো ইসলাম আজ পূর্ণ ধর্ম। মহানবী আমাদের পূর্ণ ধর্ম দিয়ে গেছেন। তাঁর তিরোধানের মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই আমরা সেই পূর্ণ ধর্মের অঙ্গহানি করব। হে ওমর, তুমি কি ভুলে গেছ—তায়েফের প্রতিনিধিদের প্রস্তাব। তারা কি মহানবীকে প্রস্তাব দেয়নি—নামায হতে তাদের মুক্তি দিতে হবে। তখন মহানবী কি বলেছিলেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। খলিফা আবার বললেন—হে ওমর তুমি কোন জ্ঞানে বলছ—মুসলমান হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ঠিক হবে না। তুমি কি জান না, যে নামায বাদ দেয়, সেও যেমন মুসলমান নয়, তদরূপ যে যাকাত বাদ দেয় সেও তেমনি মুসলমান নয়। সুতরাং তুমি তাদের মুসলমান বলো কেন? তুমি কি চাও আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম প্রথম-খলিফা দ্বারাই বাতিল হোক'? আল্লাহ্র কসম, আমি কিছুতেই ওসব হতে দেবো না। তাতে যা হবার তাই হোক। আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করবই।" ওমর ও অন্যান্য সকল সাহাবীই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

প্রতিনিধিদল একের পর এক নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। তখন আবুবকর সমস্ত নগরবাসীদের আহ্বান জানালেন। সকলেই সমবেত হলেন। এবার খলিফা জানালেন—"হে ভাইগণ! আল্লাহ্র কসম, আমার অঙ্গে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি ইসলামের অঙ্গহানি হতে দেব না। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনগণ জানিয়ে দিল—হে আবুবকর, আমরা আপনার সাথেই আছি। খলিফা জানালেন—বিদ্রোহীরা আজ মদিনা ঘিরে ফেলেছে। বিশেষ করে আমি তাদের প্রস্তাব অর্থাৎ ইসলামের অঙ্গহানির প্রস্তাব মেনে নিতে পারিনি। তাই তারা আরো ক্ষুব্ধ। যে কোন মুহূর্তে আমাদের বিলীন করতে তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তোমরা কি ভুলে গেছ—বদর যুদ্ধ প্রান্তরে একদিন কিভাবে ইসলামের দুষমনগণ একত্রিত হয়েছিল ইসলামকে বিলীন করতে। সেদিনও আমরা সংখ্যায় অতি নগণ্য ছিলাম। তবুও আল্লাহ্ আমাদের জয়ী করেছিলেন

আমাদের ঈমানের জন্য। আমি ঘোষণা করছি—আবার আমরা আমাদের ঈমানের জোরেই জিতব, সংখ্যার জোরে নয়।

খলিফার এই দুর্বার আহ্বান ব্যর্থ যায়নি। দলে দলে মানুষ তাঁর নিকট আসতে থাকল। সকল মানুষ যেন এক দেহ এক প্রাণে পরিণত হল। ইসলামের অযুত প্রাণশক্তি আবার যেন পুরাদমে জেগে উঠল। এবার খলিফা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করলেন। তিনদিনের মধ্যেই খলিফা সংবাদ পেলেন বিদ্রোহীগণ ধুলকাশা হতে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র খলিফা সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। তাঁর অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকুল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলিম সেনা বহুদূর পর্যন্ত তাদের বিতাড়িত করেন। এখানে কোন যুদ্ধ বাধেনি। মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনাতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-কুল আবার একত্রিত হয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। খলিফা এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই বুঝতে পেরে সেনাবাহিনী মদিনা ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আর কালবিলম্ব না করেই একদল সেনা-সহ দ্রুত অভিযান চালিয়ে রাতের অন্ধকারেই প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকুলের সমরসাধ মিটিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেনাপতি ও ভণ্ড নবী তুলাইহার প্রধান সমর্থক হাব্বাল নিহত হয়। খলিফা তাদের ধুলকাশা পর্যন্ত বিতাড়িত করে যেখানে নুমান বিন মাকরান নামক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে কিছু সেনা-সহ মোতায়েন করে রাজধানী মদিনাতে ফিরে আসেন। মুসলমানদের এই বিজয়ের ফলে একটি লাভ ও একটি লোকসান হয়। লাভটি হল—মুসলমানদের হৃত মনোবল আবার ফিরে এল। এবং লোকসানটি হল—পরাজিত শত্রুকুল মনের রাগে গুপ্তভাবে অনেক স্থানে অতর্কিতে বহু মুসলমান নরনারীকে আঘাত করতে থাকল। কিন্তু ধুলকাশার যুদ্ধে সবার উপর যে লাভটি হয়েছিল, তা মুসলমানদের মনোবল ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যাকাত দেওয়ার মনবৃত্তি লাভ। যার ফলে শূন্য রাজকোষ আবাব অর্থে-সম্পদে ভরে উঠল। যার ফলে ইসলামের অঙ্গহানিও চিরতরে রহিত হল। খলিফা আবুবকরের ইচ্ছা কামনা ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করল। এককথায় মহানবীর জীবনে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর-যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহসের সঞ্চার হয়েছিল, আশাতীত ফল লাভ ঘটেছিল, আবুবকরের জীবনের প্রথম যুদ্ধ ধুলকাশাতেও অনুরূপ ফল ও সফলতা দেখা দিল। অরক্ষিত মদিনা প্রায় সুরক্ষিত হয়ে উঠল। মহানবীর জীবন ছায়া খলিফা আবু বকরের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠল।

কিছুদিনের মধ্যেই সেনাপতি উসামা সিরিয়া অভিযান হতে দারুণ সফলতা লাভ করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। খলিফা যেন একান্ত মনে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি উসামাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সমস্ত সেনা-সহ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিয়ে নিজেই অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন। অন্যান্য সাহাবীগণ খলিফাকে অভিযানে বের না হওয়ার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানালেন। তাঁদের যুক্তি ছিল খলিফা স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করতে থাকলে মদিনায় রাজকার্যে-শাসনে-প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। অধিকন্তু যে কোন অভিযানে একজন সেনাপতি শহিদ হলে অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবেন। কিন্তু স্বয়ং খলিফার কিছু হলে সে অভাব একেবারেই অপূরণীয় থেকে যাবে। কিন্তু খলিফা সাধারণ মুসলমান ও সৈনিকদের মনোবলকে ফিরিয়ে আনার নিমিত্ত কারো কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করেই অভিযানে রওনা হলেন। ধুলকাশা অতিক্রম করে রাবধা পরগণার আররাক নামক স্থানে উপনীত হয়ে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করলেন। শত্রুকুল শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে খলিফার বশ্যতা স্বীকার করল। খলিফার নির্দেশে আররাক প্রান্তরকে মুসলিম সেনাবাহিনীর পশুদের চারণভূমিতে পরিণত করা হল। অতঃপর বিজয়বেশে খলিফা ইসলামের শান্তির পতাকাকে উড্ডীয়মান করে রাজধানী মদিনায় প্রত্যাবর্তন কবেন। ধুলকাশা ও রাবাধার দুটো সম্মুখ সমরেই খলিফার অভূতপূর্ব জয় মুসলিম সেনাবাহিনীকে অভূতপূর্ব শক্তি ও প্রেরণা দান করল। রাজকীয় কোষাগারকে অর্থ ও সম্পদে ভরে তুলল, মহানবীর আদর্শকে চির উন্নত করল। ইসলামকে তার অঙ্গহানি হতে চিরতরে রক্ষা কবল। খলিফার চিন্তাধারা, দূরদর্শিতা কত ব্যাপক, কত গভীর, কত সুদূরপ্রসারী—তা তিলে তিলে প্রমাণ করল। তাই আজও আবু-বকর মুসলিম জাহানের কোটি কোটি মানুষের নিকট—ইসলামের চির প্রবাদপুরুষ, শিশু ইসলামের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা।

এনেছিলেন মহানবী আল্লার বার্তা
তুমি ছিলে ইস্লামের রক্ষাকর্তা।

ইসলামের ইতিহাসে ধুলকাশা ও রাবধা যুদ্ধেব গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। বদব যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধ ছিল ইসলামের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী চূড়ান্ত যুদ্ধ।

সৈন্যবিভাগের শ্রেণীবিন্যাস:

মদিনা আজ সুরক্ষিত, সেনাপতি উসামা আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ ঘরে ফিরেছেন, ধীরমতি আবুবকর আজ আবার ধীরভাবে চিন্তা করতে বসলেন—কিভাবে ভণ্ড নবীদের চিরতরে স্তব্ধ করা যায়। কিভাবে স্বধর্মত্যাগী আন্দোলনকে বাতাসের সাথে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। কিভাবে আরববাসীকে জয় করা যাবে। কেননা একদিন দূরদর্শী আবুবকর বলেছিলেন —"বিশ্বজয়

করার পূর্বে আরববাসীকে আরব দেশকেই প্রথম জয় করতে হবে।" যার জন্য তিনি সমগ্র দেশটিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে এগারোটি ভাগে ভাগ করলেন। এবং সেনাবাহিনীকেও সেই অনুপাতে ১১টি ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রতিটি দলে একজন বিশিষ্ট সেনানায়ক নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি বাহিনীকে তাঁর মূল উদ্দেশ্য বুঝিয়ে, ইসলামের যুদ্ধনীতির কথা সজোরে বলিষ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করে সকলকেই নির্দেশ দিলেন আপন আপন কাজ বুঝে নিতে, দেশকে শান্ত করতে, স্বধর্মত্যাগীদের কঠোর হস্তে দমন করতে। সবের ওপর ইসলামকে রক্ষা করতে। খলিফার উপদেশ, নির্দেশ, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কোনটাই ব্যর্থ হয়নি। চরম সফলতা-সহ সব কিছু প্রদমিত হল, প্রশমিত হল। ইসলামের ইতিহাসে আবুবকরের স্থান সবার ওপরে নির্ণীত হল।

১১টি সৈন্যদল :

১। বীরজগতের চির প্রবাদ পুরুষ বীরবর খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে প্রথম তুলাইহার বিরুদ্ধে, পরে মালিক ইবনে নুবিয়ার বিরুদ্ধে;
২। ইকরামা ইবনে আবু জেহেলকে ভণ্ড নবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে;
৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে ভণ্ড নবী আসওয়াদ আনসির বিরুদ্ধে;
৪। মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়াকে হাজারামাউত ও ইয়ামেনের বিরুদ্ধে;
৫। আল আলাকে বাহরাইনের বিরুদ্ধে;
৬। হানিফকে মাহরা ও উমানের বিরুদ্ধে;
৭। আমরকে কোজা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে;
৮। খালিদ ইবনে সাউদকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে;
৯। বনি সালাম গোত্রের বিদ্রোহ দমনে হযরত তালহা;
১০। হাউয়াজিন গোত্রের বিদ্রোহ দমনে হযরত যুবাইর;
১১। স্বয়ং খলিফার নেতৃত্বে মদিনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল।

এইভাবে ১১টি দলের সেনাবাহিনী সারা দেশকে ছেয়ে ফেলল। প্রত্যেক আরবই আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকত। যুদ্ধে প্রত্যেকেই ভাল খাবার ও ভাল জামা-কাপড় পেত। তখনকার দিনে সেনাবিভাগে কোন বেতন প্রথা ছিল না। খলিফা এক একটি গোত্রের একজন আমিরের হাতে এক একটি ইসলামের পতাকা দিতেন। তিনি তখন আপন আপন গোত্র হতে সৈন্য সংগ্রহ করতেন। সৈন্যদের মূল আকর্ষণ ছিল—ভাল খাবার, ভাল পোশাক, যুদ্ধলব্ধ ধনরত্ন লাভ, সবার ওপর—ইসলামের বিজয়।

খলিফা সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে ইসলামের শান্তির পতাকাতলে আনার জন্য এক বছর (৬৩২-৩৩ খ্রীঃ) বিরামবিহীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই এক

বছরের মধ্যেই সমস্ত বিদ্রোহ নির্মূল হল। আরব শান্ত হল। ইসলাম তার অঙ্গহানি থেকে রক্ষা পেল। খলিফা অসাধারণ বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হলেন।

রিদ্দা যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল :

খলিফার প্রথম জয় আরব দেশ : ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দা যুদ্ধের পরিণাম ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ, সুদূরপ্রসারী ও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক কথা বলতে হলে বলতে হয়—বদর যুদ্ধ যেমন ইসলামের চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ণয়কারী যুদ্ধ ছিল, ঠিক তেমনি ধুলকাশা ও রাবধার যুদ্ধও ছিল ইসলামের জন্য চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ণয়কারী যুদ্ধ। খলিফা আবুবকর যদি আরব দেশকে জয় করতে না পারতেন, তাহলে ইসলামের পতাকা কোনদিনই বিশ্ববিজয়ের গৌরব লাভ করতেও পারত না। এই কথার প্রতিধ্বনি করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"আরববাসীকে বিশ্বজয়ের পূর্বে প্রথম আরব দেশকেই জয করতে হয়েছিল (Arabia had to conquer itself before it could conquer the world.) ইসলামের সামরিক শক্তি সর্বপ্রথম রিদ্দা যুদ্ধে কঠিন পরীক্ষায় আবুবকরের নেতৃত্বে উত্তীর্ণ হল। পরবর্তীকালে এই জয, এই সফলতা বিশ্বজয়ের শুভ সূচনা করল এবং বিরাট সহায়কও হল। মহানবীর আবির্ভাবেব পূর্বে আরব স্বপ্নেও যা ভাবেনি, বাস্তবে তাই করল। আরবের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রদমিত না হলে মুসলমানগণ কোনদিনই বিশ্ববিজয়ে যেমন সফলতা লাভ করতে পারত না, ঠিক তেমনি ইসলামও বিশ্ববুকে বিস্তারলাভে খুবই আঘাত পেত। দেশজুড়ে এই বিদ্রোহ দমনের ফলেই মুসলিম সেনাপতিগণ ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস, বেড়ে গেল রণকৌশল, গঠিত হল—বিরাট সংগঠন, দেখা দিল জয়ের উন্মাদনা।

আবুবকরের দূরদর্শিতা :

সকল ঐতিহাসিকই একমত একটি মন্তব্যে যে আবুবকরের লৌহকঠিন, জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা, অনমনীয় মনোভাব, সামরিক বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সূর্যের ন্যায় প্রখর ও চন্দ্রের ন্যায স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ব্যতীত সেদিনের শিশু মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষা পেত না। একদিকে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের মূল অনুশাসন ও আদর্শ এক সাথে সংরক্ষণ করার নিমিত্ত খলিফা যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবনীয় পরিচয়। অন্যান্য সাহাবীগণ যে মাবাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিজেদের মানসিক প্রস্তুতি-সহ স্বয়ং খলিফাকেই অনুরোধ

করেছিলেন, তা বাস্তবে রূপায়িত হলে মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলাম দুইই সেদিন অতল জলে তলিয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইলিয়াম মূইর বলেন—"আবু-বকর ব্যতীত ইসলাম বেদুঈন গোত্রসমূহের সাথে আপোস রফা করে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, অথবা অঙ্কুরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।" তাই মহানবী ছিলেন ইসলামের যেমন জন্মদাতা, আবুবকর ছিলেন তেমনি শিশু ইসলামের ত্রাণকর্তা।

অজেয় বীর খালিদ :

বিশ্বের ইতিহাসে খালিদ বিন ওয়ালিদ অজেয় বীর। ইসলামের ইতিহাসেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর। যাঁকে মহানবী নিজে 'সাইফুল্লাহ্' 'আল্লাহর তরবারি' (Sword of Allah) উপাধিতে ভূষিত করেন। রিদ্দা যুদ্ধে যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় তা হচ্ছে—আবুবকরের বুদ্ধিমত্তা ও খালিদের রণকৌশল। এই সম্পর্কে ভনক্রেমার বলেন—"আবুবকরের বুদ্ধিমত্তা ও খালিদের অসীম বীরত্ব ব্যতীত রিদ্দা যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের কোন আশা ছিল না।" এই দুটো ব্যতীত ইসলাম অঙ্কুরেই সর্বনাশা আঘাত পেত।

ধর্মীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত :

রিদ্দা'র যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ধর্মদ্রোহীদের যুদ্ধ ছিল, এটা ঠিক রাষ্ট্রদ্রোহীদের যুদ্ধ ছিল না। এই বিদ্রোহ ছিল ইসলামের নিকট প্রাক-ইসলাম আরব ধর্মমতের সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ। এই প্রসঙ্গে ওয়াট বলেন—"রিদ্দা'র যুদ্ধ ছিল ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি দেশজোড়া বিশাল অনৈসলামিক আন্দোলন।" এই আন্দোলন ধূলিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরব ভূখণ্ড হতে যেমন পৌত্তলিকতা চিরতরে লুপ্ত হল, তেমনি ইসলামের তৌহিদবাদ (একেশ্বরবাদ) সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। অনৈসলামিক কার্যকলাপ যেমন ধ্বংস হল, তেমনি ইসলামের অনুশাসন তার স্থলাভিষিক্ত হল। একদিকে প্রতারক, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক ও বিশৃঙ্খলকারীগণ যেমন চিরতরে দমিত হল, তেমনি ইসলামের কেন্দ্রীয় শাসনও সকলকে নির্মূল করেই কণ্টকবিহীন হল। এই সম্পর্কে মূইর বলেন—"রিদ্দা'র যুদ্ধের পরাজয় যেমন ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ হত, তার বিজয়ও তেমনি হয়েছিল সমগ্র দেশের গতি পরিবর্তনশীল।" রিদ্দা যুদ্ধের জয় আরবের জাতীয় জীবনে মহাজাতির দ্বারোদঘাটন ঘটাল। ইসলামের এই বিজয়কে সম্মুখে রেখেই একদিন মরুবাসী আরব বিশ্ববিজয়কে আলিঙ্গন করল। মহানবী কোন্ অদৃশ্য শক্তিতে কি বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, যে বৃক্ষটির শাখাপল্লব একদিন সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলল।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব:

একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, মহানবীর তিরোধান ছিল একটি ভয়াবহ ব্যাপার ও ইসলামের ইতিহাসের দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা। খোদা বখ্‌শ বলেন—"রসুলের ওফাত ইসলামের জন্য একটি ভয়াবহ ও সন্দেহজনক ইতিহাসের সূচনা করে।" ইসলামের শিশুরাষ্ট্র এই বিজয়ের ফলেই রক্ষা পায় এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। আরব ভূখণ্ড আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, আবার ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়। এই যুদ্ধেরই শুভ পরিণতি মুসলমানদের হাতে এনে দেয় অন্যান্য বিরাট সাম্রাজ্যকে। রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল—রাষ্ট্রের আয়ও। এই বিজয় একদিনের অসভ্য মরুবাসী আরবকে করল বিশ্বমানব সমাজের চরম সুসভ্য, সুশৃঙ্খল ও আভিজাত্যপূর্ণ আরব। যা একদিন সমগ্র ইউরোপকে জ্ঞানের আলো দান করল, যা একদিন বংশ গরিমায় গর্বোদ্ধত বিশ্ববাসীকে মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে শেখাল।

ইসলামই সর্বপ্রথম অধঃপতিত মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করল। প্রাক-ইসলামি যুগে শুধু আরবে নয়, সারা বিশ্বে মানুষেরই এক বিশাল অংশকে কোথাও দাস রূপে, কোথাও ক্রীতদাস রূপে, কোথাও জীবজন্তুর পর্যায়ে, কোথাও তারও নিচে দেখা হতো। ঐ পাপ, ঐ কাজ, ঐ মনোবৃত্তি, ঐ মানসিকতা এতই গভীরে ছিল, আজও বিশ্ব তা হতে নিষ্কৃতি পেল না। আজও নির্যাতিত মানুষের প্রতীক আফ্রিকার স্বনামধন্য কিংবদন্তীখ্যাত বিপ্লবী নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে (১৮/১০/১৮৯০) ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নিপীড়িত মানুষের জন্য চিৎকার করতে হচ্ছে। আজও ভারতের বর্ণহিন্দুগণ নিম্নবর্ণের সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আত্মহুতি দিচ্ছে। আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই ইসলাম জেহাদ ঘোষণা করেছিল—বর্ণ-বিদ্বেষ, বংশ-বিদ্বেষ ও গোত্র-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। তার ঘোষণা আজও সরব।

মানব সমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ কুলের দাবি জাতের প্রলাপ।
শ্রেণীগোত্র বংশ মিছে সকলই সমান
তোমরা সকলে দাও যোগ্যের সম্মান।

নবম অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগী বা ধর্মদ্রোহীদের পরাজয়
মদিনার মধ্য ও উত্তরাঞ্চল

অজেয় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ:

মহাসমুদ্রে টলটলায়মান ইসলামের তরীকে কিভাবে হযরত আবুবকর তীরে আনলেন, তা এক বিস্ময়কর ঘটনা। তারপরও একের পর একটি ঘটনা ঘটতে থাকল। ইসলামের অতি প্রথম যুগে আমরা দুজনকে একত্রে পেয়েছিলাম—মহানবী স্বয়ং ও আবুবকর। এখানেও আমরা দু'জনকে লক্ষ্য করছি—স্বয়ং আবুবকর ও মহাবীর খালিদ। এই সময়ের ঘনঘোর বিপদে এই দু'জনের অবদানের কোন তুলনা নেই। তাঁরা যে কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা বর্ণনাতীত।

পরবর্তীকালে যে সমস্ত অভিযানগুলো পরিচালিত হয়েছিল, তার মহানায়ক ছিলেন মহাবীর খালিদ। যাঁকে বীরত্বের দিক থেকে মুসলিম আলেকজাণ্ডার বা সীজার বলা হয়। কিন্তু আমাদের মতে, খালিদ বিন ওয়ালিদকে মুসলিম-আলেকজাণ্ডার বলাও ঠিক না। এর দ্বারা তাঁকে ছোট করা হয়। কেননা আলেকজাণ্ডার জীবনে কোন কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু খালিদ জীবনে কোন যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করেন নি। তাই তিনিই একমাত্র সারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'অজেয় বীর'। ইসলামের চারজন খলিফা আপন আপন গুণে বিরাট ও বিশাল, বিরল ও ব্যতিক্রমবিহীন ব্যক্তিত্ব। ইসলামের অজেয় বীর খালিদও তেমনি বিরল ও ব্যতিক্রমবিহীন ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং মহানবী যাকে 'সাইফুল্লাহ' আল্লাহর তরবারি নামে ভূষিত করেছিলেন। আল্লাহর তরবারি চিরদিনই অপরাজেয় ছিল। আজও বিশ্বজোড়া মহাকালের মহাতরঙ্গেও খালিদই একমাত্র সেনাপতি যিনি অজেয় বীরের মহাসম্মানে সম্মানিত।

বনি তাঈ গোত্র:

মদিনার উত্তরাঞ্চলে খালিদ প্রথমেই ভণ্ডনবী তুলাইহার বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। তুলাইহা ছিল বনি আসাদ গোত্রের দলপতি। মহানবীর জীবিতকালেই সে নবুয়তের দাবি করেছিল। উত্তর-পূর্ব আরবে কিছুটা অধিকার বিস্তার করে আপন ধর্মমত প্রচার করছিল। তার ধর্মমত ছিল অতি অদ্ভুত। কতকগুলো বানান অসংলগ্ন শ্লোকের রচনা সম্ভার। যাতে নামায, রোযা, হজ, যাকাত বলে কোন অনুশাসনই ছিল না। অধিকন্তু মদ ও ব্যভিচারে কোন বাধাই ছিল না। তাঈ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা তার শিষ্য ছিল।

সমরকুশল খালিদ প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঐ স্থানে কোন্ কোন্ গোত্র বসবাস করে। প্রথম তিনি কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ঐ সমস্ত গোত্রের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন। ইতিহাস বিখ্যাত দাতা হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদি তাঈ বংশের দলপতি ছিলেন। তিনি প্রথম আদির সাথে বসলেন আলোচনাতে। তাঁকে প্রথম ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করলেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করলে তার পরিণামই বা কি ও কেমন হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। এবং অনুরোধ করলেন তাঁর গোত্র তাঈ বংশ যেন কোন যুদ্ধে যোগদান না করে। আদি তাঁর গোত্রকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু প্রথমদিকে তেমন কোন ফল হল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় তিনদিন পরে আদি পুনরায় খালিদের সাথে মিলিত হয়ে তাঈ গোত্রের সম্মতির কথা জানালেন। বনি তাঈ গোত্র সমস্ত বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ করত ইসলামের পতাকাতলে আবার মিলিত হল। সেনাপতি খালিদ বিনা রক্তপাতেই তাঈ গোত্রকে জয় করে শত্রু তুলাইহাকে দুর্বল করলেন।

বনি যাদিলা গোত্র :

এবার সেনাপতি খালিদ বনি যাদিলা গোত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। এখানেও আদি বিন হাতেম তাঈ মধ্যস্থতার ভার নিলেন। আসলে যাদিলা গোত্রটিও তাঈ গোত্রেরই একটি শাখা ছিল। আদি তাঁদেরকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলায় তাঁরা বিনা শর্তে ইসলামের পতাকাতলে হাজির হলেন। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী খালিদের বাহিনীতে যোগদান করল।

বুজাখার যুদ্ধে গাতফান গোত্র :

পর পর দুটো গোত্র ভণ্ডনবী তুলাইহার হস্তচ্যুত হওয়ায়, সে একেবারেই উন্মাদের মতো ইসলামের বিরোধিতা আরম্ভ করল। সেনাপতি খালিদ এবার বাধ্য হলেন অস্ত্রধারণ করতে। তুলাইহা খালিদকে বাধা দেওয়ার জন্য বুজাখা নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করল। কিন্তু চতুর তুলাইহা গাতফান গোত্রের দলপতি ওয়াইনাহকে যুদ্ধের ভার অর্পণ করে কিছু গায়েবী সংবাদ লাভ করার অজুহাতে একটি নিভৃত ও নিরাপদ স্থানে নিজেকে সরিয়ে রাখল। প্রধান শিষ্য ওয়াইনাহ মাঝে মাঝে এসে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে—কোন গায়েবী সংবাদ পেলেন কিনা। প্রতিবারই গুরু উত্তর দেয়—এখনও কোন সংবাদ নেই। শেষের দিকে শিষ্য গুরুর প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা

করে, কি সংবাদ পেলেন। তখন গুরু মহাশয় উত্তর দেন—"প্রভু এইমাত্র আমাকে জানালেন—তোমার এবং খালিদের মধ্যে বিরোধ মিটবে না। এবং এমন ঘটনা ঘটবে যা মানুষ কোনদিনই ভুলবে না। ভণ্ডনবীর এই ভণ্ডামীর পূর্ণ উত্তর শুনে শিষ্য ওয়াইনাহ উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল—"তুমি জাহান্নামে যাও। এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তা আল্লাহ্ ভালই জানেন।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইনাহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত আপন গোত্রের সেনাবাহিনীকে বলল—"তুলাইহা একজন ভণ্ডনবী, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর।" সঙ্গে সঙ্গে তাই হল। তুলাইহার মুষ্টিমেয় সেনাদল তখন একাকী পড়ে রইল।

তখন বিনা যুদ্ধেই তুলাইহার সামান্য সংখ্যক সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তুলাইহা একেবারেই নিরুপায় হয়ে গোপনে সস্ত্রীক সিরিয়ার বনি-গাসান গোত্রের আশ্রয় নিল। এবং তার শিষ্যবৃন্দ তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেনাপতি খালিদের শিবিরে যোগদান করত তাঁর হাতকে আরো শক্তিশালী করল। তুলাইহাও পরবর্তীকালে হযরত ওমরের খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাকি জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করেছিলেন।

আদাস ও ফাজারা গোত্র :

আমরা লক্ষ্য করলাম রণকুশলবীর খালিদ পর পর তিনটি গোত্রকে তুলাইহার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কতখানি রণনীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। এবার তিনি বনি আসাদ ও ফাজারা গোত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ বাধল, উভয় দলই শোচনীয়ভাবেই পরাজিত হল। কিন্তু সেনাপতি খালিদ কাউকে কোনরূপ শাস্তি দিলেন না। সকলকেই ক্ষমা করলেন। তাঁর এই উদারতা কেবলমাত্র তাদেরই জয় করল না, বাকি অন্যান্য সকল গোত্রকেই জয় করল। সকলেই একসাথে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলামের রীতিনীতিকে আলিঙ্গন করল।

মদিনার পূর্বাঞ্চল— তামিম ও ইয়ারবু গোত্র :

সেনাপতি খালিদ একমাস কাল বুজাখায় অবস্থান করে সেখানকার বিদ্রোহ একেবারেই প্রশমিত হলে তিনি মদিনার পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এবার তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বনি তামিম গোত্র। পারস্য উপসাগরের তীরে এরা বাস করত। মহানবীর জীবিতকালে এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম পরিত্যাগ করে ধর্মদ্রোহীদের সাথে যোগদান করে। এইসব উপজাতিদের মধ্যে বনি ইয়ারবু গোত্র সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী

ছিল। এই গোত্রের নেতা মালিক বিন নুবিয়া ভণ্ড মহিলা নবী সাজাহার সাহায্য প্রার্থনা করে নিজেকে শক্তিশালী করে। সাজাহার পূর্বপুরুষও এই গোত্রের লোক ছিল। সেনাপতি খালিদ সাক্ষাৎ সমরে মালিককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

ইয়ারবু গোত্রের সকলেই মালিককে এই যুদ্ধে সাহায্য না করায় সাজাহ অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে অন্য এক ভণ্ডনবী মুসাইলামা তাদের সাহায্য করায় সাজাহ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। সাজাহ মনের আক্রোশে মুসাইলামাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ইয়ামামার দিকে দ্রুত অগ্রসর হল।

মহাবীর খালিদ ও পরমাসুন্দরী লায়লা :

সাজাহ যখন মুসাইলামাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হল, ঠিক সেই সময় খালিদ সসৈন্যে ঐ অঞ্চলে উপস্থিত হলে ইয়ারবু গোত্রের অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে খালিদের বশ্যতা স্বীকার করল। মালিকের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। সে হতভম্ভ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মালিক সম্পর্কে খালিদের নিকট পরস্পর বিরোধী সংবাদ আসতেই থাকল। মালিক খালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু ইসলামে প্রবেশ করল কি না—একথা খালিদ ঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারায় পাখিকে খাঁচায় বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। মালিক প্রকাশ্যে খোলামনে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে দাখেল হলে এসব ঝামেলা বাধতো না। তখনই সম্পন্ন হতো। ঝামেলা বাধার মূলে মালিকই দায়ী ছিল। খালিদ একজন সেনাপতি হিসাবে যা করার ঠিকই করেছিলেন।

মুসলিম শিবিরে মালিক ও মালিকের অনুচরবৃন্দ বন্দীরূপে হাজির হল। তখন ছিল প্রচণ্ড শীতের রাত। খালিদ মানবতার খাতিরে প্রহরীদের হুকুম দিলেন—"এদের ভালমতো কম্বল ঢাকা দিয়ে রেখো।" কিন্তু আরবী ভাষাতে এই কথার অন্য একটিও অর্থ হয়। সেটি 'এদের অনতিবিলম্বে হত্যা কর।' অতীব দুঃখের বিষয়, প্রহরীগণ ঐ অর্থটাই গ্রহণ করে তাদের হত্যা করে। সেনাপতি খালিদ এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখে-অন্তর-যাতনায় একেবারেই অধীর হয়ে পড়লেন। মালিকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লায়লাও ছিলেন। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধনীতিতে নারী বা শিশুকে হত্যা নিষিদ্ধ। লায়লা সেনাপতি খালিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবং বুঝতে পারলেন এই হত্যার সাথে খালিদের কোন যোগ ছিল না। কেননা খালিদ ইচ্ছা করলে সরাসরিই সকলকে দিবালোকেই হত্যার নির্দেশ দিতে পারতেন। প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজনই

ছিল না। একথাও লায়লা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারলেন। লায়লা মর্মে মর্মে দুটো জিনিস উপলব্ধি করলেন—মালিকের দোদুল্যমান মনই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করল, এবং সেনাপতি খালিদের হত্যার ইচ্ছা মোটেই ছিল না।

পরবর্তীকালে খালিদের মহানুভবতায় বন্দিনী লায়লা একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়েন। এবং খালিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রগাঢ় অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। তখন তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেন। খালিদ প্রস্তাব গ্রহণ করে বিধবা লায়লাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন।

বিচার :

মালিকের হত্যাকাণ্ড ও পরমাসুন্দরী তরুণী লায়লার বিবাহকে কেন্দ্র করে জল বহুদূর গড়িয়ে গেল। মদিনাবাসী আবু কাতাদাহ ও মালিকের ভ্রাতা মুতামমিম মদিনায় গিয়ে খলিফার নিকট খালিদের বিরুদ্ধে নালিশ পেশ কবলেন। খালিদের বাল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হযরত ওমর এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। খলিফা আবুবকর খালিদকে মদিনায় ডেকে পাঠালেন। খালিদ মদিনায আসামাত্র ওমর তাঁকে খুবই তিরস্কার করলেন—"তোমার এই কাজ দ্বারা ন্যায়ের মর্যাদা ও ইসলামের সুনাম নষ্ট হয়েছে। তুমি সমগ্র জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করেছ। খলিফা খালিদকে দুটো প্রশ্ন করলেন—"মালিককে হত্যার ব্যাপাবে তোমার কোন হাত ছিল কিনা। লায়লাকে বিয়ে করতে তুমি ইসলামেব নীতিকে লঙ্ঘন করেছ কিনা।" খালিদ সবিস্তারে সবই খলিফাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন—"মহানবী যেদিন আমাকে 'সাইফুল্লাহ' আল্লাহর তরবারি উপাধি দান করেন, সেদিন আপনি উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর তরবারি আল্লাহদ্রোহীদের ঘাড়ে সজোরে পড়ুক। আপনি কি তা চান না"? খলিফা খালিদের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর লায়লাকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—ঘটনার আদি-অন্ত। লায়লা নির্ভীক চিত্তে সমস্ত কথা খলিফাকে খুলে বললেন। খলিফা এবার আবো সন্তুষ্ট হলেন। এবাব খলিফা সেই প্রহরীদের ডাক দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"এই হত্যার পেছনে খালিদের সামান্যতমও ইঙ্গিত ছিল কি না"। প্রহরীগণ আল্লাহর নামে শপথ করেই বললেন—"এই হত্যার সাথে সেনাপতির কোনরূপই যোগ নেই। এটা আমাদেরই কাণ্ড, ভুল হলেও আমাদের, ভাল হলেও আমাদের।" এবার খলিফা দ্বিধাহীনভাবেই খুব খুশি হলেন।

অতঃপর খলিফা হযরত ওমরকে ডাক দিলেন এবং বললেন—"তুমি খালিদকে বরখাস্ত করার জন্য আমার নিকট সুপারিশ করেছ। তোমার সুপারিশ কোন মতেই গ্রাহ্য করা যায় না। আমি সমস্ত কথা শুনলাম। এবং সমস্ত দিক

বিবেচনা করে দেখলাম। খালিদ এই ব্যাপারে একেবারেই নিষ্পাপ ও নিবপরাধ। আল্লাহর রসুল যাকে আল্লাহর তরবারি উপাধি দিয়ে গেছেন, আমি কি সেই তরবারিকে খাপে বদ্ধ করতে পারি। এ ধৃষ্টতা আমার নেই। নিশ্চযই আল্লাহর তরবারি আল্লাহর শত্রুদের ওপর পড়বেই। তুমি ব্যাপারটির ভাল-মন্দ বিবেচনা না করেই, উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনেই রায় দিয়ে দিলে; তুমি কি ভুলে গেলে—মহানবীর হাদিস, মহানবী বলেছেন—"উভয় পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোনরূপ মন্তব্যই করবে না।" এইসব কথা শুনে ওমর খুবই লজ্জা পেলেন। খলিফা নির্দোষ খালিদকে পুনরায় সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সেনাপতি খালিদ, স্ত্রী লায়লা ও প্রহরীগণ সকলে মিলে মহানন্দে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করলেন।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। খলিফার এত কথার পরও ওমরের মন থেকে খালিদ-বিদ্বেষ যেন গেল না। বাল্য-বিদ্বেষ, যৌবনের বিদ্বেষ ও প্রৌঢ়ত্বের বিদ্বেষ যেন বার্ধক্যেও এসে গেল। হযরত ওমর খলিফা হওয়ার 'সঙ্গে সঙ্গেই অজেয় বীর সেনাপতি খালিদকে ভীষণ যুদ্ধরত অবস্থায় যেভাবে বরখাস্ত করেছিলেন, তা মহান ওমর-চরিত্রকে শুধু কলঙ্কিতই করে না, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই কষ্ট দেয়।

হযরত ওমর ও সেনাপতি খালিদ এবং খলিফা আবুবকর, এই তিন জনকে তুলনা করা যায়—একজন সাগরের লৌহ, একজন প্রস্তব ও একজন সাগরের জল। সাগরের জল খলিফা তাঁদের মনের আগুনকে নেভাতে পারলেন না।

লৌহ ও প্রস্তর মাঝে—
অগ্নি যেই আছে,
জলের দেখ নেই ক্ষমতা—
নিভাই গিয়ে তার কাছে।

তমাচা—মওলানা মোঃ ইলিয়াস।

ইয়ামামার যুদ্ধ :

ভণ্ডনবীদের মধ্যে মুসাইলামাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মধ্য আরবের ইয়ামামা প্রদেশের বনি হানিফা গোত্রের নেতা। নবম হিজরীতে মুসাইলামা তার দলের প্রতিনিধিরূপে মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু দেশে ফিরে তার মনে একটা দিবাস্বপ্ন দেখা দিল নবী হওয়ার জন্য। সে কিছু কিছু কবিতা লিখতে পারত, ধনসম্পদও বেশ কিছু ছিল। চেহারাটাও বেশ দেখার মতো ছিল। বলতে-কইতেও ভালই পাবত।

এতগুলো জিনিস এক সাথে পেয়ে তার মাথা ঘুরে গেল। সে দেখল এই একটা মওকা নবী হওয়ার জন্য। একটিবার নিজেকে নবীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আর কোনই চিন্তা নেই। তাই রাতারাতি মুসাইলামা নিজেকে নবী রূপে ঘোষণা করল। সকলকে জানিয়ে দিল তার ধর্মে "নামায, রোজা, হজ, যাকাত" এসব কিছুই নেই। মদ্যপান ব্যভিচারও নিষিদ্ধ নয়। মানুষ শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে আসতে থাকল। প্রায় এক লক্ষ শিষ্য জুটে গেল।

এইবার মুসাইলামার শক্তি, সাহস, ধৃষ্টতা আকাশকে স্পর্শ করল। সে সরাসরি মহানবীকে একটি পত্র দিল। লিখল—"আল্লাহ্ সমগ্র আরবকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, এক ভাগ আপনার জন্য এবং অপর ভাগ আমার জন্য। আসুন আমরা মিলেমিশে কাজ করি।" অতঃপর মহানবী মুসাইলামার দূতকে বিদায় দিলেন। এবং ঐ গোত্রেরই নাহার-আব-রাজ্জাল নামক এক ব্যক্তি যে কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাকে মুসাইলামার নিকট পাঠালেন মুসাইলামাকে সৎপথে আনার জন্য। নাহার মুসাইলামাকে বোঝাতে গিয়ে নিজেই বুঝে গেল। ভ্রান্ত মুসাইলামার ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়ল। মোনাফেক সেজে লোকদের বলতে লাগল সে নিজ কানে শুনেছে মহানবী নিজেই মুসাইলামাকে নবীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে অবস্থাটা আরো জটিল রূপ ধারণ করল। তখনকার দিনে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লে তাকে প্রতিহত করা খুবই শক্ত হতো, কেননা তখন সমাজে একটি সামান্য পত্রিকাও ছিল না।

মুসাইলামা সবই করছিল, কিন্তু মনে মনে মদিনাকে অত্যন্ত ভয করছিল। কখন মহাবীর খালিদ এসে পড়েন। এই ভয় তাকে একেবারেই পেয়ে বসেছিল। যার জন্য সে প্রস্তুতও হচ্ছিল। হঠাৎ অতর্কিতে ভণ্ড মহিলা নবী সাজাহ ইয়ামামার উপকণ্ঠে হাজির হল মুসাইলামাকে আক্রমণ করার জন্য। এই সংবাদে মুসাইলামা যারপরনাই বিচলিত ও ভীত হয়ে সাজাহকে একটি অনুনয় পত্র দিল। প্রস্তাব দিল—"তুমিও নবী, আমিও নবী, আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মোটেই ঠিক হবে না। তুমি এস, আমি তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা দু'জনে বোঝাপড়া করে নেব। আরবের অর্ধেক তুমি পাবে। এবং অর্ধেক আমি পাবো।" এইভাবে একটি প্রস্তাব-সহ বহু মূল্যবান উপঢৌকনও পাঠিয়ে দিল সাজাহকে জয় করার জন্য। কেননা চতুর মুসাইলামা জানত মদিনাকে ঠেকাতে গেলে সে একাকী কোনদিনই পারবে না। তাই সকল দিক থেকেই কপটতার, মিথ্যার, প্রবঞ্চনাব আশ্রয় নিতে থাকল।

মুসাইলামা ও সাজাহ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ:

সাজাহ্ মুসাইলামার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বার্তা পাঠাল। মুসাইলামা সাজাহ্র জন্য অভিনন্দনের সকল আয়োজন প্রস্তুত করল। যথাসময়ে দুই ভণ্ডনবীর সাক্ষাৎ হল, পরামর্শ হল, কূটবুদ্ধি বিনিময় হল। সাজাহ্র ভালবাসা অনুরাগে রূপান্তরিত হল। মুসাইলামা সুন্দরী সাজাহকে পাবে, যার জন্য আনন্দে আত্মহারা হল। সুন্দরী সাজাহ মুসাইলামাকে লাভ করে একদিন মদিনা দখল করবে, কত সুখ-স্বপ্ন, কত দিবা-স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল। ফলে বিলম্ব না করেই তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল। এ পরিণয়টি ছিল রাজনীতির পরিণয়, কিছুটা দেহগত যৌন তৃপ্তিলাভ মাত্র। বর্তমান যুগেও সারা বিশ্ব-জুড়ে এ ঘটনাব ছড়াছড়ি। যদি একদিকে রমণী ও অন্যদিকে পুরুষ থাকে। তারা উভয়ই চেয়েছিল—একে অপরকে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়েদা লুটবে। কিন্তু এখানে বিধি যেন বাদ সাধল। যখন উভয়েরই শিষ্যগণ জানতে পারল—তাদের নবীরা এখন চরম দেহ-ভোগে লিপ্ত হয়ে গেছে। তখন তাদেবও মোহভঙ্গ হল, তারা ছত্রভঙ্গ হল। মুসাইলামা সাজাহ্ দেখল একি হল!

মহাবীর খালিদের আগমন:

খলিফা সেনাপতি ইকরামা ও সুহ্রাবিলকে মুসাইলামার বিরুদ্ধে উমানে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই মুসাইলামার হস্তে পবাজিত হযে উমানে ফিরে আসতে বাধ্য হল। তখন খলিফা খালিদকে উমানে গিযে প্রধান সেনাপতির আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। খালিদ তাঁব সমস্ত অভিযোগ হতে মুক্তিলাভ করে সসৈন্যে উমানে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে খলিফা উসামার নেতৃত্বে একদল শক্তিশালী নতুন সৈন্যও পাঠিয়ে দিলেন। এই দলে স্বনামধন্য সাবিদ বিন কায়েস ও যায়েদ বিন খাত্তবও (ওমরেব ভ্রাতা) ছিলেন। খালিদ যথারীতি প্রস্তুত হয়ে ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে মুসাইলামার ও সাজাহ্র চরিত্রের চরম অবনতি লক্ষ্য কবে তাদের দলেও চরম ভাঙন দেখা দিল। সাজাহ্র সৈন্যদলের অধিকাংশ জন বুঝতে পারল—এরা ভণ্ডনবী, প্রতারক। এদের পক্ষ হতে খালিদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে একটি প্রাণও ফিরে যাবে না। তারা সকলেই স্থিব কবে নিল—তারা মহানবীর ধর্মে আবার ফিরে যাবে। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা করেই তারা মহাবীর খালিদের উপস্থিতির পূর্বেই আপন আপন দেশে ফিরে গেল। মাত্র কয়েক শত সৈন্য সাজাহ্র নিকট রয়ে গেল। মহাবীর খালিদেব আগমনবার্তা সকলেই জানতে পেরেছিল। ভণ্ডনবী সাজাহ্ আর কালবিলম্ব না করেই মাত্র কয়েক দিন স্বামী-সংসার বা স্বামী সংসর্গ উপভোগ কবেই আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করল।

হেনকালে সেনাপতি খালিদ ইয়ামামার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করলেন। পথিমধ্যে বনি হানিফা গোত্রকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের নেত্রী মাজাকে বন্দী করে সঙ্গে আনেন। ফলে এই দলটিও খালিদের সাথেই যোগদান করল। ফলে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় অনেক দলই খালিদের সাথে যোগ দিল যারা প্রকারান্তে বিপক্ষেই ছিল। এতে খালিদের অত্যন্ত সুবিধে হল শত্রুকে একাকী আক্রমণ করতে।

এই অনুকূল পরিস্থিতিতে বীর খালিদ মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন ভণ্ডনবী মুসাইলামা খালিদকে বাধা দেওয়ার জন্য আক্‌রাবা নামক স্থানে চল্লিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করল। খালিদ তাঁর সেনাবাহিনীকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করলেন। দক্ষিণে দিলেন যায়েদ বিন খাত্তাবকে, বামে দিলেন উসামাকে। এবং নিজে থাকলেন সেনাদলের মধ্যভাগে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল :

পরদিন প্রভাতে ভীষণ ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুসাইলামার পক্ষ হতে নাহার যায়েদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল। এই নাহারকে একদিন মহানবী (সঃ) মুসাইলামার সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতক মোনাফেক নাহার তাকে সংশোধন করার পরিবর্তে নিজেকেই বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান নাহারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানে যায়েদ সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নাহারকে নরকে নিক্ষেপ করলেন। এইরূপে আরো কয়েকটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ কেটে গেল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনরূপ ফল করতে না পেরেই এবার মুসাইলামা সমবেত যুদ্ধের আহ্বান দিল। খালিদ সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

প্রবল বেগে সমবেত যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের বেগ এত বেশি ছিল যে, কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। এইভাবেই দিবা অবসান হল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, রাত্রির সমাগম হল, যুদ্ধ ক্ষান্ত হল। পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মুসাইলামার প্রধান সেনাপতি মুহাক্কাম বিন তুফায়েল মুসলিম সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবিদ বিন কায়েস, মতান্তরে আবুবকরের পুত্র আব্দুর রহমানের বর্শাঘাতে সে প্রাণ হারাল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মুসাইলামা বাহিনী একটু ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তারা আবার একত্রিত হল। যুদ্ধ পুরোদমে চলতেই থাকল। এবার রণকুশল খালিদ তাঁর ওস্তাদের মার শেষ রাত দেখাতে শুরু করলেন। প্রথমেই তকবির ধ্বনিতে রণক্ষেত্রকে নতুনভাবে প্রাণদান করলেন। তিনি যেন বুঝতে পারলেন অকারণ নিরপরাধ সৈন্যগুলোকে হত্যা করে লাভ নেই। একজনকে বধ করলেই সব কিছু চুকে যাবে। এই চিন্তা মাথাতে নিয়ে, এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে মহাবীর খালিদ দুর্বার বেগে সমস্ত

বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেই অতি দ্রুত মুসাইলামার দিকে বেগবান খরস্রোত নদীর ন্যায় ধাবিত হতে থাকলেন। অন্তরে ছিল—ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্, মুখে ছিল—ইয়া মহম্মদ, ইয়া মহম্মদ (দঃ)। পলকের মধ্যেই যুদ্ধের গতি অন্যদিকে মোড় নিল। স্বয়ং মুসাইলামা যুদ্ধপ্রাঙ্গণ ছেড়ে অন্য কোথায় গোপনে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অতর্কিতে গা-ঢাকা দিল একটি বাগান বাড়িতে। মুসাইলামা এই বাগান বাড়িটি প্রস্তুত করেছিল এই অসময়ের জন্যই। আজ কাজে লাগাল। সমস্ত সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল ঐ বাগান বাড়িতে আশ্রয় নিতে। ওটা ছিল বাগানবাড়ি তথা একটি সুরক্ষিত দুর্গ। সকলেই পশ্চাতের ঐ বাগান বাড়িতে প্রবেশ করে তার ফটকটি বন্ধ করে দেয়।

মহাবীর খালিদ সঙ্গে সঙ্গেই বাগান বাড়ি অবরোধ করলেন। মুসাইলামার যে সমস্ত সেনা বাইরে পড়েছিল, তাদের অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পেল। বাকিরা প্রাণ হারাল। সেনাপতি খালিদ মুসাইলামাকে কয়েকবার সুযোগ দিলেন আত্মসমর্পণ করার জন্য। একটি মানুষকেও হত্যা করা খালিদের ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে বাধ্য হলেন সেনাপতির ধর্ম পালন করতে। বিখ্যাত বীর বারা ইবনে মালিককে নির্দেশ দিলেন প্রাচীর অতিক্রম করে বাগান বাড়ির প্রধান ফটক খুলে দেওয়ার জন্য। বারা কালবিলম্ব না করে কতিপয় বন্ধু সৈনিকের কাঁধে ভর দিয়ে সুউচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করে ফটক খুলে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে স্রোতের ন্যায় মুসলিম সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করল। কি নিষ্ঠুর দৃশ্য! কি সকরুণ দৃশ্য! যুদ্ধ করার মতো সাহস ও শক্তি কিছুই নেই, কোথাও পালাবারও উপায় নেই। একমাত্র উপায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ। এই পথে অনেকেই আগিয়ে এল। সেনাপতি খালিদ সৈন্যদের মধ্যে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন—অত্মসমর্পণের সুযোগ দাও, আত্মসমর্পণ করলে—একজনকেও যেন এতটুকুও আঘাত করা না হয়। সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলতে থাকল। মুসাইলামার অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীর অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পেল। সেনাপতি এইটাই চাচ্ছিলেন। সকল বন্দীকে শিবিরে একত্রিত করলেন।

তখনও সামান্য সংখ্যক সেনা পরিবেষ্ঠিত হয়ে মুসাইলামা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। একথা জানতে সেনাপতি খালিদের আর দেরি হল না। তখন বিখ্যাত বর্শা-বীর নিগ্রো ওয়াহসী বার বার সেনাপতির হুকুম কামনা করছেন ভণ্ডনবী মুসাইলামাকে চিরতরে নরকের স্বাদ পাইয়ে দিতে। সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ামাত্র হাবসী ক্রীতদাস নিগ্রো বর্শা-বীর ওয়াহসী এক বর্শাঘাতেই মুসাইলামার জন্মলীলা খতম করে দেওয়া মাত্রই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। এখানেই ভণ্ডনবীদের অধ্যায় চিরতরে সমাপ্ত হল। আসওয়াদ-আনসী ও মুসাইলামা নিহত হল এবং তুলাইহা ও সাজাহ পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইসলামে ফিরে আসেন।

৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক তাবারি এই বাগানটিকে মৃত্যুর বাগান—("The Battle of the Garden of Death") বলে উল্লেখ করেছেন। এই ইয়ামামার কঠিন ভয়াবহ যুদ্ধ সম্পর্কে জোসেফ হেল বলেন—"রক্তক্ষয়ী কঠিনতম যুদ্ধগুলোর মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ ছিল অন্যতম"। নিগ্রো বীর এই ওয়াহসীই একদিন ওহোদ যুদ্ধ প্রান্তরে এই বর্শাটি দিয়েই মহানবীর চাচা মহাবীর হামজার প্রাণনাশ করেছিলেন। এই হত্যার পর ওয়াহ্সী বলেছিলেন—"আমার চির অনুতপ্ত হৃদয়ের চির অনুতাপ আজ অনেকখানিই শান্ত হল"। যে সাধের বাগানটিকে একদিন ভণ্ডনবী মুসাইলামা অতি আদরে, অতি সযত্নে, অতি সুকৌশলে তৈরি করেছিলেন, আজ সেই বাগানই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ইয়ামামা যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল :

এই যুদ্ধের ফলে সেনাপতি খালিদ এই অঞ্চলে বিনা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গ বা সুসজ্জিত বাগান লাভ করলেন। এই যুদ্ধের জয়লাভের ফলে ঐ সমগ্র অঞ্চলটি ইসলামের পতাকাতলে এল। সর্বাপেক্ষা বড় লাভ হল ভণ্ডনবীদের ইতিহাস এইখানেই শেষরেখা টানল। যারা সমগ্র আরবকে উত্তাল করে তুলেছিল, সমগ্র আরব আজ বুঝতে পারল—ইসলামের অমিত শক্তির উৎস কোথায়। তা তাঁদের সেনাবল নয়, সম্পদ নয়, তা ছিল তাঁদের ঈমানের বা বিশ্বাসের জোর, যে জোর তাঁদের জুগিয়েছিল—অপ্রতিহত শক্তি, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ ও বিশ্ববিজয়ী মনোবল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের আশা তেমন কিছু ছিল না। কারণ স্থানটি ছিল মুসাইলামার অনুকূলে। সেই স্থানের মানুষও ছিল তারই অনুকূলে। আবহাওয়াও ছিল তাদেরই অনুকূলে, সেনাদের সংখ্যাধিক্য ছিল তারই পক্ষে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ১২০০ শত সৈন্য নিহত হয়, তার মধ্যে ৩৯ জন, মতান্তরে ৩০০ জন হাফিজ (কোরআন মুখস্তকারী) ছিলেন। অপরপক্ষে মুসাইলামার ১২০০০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এবং বিশাল সংখ্যক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসাইলামার পরাজয় ও মৃত্যুতে সমগ্র আরব-ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। মহাবীর খালেদকে সকল উপজাতিই সাক্ষাৎ আজরাইল বা যমদূত মনে করতে থাকল। এই যুদ্ধের পর কোন উপজাতিই আর দ্বিতীয় বারটি সাহস করল না ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। এইখানেই আবুবকরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল, সার্থক হল। বিশ্ববিজয়ের আগেই আরববাসী আরব দেশকে প্রথম জয় করল। সুতরাং ইয়ামামার যুদ্ধের ফলাফল ছিল আরবদের বিশ্বজয়ের শুভ উদ্বোধন। এই যুদ্ধে বহু হাফেজ শহিদ হওয়ার জন্য খলিফা আবুবকর মহানবী কর্তৃক সংরক্ষিত কোরআনকে লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেন। যাতে কোরআনের হাফেজ একটি না থাকলেও কোরাআন অবিকল থাকবে।

দশম অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগীদের পরাজয়
মদিনার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল

পারস্য অভিযানের মূলে বাহরাইনের বিদ্রোহ দমন :

খলিফা আবুবকরের বিরল ব্যক্তিত্ব বলে মধ্য ও উত্তর আরব ভণ্ডনবীদের হাত হতে নিষ্কৃতি পেল। এইভাবে বিপদের প্রথম প্রবাহ কেটে গেল। ভণ্ডনবীরা ধরাশায়ী হল। ছোট বড় সকল গোত্রই ইসলামের পতাকাতলে এল। এই মহাক্ষণে, এই দুর্দিনে, এই সমস্ত কালজয়ী বিজয়ে খলিফা আবুবকরের নামের সাথে অন্য যে নামটি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তা মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নাম। অসাধারণ রণনৈপুণ্য ছিল যাঁর সহজাত শক্তি ও প্রতিভা, জন্মগতভাবেই ছিলেন বীর ও মহাবীর, পৃথিবীর কোন সমরক্ষেত্রেই যাঁর পরাজয় ঘটেনি। মহাবীর খালিদের বীরত্ব চির বিরল ও চির ব্যতিক্রমবিহীন।

মুসাইলামার পতনের পর আরবের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে শান্তি ফিরে এল। খলিফা খালিদকে মদিনায় আহ্বান জানালেন। অতঃপর খলিফা আরবের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন পারস্য-উপসাগরের তীরে অবস্থিত বাহরাইন প্রদেশে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছে। মহানবীর জীবিতকালেই বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনজির মদিনায় গিয়ে স্বয়ং মহানবীর নিকট হতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তাঁর রাজসভায় আলা ইবনে আল-হাজারামিকে তাঁর রাজদরবারে একজন মুসলিম প্রতিনিধি রূপে রাখতে সম্মত হন। হাজারামির মাধ্যমে বহু খ্রীস্টান ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহানবীর পরলোক গমনের অল্পকাল পরেই মুনজিরও ইহলোক ত্যাগ করায় বাহরাইনে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিল। ওখানে দুটো প্রধান গোত্র ছিল—বনি কায়েস ও বনি বকর। মহানবীর পরলোক গমনের পরই বনি বকর গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরে গিয়ে পারসিকদের সাহায্যে বনি কায়েসকে আক্রমণ করে। অবস্থা এতই ভীষণ রূপ ধারণ করল যে আলাকে মদিনায় ফিরে যেতে হল। খলিফা আলার মুখে সমস্ত কিছু শুনে আলাকেই নেতৃত্বদান করে ওদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন। আলার এই বাহিনী দেখেই অন্যান্য ছোটখাটো সব দলই বশ্যতা স্বীকার করল। কিন্তু বনি বকর গোত্র পারসিকদের মদত পেয়ে ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করল। তখন আলা

বনি কায়েস গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে বনি বকর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। পারস্য সাহায্যপুষ্ট বনি বকর গোত্র আপ্রাণ চেষ্টা করল আলাকে পরাজিত করতে। কিন্তু পরিশেষে বনি বকর গোত্র শোচনীয়ভাবেই পরাজয় বরণ করল। পারসিকগণ অহেতুক এই ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে আপন বিপদ ডেকে আনল। নচেৎ খলিফার কোনদিনই পারস্য অভিযানের ইচ্ছাই ছিল না। মুসলমানদের পারস্য অভিযানের মূলে ছিল এই গুপ্ত কাহিনী। কিন্তু কতিপয় ইংরেজ লেখক মূল কাহিনী জেনেও মুসলমানদের এই বলে অপবাদ দেন যে, মুসলমানরা সম্পদ লুটের তাগিদেই পারস্য আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তদানিন্তন মুসলমানদের অভিযান সম্পর্কে যে কথাটি হলফ করেই সজোরে বলা যায়, তা হল—মুসলমানদের আঘাত না করা পর্যন্ত, তাঁরা কোনদিনই কোন অভিযানেই বের হননি। একথা স্বনামধন্য ইংরেজ লেখক অধ্যাপক হিট্টিও অবলীলাক্রমেই বারবার স্বীকার করেছেন।

উমানের বিদ্রোহ দমন:

বাহ্‌রাইনের মতো অনুরূপ আর একটি ঘটনা উমানে ঘটে গেল। উমানের যুবরাজ মহানবীর জীবিতকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তাঁর দরবারেও আমরকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখা হয়। মহানবীর তিরোধানের সাথে সাথেই লকিত ইবনে মালিক নামক একজন দলনেতা নিজকে স্বঘোষিত নবী বলে জাহির করে। এবং ওখানকার আবহাওয়াকে এমনভাবে বিষাক্ত করে তোলে, দরবার প্রতিনিধি আমরকে মদিনায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। এই সংবাদে খলিফা তৎক্ষণাৎ হোজাইফার নেতৃত্বে একদল সেনা উমানে পাঠালেন। হোজাইফাকে সাহায্য করার নিমিত্ত সেনাপতি ইকরামাকেও নির্দেশ দেওয়া হল। উভয়ের চেষ্টায় দাবার যুদ্ধে উমান বিদ্রোহ চিরতরে প্রশমিত হল। হোজাইফা উমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। ইকরামা পূর্বাঞ্চল হতে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে মাহ্‌রা দখল করেন। এখানে কোনরূপ সংঘাত বাধেনি। এই অঞ্চলে বহু ধনসম্পদ ও বহু উট ইকরামার হস্তগত হয়। যেগুলিকে তিনি মদিনায় পাঠিয়ে দেন গরিব জনসাধারনের জন্য।

ইয়ামেনের বিদ্রোহ ও হাজারামাউত দখল:

দক্ষিণ ইয়ামেনে ভণ্ডনবী আসাদের মৃত্যুর পর তার অনুচরবৃন্দ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনে খলিফা মাহাজির বিন আবি উমাইয়াকে নিযুক্ত করেন। উমাইয়া কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন। এখানকাব যানদা গোত্রের নেতা আল-আসাথ-বিন কায়েম মহানবীর কালে ইসলাম গ্রহণ

করলেও পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন ইকরামা পূর্ব দিক হতে এবং মোহাজির পশ্চিম দিক হতে অগ্রসর হয়ে হাজারামাউত নামক স্থানে তাকে আক্রমণ করেন। আসাথ আত্মসমর্পণ করলে তাকে খলিফার সমীপে পাঠান হল। খলিফা তাকে ক্ষমা করলে আসাথ স্বেচ্ছায় ইরাক ও পারস্যের মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন।

এইরূপে আবুবকর মাত্র এক বছর খেলাফতকালের মধ্যেই আরবের যাবতীয় বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়ে যে কৃতকার্যতার পরিচয় তুলে ধরলেন, ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ওয়াদি-উল-কোরাহ, ধূলকাশা, বুজাখা, ইয়ামামা, বাহরাইন, ইয়েমেন, উমান, হাজারামাউথ যাবতীয় অঞ্চলই খলিফার অধীনে এল। চারজন ভণ্ডনবীরই অবসান ঘটল। সকল নেতার নেতৃত্বের সাধও মিটল। অনাচার-অনাসৃষ্টি সবকিছুই দূর হল। ইসলামের সনাতন আদর্শ জয়যুক্ত হল। খলিফার দূরদর্শিতার ও কঠিন মনোবলের জয় ঘোষিত হল। সবার উর্ধ্বে খলিফা আবুবকর আরব দেশকে নতুন ভাবে জয় করলেন। বিশ্বজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। খলিফা আবুবকরের এই তুলনাবিহীন জয় সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার বলেন—"ইসলামের জয় সর্বত্র দেখা দিল। রাজস্ব-যাকাত, ও অন্যান্য ধনসম্পদ বোঝাই উটের কাফেলা দিনের পর দিন মদিনাতে আসতেই থাকল। ইসলামের এই প্রত্যক্ষ জয় অপেক্ষা পরোক্ষ বিজয়ই আরো ব্যাপক ও গভীর হল। ধর্মদ্রোহীদের বরাবর পরাজয়ে রুক্ষ, রূঢ় দুর্বারমরুচারী বেদুঈন অন্তরে ইসলামের আলো পূর্বাপেক্ষা আরো সুদৃঢ় হল, এবং ইসলামের দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করল। কেবলমাত্র তাই-ই নয়, সমগ্র আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এনে দিল এক নববিপ্লব।"

মানব জাতির ইতিহাসের উত্থান-পতনে যে কয়েকটি মানুষ আপন আপন কার্যবলে চির স্বাক্ষর রেখে গেছেন, খলিফা আবুবকর ও বীর খালিদ তাঁদের অন্যতম।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে
কীর্তি দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।

একাদশ অধ্যায়

উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত

পারস্য অভিযান (৬৩৩-৩৪)

পবিত্র কোরআনের একটি কথা পৃথিবীর মাটিতে বারে বারে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কথাটি—"এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসময়, একমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহানুভব, সুমহান।" ৫৫:২৬-২৭।

যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়,
মহত্বে গৌরবে তুমি এত সুমহান
জগৎ জুড়িয়া দান নাহি প্রতিদান।

কয়েক বছর পূর্বেও যেমন বিশ্বে দুটো বৃহৎ শক্তি বিরাজিত ছিল, একটি আমেরিকা ও অন্যটি রাশিয়া (বর্তমানে রাশিয়া খণ্ডবিখণ্ড)। তদানীন্তন বিশ্বেও দুটো অনুরূপ বৃহৎ শক্তি ছিল। এশিয়াতে ইরান ও ইউরোপে রোম। এই দুই বৃহৎ শক্তির সম্মুখেও 'ইসলামের মহানবীকে দাঁড়াতে হয়েছিল। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বহু আঘাত তাঁকে সহ্য করতেও হয়েছিল। এবং তিনি তাঁর জীবিতকালে ভবিষ্যৎবাণীও করে গিয়েছিলেন—"সত্বর এই দুই বৃহৎ শক্তি ইসলামের পতাকাতলে আসবে।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্যে পরিণত হয়েছিল। আফ্রিকার কায়রোয়ান হতে ইউরোপের কনস্টান্টিনেপোল, স্পেনের কর্ডোভা হতে এশিয়ার সাইবেরিয়া, ভারতের কাবুল হতে চীনের কাশগড় পর্যন্ত এক অচিন্ত্যনীয় ও অভাবনীয় সুবিশাল অঞ্চল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে (৫৭০-৬৩২, ৬৩২-৬৬১, ৬৬১-৭৫০, ৭৫০-১২৫৮) ইসলামের শান্তি-পতাকাতলে শোভাবর্ধন করেছে। সুব্হান্ আল্লাহ্।

একবার ঘরে দেখ অতীত-জগৎ
ইসলামের জয়যাত্রা রাজ্য খেলাফত।
এশিয়া আফ্রিকা হতে ইউরোপ বিজয়
ইসলামের অদ্বিতীয় কৃতি সুনিশ্চয়।
আজিও আশ্চর্যভাবে জগৎজনে
নিঃস্ব আরব ইহা করিলে কেমনে।
এ রাজ্য গড়েনি কোন ছলে-বলে-কলে
ইসলাম গড়িল তার ঈমানের বলে।

হযরত আবুবকর দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি নিরসনে, বিশৃঙ্খলা ও চরম বিদ্রোহ দমনে যখন একেবারেই ব্যস্ত ছিলেন, তখন ধীর খলিফা, জ্ঞানী আবুবকর একটি জিনিস বারবার লক্ষ্য করেছিলেন। ইসলামের এই দুর্দিনে বৃহৎ শক্তি পারস্যরাজ কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং কারণে অকারণে সর্বদাই ইসলামের উৎখাতে যথাসাধ্য সাহায্যও করেছিলেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন—রোমান রাজত্ব। তখনকার দিনে ইরাক দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলকে বলা হতো ইরাক-ই-আবস, এটি পারস্যের অধীনে ছিল। এবং পশ্চিমাঞ্চলকে বলা হতো ইরাক-ই-আযম, এটি আরবের সাথে জড়িত ছিল। যদিও আরবের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু এখানে ইসলামের আলো তখনও পৌঁছায়নি। কেননা অধিবাসীদের সকলেই ছিল খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী। এই অঞ্চলের ভণ্ডনবী সাজাহ ও তুলাইহা যখন মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন পারস্যরাজ তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। এই ঘটনাতে খলিফা আবুবকর পারস্যরাজের অমানুষিক ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। এবং মনে রেখেছিলেন—আল্লাহ্ সুযোগ দিলে যথাসময়ে যথাযোগ্য উত্তর দেবেন। অন্যদিকে রোমানগণ সিরিয়া দখল করে আরবকে পদানত করাব জন্য সদাই উৎসুক ছিল। এইভাবে আরবের পূর্ব প্রান্তে বৃহৎ শক্তি পারস্যরাজ ও উত্তরে বৃহৎ শক্তি রোমরাজ আরবকে চরমভাবেই বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। হযরত আবুবকরের অসীম মনোবল ও অফুরন্ত ঈমান এবং বীর খালিদের অপরিমিত তেজ ব্যতীত ইসলাম সেদিন রক্ষা পেত কিনা কে জানে।

খলিফা তাঁব দু'বছর খেলাফতের প্রথম বর্ষে আপন ঘর সামলিয়ে নিলেন। পরবর্তী বছর দূরদর্শি খলিফা উত্তর-পূর্ব উভয় সীমান্তে অভিযান পাঠাতে বাধ্য হলেন। খলিফা প্রথম সেনাপতি মুসান্নার অধীনে ইরাক সীমান্তে আট হাজার সৈন্যের একটি অভিযান প্রেরণ করেন। খলিফা অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে অনতিবিলম্বে (আল্লাহর তরবারি) অজেয় বীর সেনাপতি খালিদের অধীনে দশ হাজার সৈন্যের অন্য একটি অভিযান প্রেরণ করলেন সেনাপতি মুসান্নাকে সাহায্য করার জন্য। খলিফা খালিদকে নির্দেশ দিলেন—তিনি যেন ইরাকের পাদদেশ হয়ে অগ্রসর হয়ে সেনাপতি মুসান্নার সাথে মিলিত হন। এবং সম্ভব হলে পথিমধ্যে যেন 'উবাল্লা বন্দর' দখল করেন। খালিদের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খলিফা অন্য একজন সেনাপতি ইয়াজিদকেও (বা আইয়াজ) একই উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তিনি যেন দুমা হয়ে ইরাকে মুসান্নার সাথে মিলিত হন। যাত্রাকালে খলিফা সকল সেনাপতিদের একই নির্দেশ দিলেন—"কেউই যেন মহানবী প্রদত্ত ইসলামের যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন না করেন। (দ্রঃ— মহানবী, তৃয় সঃ পৃঃ ৪৪০, সেনাপতি মহানবী)।

হাফির বা শৃঙ্খলের যুদ্ধ (৬৩৩ খ্রীঃ), উবাল্লা অধিকার:

সেনাপতি খালিদ উবাল্লা বন্দরে উপনীত হয়ে খলিফার নির্দেশমতো ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা হরমুজের নিকট একটি পত্র লিখলেন:

"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে—আপনি যদি নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে চান, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করুন, অথবা জিজিয়া কর প্রদান করে যিম্মি রূপে খলিফার অধীনে বসবাস করুন। অন্যথায় যদি কিছু ঘটে, তার জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন। অন্য কাউকে দোষারোপ করবেন না। জেনে রাখবেন আমি এখানে এমন একদল সেনাবাহিনী-সহ অপেক্ষা করছি, যারা মৃত্যুকে ঐরূপই ভালবাসে, আপনারা যেমন জীবনকে ভালবাসেন।"

চরম দাম্ভিক হরমুজ এই চরম পত্র পেয়ে কাল সাপের মতো ফণা তুললেন। নগণ্য আরবের এক তুচ্ছ সেনাপতির এ কোন্ ধৃষ্টতা! সমগ্র সেনাবাহিনীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেনাপতি হরমুজ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ আরব সেনাপতিকে এক উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উবাল্লার হাইফার বা হাফির নামক স্থানে উপনীত হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর ঝরনাগুলো অধিকার করে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী যুদ্ধের প্রকোপে যাতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে না পারে, তার জন্য একে অন্যের সাথে পায়ে পায়ে শিকল জুড়ে দিলেন। এই কারণেই এই যুদ্ধকে 'শৃঙ্খলের যুদ্ধ' (Battle of Chains) বলা হয়।

সেনাপতি খালিদ সর্বপ্রথম সেনাপতি হরমুজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই বলে আহ্বান করেন।—'আসুন আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হই, যিনি যুদ্ধে জয়ী হবেন, তাঁরই দিকে ঝরনাগুলো পড়বে।" উত্তেজিত হরমুজ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করে রণক্ষেত্রের পাশে ঝোঁপের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য লুকিয়ে রাখেন। যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হলে লুক্কায়িত সৈন্যদল মহাবীর খালিদকে আক্রমণ করলে রণকুশল বীর খালিদ সকলের সমবেত চেষ্টাকে ব্যর্থ করেই সেনাপতি হরমুজকে বধ করলে পারস্য সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। তখন পারস্যবাহিনী প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দ্রুত পালাতে থাকে। মুসলিম বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। প্রচুর ধনরত্ন মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। যার মধ্যে ছিল হরমুজের মণিমানিক্য খচিত অসাধারণ মুকুটটিও। যার তখনকার দিনে মূল্য ছিল—এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। পলাতক ও নিহত সৈনিকদের শৃঙ্খলগুলোর ওজন ছিল সাড়ে সাত মন। বহু হাতী, বহু উট ও বহু ঘোড়ার মধ্যে একটি শ্বেত হাতিও ছিল। সেনাপতি খালিদ সমস্ত যুদ্ধলব্ধ ধন ও প্রাণী একসাথে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন।

খলিফা এই সমস্ত যুদ্ধলব্ধ ধনরাশি দেখে আশাতীত আনন্দ লাভ করেন। হরমুজের মাথার মহামূল্য মুকুটটিকে সেনাপতি খালিদকেই দান করলেন। কেনন

তখনকার দিনে মল্লযুদ্ধে যিনি বিজয়ী হন, তাঁকেই নিহত ব্যক্তির অঙ্গ-ভূষণ দান করার রীতি ছিল। খলিফার নির্দেশে সাদা হাতিটিকে মদিনার সকল রাস্তাতে একবার ঘোরান হল। কোন এক বৃদ্ধা মহিলা হাতিটিকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন—"এটাও কি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন?" খলিফা এ হাতিটি ইরাকের প্রাণী, তাই আবার তাকে ইরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জীব-জন্তুর প্রতি মহানবীর ন্যায় খলিফারও খুবই মমতা বোধ ছিল।

রাজকন্যার দুর্গ জয়:

সেনাপতি মুসান্না তাঁর অশ্বারোহী সেনাবাহিনী নিয়ে পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। নদী পার হয়ে একটি সুন্দর দুর্গ দেখতে পেলেন। এটি ছিল পারস্য-রাজকন্যার স্বর্গপুরী বা দুর্গ। একে বলা হত—The Lady's Castle. দুর্গ রক্ষা করতে রাজকন্যার স্বামী প্রাণ হারালেন। সেনাপতি মুসান্না তাঁর ভ্রাতার ওপর এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে পরবর্তী দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হলেন। এদিকে রাজকন্যা সেনাপতি মুসান্নার ভ্রাতার ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি তাঁকে পতিরূপে বরণ করলেন। এই দুঃসংবাদ পারস্য সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি কালবিলম্ব না করে সেনাপতি মুসান্নার বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন।

ওয়ালাজার যুদ্ধঃ মহাশশ্মান:

উবাল্লার পতন, হরমুজের মৃত্যু, জামাতার মৃত্যু, রাজকন্যার ইসলাম গ্রহণ ও নতুন পতি বরণ, রাজকন্যার দুর্গের পতন ইত্যাদির নানা দুঃসংবাদ যেন পারস্য সম্রাটকে পাগল করে তুলল। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে সেনাপতি বাহ্মানকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বিশাল বাহিনী-সহ প্রেরণ করেন। এই সংবাদ মহাবীর খালিদের কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও বিদ্যুৎগতিতে সেনাপতি মুসান্নার দিকে ধাবিত হলেন। ওয়ালাজা নামক স্থানে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। মুসান্না ও মহাবীর খালিদের তীব্র আক্রমণে পারসিকগণ দিকভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মহাবীর খালিদ মহামান্য খলিফার আদেশ স্মরণ করে তাদের বহুবার আত্মসমর্পণের সুযোগ দেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—ওদের পরিণতি কত দূর ভয়াবহ হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়েও যখন তারা সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না, তখন যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। এবার খালিদ যুদ্ধনীতি অনুসারে অতি নির্মম আদেশ দিলেন—যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমরক্ষেত্র যেন মহাকালের ভয়াবহ এক নীরব সাক্ষীরূপে মহাশ্মশানে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে ইসলামের পতাকাও উড্ডীয়মান হল।

তাইগ্রিসের যুদ্ধ :

হাফির ও ওয়ালাজার যুদ্ধের পর পারস্য দরবার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ে। এবার পারস্যরাজ তাঁর রাজ্যের অনুগত বনি বকর গোত্র ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বেদুঈন গোত্র হতে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এই বাহিনী প্রস্তুতের পেছনে একটি রাজনৈতিক কৌশলও ছিল। মহানবীর জীবিতকাল হতেই দুটো গোত্র ছিল—একটি বনু বকর ও অন্যটি বনু খোজা। প্রথম গোত্রটি আজন্মকাল মহানবী ও ইসলামের চিরশত্রু ছিল। মহানবীর প্রতি তাদের বিদ্বেষ ছিল জন্মগত বা স্বভাবজাত। এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বেদুঈনগণও অনুরূপই ছিল। পারস্য সম্রাট চিন্তা করলেন—ইসলামের জন্মগত শত্রুকে যুদ্ধে নামালে, তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করবে, এবং যুদ্ধে জয় হবে অবশ্যম্ভাবী। এই কূটনীতির বশে তিনি এই দুটো গোত্রকে একত্রিত করলেন। তৈরি হল বিশাল বাহিনী। সেনাপতি নিযুক্ত হলেন বিখ্যাত বাহমন। সেনাপতি খালিদকে ধনে-প্রাণে শেষ করার জন্য সেনাপতি বাহমন আজ যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মহাবীর খালিদও তাঁর চিরাচরিত রণকৌশল মতো প্রস্তুতি নিয়ে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় কিছু সংখ্যক সৈন্যকে গোপন নির্দেশ-সহ মোতায়েন রেখে অগ্রসর হলেন। বাহমন বাহিনী প্রবল বেগে খালিদ বাহিনীকে আক্রমণ করল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয়-পরাজয় তখনও অনিশ্চিত। হঠাৎ রণকুশল খালিদের ঐ গোপন বাহিনী পশ্চাৎ হতে তীব্রগতিতে বাহমন বাহিনীকে আক্রমণ করায় তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের গতিও সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে মোড় নিয়ে খালিদের জয়কে একেবারেই সুনিশ্চিত করে দিল। যুদ্ধ দামামা নীরব হল। ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠল।

উলিসের যুদ্ধ ও আম্বিসিয়া অধিকার :

পারস্য বাহিনী প্রাণভয়ে উলিসের দিকে পশ্চাদ্ধাবন করলে, খালিদ তাঁদের তীব্র গতিতে ধাওয়া করেন। এবং উলিসের যুদ্ধে পারস্যের অন্য এক বাহিনীকে পরাজিত করে সেনাপতি খালিদ হিরা অধিকারে মনস্থ করেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন খ্রীস্টান। তাঁরা সব সময়ই পারসিকদের সাথে যোগদান করত মুসলমানদের বিব্রত করতেন। তাই খালিদের ইচ্ছা ছিল এই উপজাতিদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। তিনি অনতিবিলম্বে হীরার নিকটবর্তী আম্বিসিয়া নগরটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করে দখল করেন। এই নগর হতে খালিদ আশাতীত ধনসম্পদ লাভ করেন। এই আক্রমণে প্রতিটি অশ্বারোহী সৈনিক ১৫০০ স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেছিলেন। এবং যুদ্ধলব্ধ

ধনের এক-পঞ্চমাংশ খলিফার নিকট পৌঁছলে খলিফা অতি উল্লাস ভরে বলে ওঠেছিলেন—"দেখ ইসলামের সিংহ পারস্যের সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিভাবে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আর কোনদিন কোন আরব-রমণী দ্বিতীয় খালিদকে জন্ম দিতে পারবে না।"

হীরা অধিকার:

অতঃপর খালিদ বিনা বাধাতেই হীরা অবরোধ করেন। হীরার শাসনকর্তা পূর্বেই হীরা ত্যাগ করেছিলেন। হীরার অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন খ্রীস্টান। তাঁরা আত্মসমর্পণও করেননি। কয়েকদিন অবরুদ্ধ থাকার পর সেখানকার কয়েকজন পাদ্রী প্রমাদ গুণলেন, এবং বুঝতে পারলেন—আরও অধিক বিলম্ব করলে আর কিছুই বাকি থাকবে না। বলারও থাকবে না। পাদ্রীগণ নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হতে খালিদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন। খালিদ সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সন্ধি হল। এই সন্ধি অনুযায়ী সেখানকার নাগরিকবৃন্দ সকলেই আপন ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সকল কিছু পালন করতে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেন। শুধু তাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কব দিতে হল। ইসলামের কোন যুদ্ধে কোথাও কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়নি। কেননা এটা ইসলামের ধর্মনীতির বিরুদ্ধকাজ। তাই মুসলমানরা হাজাব বছব ভারত শাসন করেও এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠই ছিল। সেনাপতি খালিদের দ্বারা এই প্রথম একটি অমুসলিম প্রদেশ ইসলামের পতাকাতলে এল। এ গৌরব সেনাপতি খালিদেরই প্রাপ্য। এই সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন বলেন:

"In the first year of the first Caliph, his lieutenant Khaled, the Sword of God, and the scourge of the infidels, advanced to the bank of the Euphrates, and reduced the cities of Anbar and Hira. Westward of the ruins of Babylon, a tribe of Secondary Arabs had fixed themselves on the verge of the desert and Hira wàs the seat of a race of kings who had embraced the Christian religion and reigned above six hundred years under the shadow of the throne of Russia. The last of the Mondars was defeated and slain by Khaled; his son was sent a captive to Medina; his nobles bowed before the successor of the prophet; the people were tempted by the example and success of the their countrymen; and the Caliph accepted as the first-fruits of foreign conquest an annual tribute of seventy thousend pieces of gold. The conquerors, and even their historians, were astonished by the dawn of their future greatness. ."—Decline and Fall of the Roman Empire, VOl. 5, page 299.

রাজধানী মাদায়েনের পথে সেনাপতি মুসান্না :

মহাবীর খালিদ কর্তৃক হীরা বিজয়ের পর মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা যেটি লাভ হয়েছিল, তা বিদ্রোহী পারসিক ও আরব উপজাতিদের চিরতরে মেরুদণ্ডহীন করা। সেনাপতি মহাবীর খালিদের জীবনে এইটাই ছিল বড় কথা, তিনি যেখানেই গেছেন, কেবলমাত্র শত্রুকে পরাজিত করেই ঘরে ফেরেননি। শত্রুপক্ষের সমর-সাধ জীবনের মতো মিটিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই ছিল রণনিপুণ সেনাপতি খালিদের কৃতিত্বের তুলনাহীন জয়। হীরা অধিকারের পর খালিদ ওখানে বসেই সৈন্য পরিচালনা করতে থাকলেন। হীরাকে করলেন তাঁর সামরিক প্রধান ঘাঁটি।

অন্যদিকে, সেনাপতি মুসান্না ইউফ্রেটিসের তীরে নাহার-শির অঞ্চলগুলোতে বিরামবিহীন আক্রমণ চালিয়ে পারসিকগণকে দিগভ্রান্ত করে তোলেন। পারস্য সাম্রাজ্যের স্বাধীন জাতীয় পতাকা যেন ঝড়ের বেগে ভূ-পতিত। স্বাধীনতার রবি যেন ঘনঘোর কালমেঘে মেঘাচ্ছন্ন প্রায়। জাতীয়জীবন যেন চরম দুর্দিনের সম্মুখে। রাজপ্রাসাদ আজ পুরুষ শূন্য। একের পর এক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। কেননা সামান্য অসভ্য আরবের নিকট পারস্য-রাজবংশের আত্মসমর্পণ মোটেই সম্ভব ও সমীচীন ছিল না। ঐ আত্মগ্লানির পরিবর্তেই আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। মহাকালের কবলে পারস্যের মাটিতে ছিল এ এক মহাদুর্দিন। একি বহুদিনের সঞ্চিত পাপের, পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্তের পালা! কে জানে মহাকাল কখন্ কোন্ গর্বোদ্ধত বিশ্বশক্তিকে কার দ্বারা কি করায়! শুধুমাত্র রাজমহিষী ও রাজকুমারীদের পক্ষ হতে যেটুকু করার, তাঁরা তাই করছিলেন। এদিকে মুসান্না ঝড়ের গতিতে রাজধানী মাদায়েনের দিকে আগুয়ান। একমাত্র দুমায় অবস্থিত ইয়াজিদের নিকট হতে তখনও কোন সংবাদ এল না। তাঁকে নির্দেশ ছিল মুসান্নার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য। তিনি অভিযানে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আম্বার ও আইন-নুত-তামার দুর্গ অধিকার :

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অত্যন্ত ব্যস্ত। ঠিক সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও সিরিয়া অঞ্চল হতে রোমকগণ মুসলমানদের কম ব্যতিব্যস্ত করেননি। ব্যাবিলন হতে মাত্র আশি মাইল দূরে মুসলমানগণ একটি পারসিক দুর্গ অবরোধ করলেন, অধিকার করতেও কোন কষ্ট হল না। এই অঞ্চলটি ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা উর্বরভূমি। এখানে মুসলমানগণ স্থায়ীভাবেই বসবাস আরম্ভ করলেন। অতঃপর সেনাপতি মুসান্না তিনদিনের পথ অতিক্রম করে আরো পশ্চিমে আইন-নুত-তামার দুর্গ আক্রমণ করলে বহু পারসিক সেনার সাথে বহু আরব সৈনিকও যোগ দিল। এই আরবগণ

ছিল বনি-তাগালিব গোত্রের লোক, যারা একদিন ইয়ামামার যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে ভণ্ডনবী সাজাহকে সাহায্য করেছিল। শত্রুশিবিরে উভয়পক্ষই একত্রে মিলিত হয়েছে, এই দুঃসংবাদ সেনাপতি খালিদের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি কালবিলম্ব না করেই আইন-নুত-তামার দিকে ধাবিত হলেন। পথিমধ্যে বিপুল সংখ্যক পারসিক সৈন্য খালিদের পথ অবরোধ করলেন। খালিদ পারসিকগণকে পথ ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি সম্মুখ সমরে আহ্বান জানালেন। পারসিকগণ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বারবার অনুবোধ করলেন পথিমধ্যে সংগ্রাম না বাধিয়ে সমরে যেতে। কোন ফল হল না। তখন খালিদ শেষবারের মতো সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু পারসিকগণ তবুও পথ ছাড়তে রাজি হল না। আইন-নুত-তামারের শাসনকর্তা দুর্গ হতে এই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, তাঁর নির্দেশেই পথ অবরুদ্ধ হয়েছিল।

নিরুপায় সেনাপতি খালিদ এবার উত্তর দিলেন—তবে দেখে নাও, সমর কাকে বলে। কয়েকবার আকাশ-পাতাল ভেদ করে তকবির-ধ্বনি সহ খালিদ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন—যুদ্ধ। প্রবল বেগে যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর খালিদের গতি এতই বেগবান ছিল, আপন সেনারাও তাঁর পাশে যেতেও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে পারসিক বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবেই পরাজয় বরণ করল। দুর্গেব শাসনকর্তা পাবসিকগণের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গ ত্যাগ কবেন প্রাণভযে। দুর্গের মালিক হলেন খালিদ। খালিদ এবাব প্রকৃত সংহাবেব মূর্তি ধাবণ করলেন। রাগরোষ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ আজ সবকিছুই খালিদের মনে যেন পুঞ্জীভূত। যিনি বারবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবেছিলেন, সেই দলপতিকে প্রকাশ্যে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সকল সামরিক বাহিনীকেও। একমাত্র তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মুসলিম সেনাদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হল। জীব-জন্তু আগান-বাগান, শস্যক্ষেত্র, স্থাবর-অস্থাবর সকল কিছুই মুসলমানদের হস্তগত হল।

নিকটে একটি খ্রীস্টান গির্জা ছিল, সেখানে চল্লিশ জন বালক লুকিয়ে ছিল। তাদের সেনাপতির সম্মুখে হাজির করা হলে তারা বলল—তাবা এখানে বাইবেল শিখতে এসেছে। তখন খালিদ তাদের মুক্তি দিলেন। তারা খালিদেব মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই চল্লিশ জন বালকের দ্বারা ইসলামের বহু মূল্যবান কাজ সাধিত হয়েছিল। ইসলাম জগতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক ও বিশ্ববিখ্যাত স্পেনবিজয়ী সেনাপতি মুসা ও তারিক এঁদেরই বংশোদ্ভূত ছিলেন।

দুমার খ্রীস্টান বিদ্রোহ প্রশমিত:

সেনাপতি ইয়াজিদ বহুদিন চেষ্টা করেও দুমার খ্রীস্টান বিদ্রোহ দমনে

ব্যর্থ হওয়ায় খলিফা চিন্তিত হয়ে পড়েন ও ওয়ালীদের অধীনে একদল সেনা পাঠালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খালিদকেও নির্দেশ দিলেন—তিনি যেন অনতিবিলম্বে দুমায় ইয়াজিদকে সাহায্য করেন। আইন-নুত-তামার দুর্গ পতনের পরদিনেই খালিদ খলিফার এই পত্র পেলেন। তিনি দেরি না কবেই দুমার পথে যাত্রা করলেন। খালিদের আগমনের সাথে সাথেই দুমার পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সেনাপতি খালিদ ও ওয়ালিদকে আর সরাসরি রণাঙ্গনে নামতে হল না। খ্রীস্টানগণ খালিদের বশ্যতা স্বীকার করলেন। বিদ্রোহের বহ্নি নিভিয়ে গেল। ইসলামের শান্তি পতাকা উড়তে থাকল।

বনি তাগলিব গোত্রের বিদ্রোহ দমন:

খালিদের অবর্তমানে হীরা ও অন্যান্য নিকটবর্তী অঞ্চলে পারসিক ও তাগলিব গোত্র পুনরায় বিদ্রোহের আগুণ ছড়াতে থাকে। এই সংবাদ খালিদের কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইয়াজিদকে সঙ্গে নিয়ে হীরায় উপনীত হয়ে ইয়াজিদের ওপর শহব হীরার শাসনভার ন্যস্ত করে সেনাপতি কাক্কাকে একদল সৈন্য-সহ ইউফ্রেটিসের পরপারে পাঠালেন, এবং নিজে দুর্ধর্ষ তাগলিব গোত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এবারে সেনাপতি খালিদ আব কাউকে ক্ষমা করলেন না। কেননা তাগলিব গোত্রের বিদ্রোহ ও বিশেষ করে বিশ্বাসঘাসকতা সেনাপতি খালিদের চোখে অমার্জনীয় ও ক্ষমাহীন পাপে পরিগণিত হয়েছিল। তাই এবার তিনি এই বিদ্রোহী-বৃক্ষের মূলোৎপাটন কবেই ছাড়লেন। অচিরেই সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও ধনসম্পদ সমস্ত কিছুই মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

ফিরাদের যুদ্ধ:

এবার খালিদ সসৈন্যে সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী ফিরাদ নামক স্থানে উপনীত হয়ে কয়েক মাসের জন্য সেখানে ছাউনি ফেললেন। তখন পবিত্র রমজান মাস। খালিদ এখানেই ঈদ-উৎসব পালনের ইচ্ছা করলেন। খালিদের দীর্ঘদিনের উপস্থিতিতে বাইজান্টিয়ান শাসনকর্তা যেন প্রমাদ গুনলেন। তিনি খালিদকে আক্রমণ করার নিমিত্ত একটি গোপন চক্রান্ত আরম্ভ করলেন—পারসিক ও মরু বেদুঈনদের সাথে। সকলেই মনেপ্রাণে কামনা করছিল খালিদের ধ্বংস। তবে একাকী কেউই সাহস করছিল না। তিনটি গোত্র একত্র হয়ে সেই দুর্বার সাহসটি সঞ্চয় করল। এবার তারা বুকে ভর দিয়ে খালিদকে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে এসে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাল। রণনিপুণ খালিদ তাদের ঐ প্রত্যুত্তরে নদীর পূর্বে তীরে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। শত্রুশিবির যুদ্ধে জয় অনিবার্য ভেবেই আর কালক্ষেপণ না করেই নদীর

পূর্বতীরেই হাজির হল। বেধে গেল দারুণ যুদ্ধ। শত্রুশিবির ভেবেছিল এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিদেশের মাটিতে খালিদ কি করতে পারে। দৃশ্যত অবস্থা তাইই ছিল। এই একটি মাত্র অঙ্কই শত্রুশিবিরকে যুদ্ধে প্ররোচনা ও সাহস জুগিয়েছিল। কিন্তু একক খালিদের তরবারির সম্মুখে মিলিত ত্রিশক্তিও মাথা নত করেছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন বলেন—"এই যুদ্ধে মুসলমানদেব নিহত সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭০ জন, এবং পারসিক, গ্রীক ও বেদুঈনের ছিল এক লক্ষ।" ৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এই অঞ্চলে আর দ্বিতীয় বার কোন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। এইজন্যই তখনকার দিনে মহাবীর খালিদকে বলা হয়েছিল—বিদ্রোহের যম, ইসলামের নিশান, 'আল্লার তরবারি'।

হজব্রত পালনে খালিদ:

দেখতে দেখতে হজের সময় আগতপ্রায় হলে খালিদেব মনে হজব্রত পালন করার অত্যুগ্র পিপাসা দেখা দেওয়ায় তিনি সমস্ত সেনাবাহিনীকে ধীরপদে হিরা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে কিছু সংখ্যক দেহরক্ষীসহ অতি দ্রুতবেগে হজে যোগদান করে হজ সমাপন কবে পুনরায় হিরামুখী ধীবগামী সেনাদলেব সঙ্গে যোগদান কবেন। সকলেব নিকট সমস্ত চিত্রটাই গোপন ছিল। দেহবক্ষীগণ ব্যতীত অন্য কেউই জানতেন না। সর্বশেষে খলিফা জানতে পাবেন তাঁব সেনাপতি তাঁর সাথেই হজপালন করেন অতি নীরবে, অতি সন্তর্পণে। খলিফা খালিদের ভূয়সী প্রশংসা করলেও এই কাজটিকে নীতিগতভাবে সমর্থন কবেননি। কেননা এতে বা এইরূপ কাজে বিপদ আসতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

রোম (বাইজান্টাইন) অভিযান——(৬৩৪ খ্রীঃ)

পূর্বে মহাবীর খালিদ :

তখনকার দিনে আজকের ইরাক দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ইরানের সাথে ও অন্যভাগ আরবের সাথে। অধিবাসীরা ছিল পারসিক, খ্রীস্টান ও বেদুঈন। এই ইরাকবাসী খ্রীস্টানরাই একদিন সকলের সাহায্য নিয়ে মহানবীর জীবিতকালেই মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ নিলে মহানবীকে তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। মহানবীর তাবুক অভিযান ব্যর্থ যায়নি। এই অভিযান ইরাকবাসীদের আক্রমণের সাধ মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তখন হতেই মুসলমানদের প্রতি ইরাকবাসীদের আক্রোস, হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার শেষ ছিল না। হিরা অধিকারের পর মহাবীর খালিদ তাদের সেই সমর-সাধকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তথায় শিবির স্থাপন করে বদ্ধপরিকর হলেন ভবিষ্যতের স্থিব পদক্ষেপে।

পশ্চিমে খালিদ বিন সাঈদ :

মহাবীর খালিদ যখন পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ প্রায় শেষ করে এনেছেন, তখন খলিফা আবুবকর পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। সিরিয়া প্রান্তর হতে সেনাপতি উসামার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ অঞ্চলেব রোমকগণ অশান্তির সৃষ্টি করে। খালিদ বিন সাঈদ নামক একজন প্রবীণ সাহাবী ঐ অঞ্চলের শান্তি স্থাপনের জন্য সেনাপতি রূপে যাওয়ার নিমিত্ত খলিফার নিকট অনুরোধ করলে খলিফা হযরত ওমব ও আলিব সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে সেনাপতি রূপে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে খালিদ খুবই মনঃকষ্ট-সহ খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করে সেনাপতি রূপে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। খলিফা দোদুল্যমান মন নিয়ে প্রবীণ সাহাবীর সম্মানার্থে মানবতার খাতিরেই তাকে ইসলামের যুদ্ধনীতির ওপর কড়া নির্দেশ সহ সিরিয়া সীমান্তে বিদ্রোহ দমনে সেনাপতি রূপে প্রেরণ করেন।

রোমান সেনাপতির কূটচাল :

মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন সাঈদের সিরিয়া-প্রান্তে উপস্থিতি স্বয়ং রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ

দিলেন—মোকাবিলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে। সম্রাটের নির্দেশমতো বাইজান্টিয়ানের সমস্ত দুর্গ হতে ও সিরিয় প্রান্তের বেদুঈনদের মধ্য হতে সম্মিলিতভাবে এক বিরাট বাহিনী গঠন কবা হল। এই সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি সেনাপতি খালিদকে নির্দেশ পাঠালেন—অতি ধীরে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ ফেলতে।

চতুর রোমান সেনাপতি মুসলিম সেনাপতিকে প্রলুব্ধ করে অধিক দূব ভেতরে আসার নিমিত্ত সামান্য সংখ্যক রোমান সেনাকে মৃত সমুদ্রের (Dead Sea) তীরে মোতায়েন করলেন। এ যেন বিড়ালকে মাছের লোভ দেখান। অনভিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতি খালিদ রোমান সেনাপতির ফাঁদে পড়লেন। সামান্য সংখ্যক রোমান সেনার সমাবেশ লক্ষ্য করে তাদেরকে আক্রমণ করার নিমিত্ত দূরে এগিয়ে গেলেন। রোমান সেনারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকল। অনভিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতি তাদের ধাওয়া করে এত দূরে নিয়ে গেলেন যে, তখন তিনি বুঝতে পারলেন নিজের বিপদসীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। নিজেকে বিপদাপন্ন, অসহায় ও নিরাশ্রয় ভাবতে থাকলেন। সেনাপতির যেটি মূলধন—মনোবল, সেটিকেও হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে খলিফার নিকট আশু সাহায্যের জন্য সংবাদ পাঠালেন। বিজ্ঞ খলিফা অনভিজ্ঞ সেনাপতিব অবস্থা পূর্ব হতেই আন্দাজ করে যথাস্থানে গুপ্তচরও নিযুক্ত কবেছিলেন। খালিদকে সেনাপতি করার ইচ্ছা খলিফার মোটেই ছিল না। কিন্তু খালিদ ছিলেন মহানবীর প্রবীণ সাহাবী (সঙ্গী)। মনের দিক থেকে তাব কোনদিনই কোন দুর্বলতা ছিল না। তাই খলিফা অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন মাত্র।

খলিফা সেনাপতি খালিদের অনুরোধ ও গুপ্তচরের সংবাদ পাওয়া মাত্র সেনাপতি ইকরামাকে একদল সেনা-সহ খালিদের সাহায্যে প্রেরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন—খালিদ যেন খলিফার নিকট হতে আরো অধিক সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন রূপ সিদ্ধান্ত না নেয়। সে যেন একই স্থানে অবিচল থাকে। অতঃপর ইকরামাকে আশু সাহায্যের জন্য সত্বর বিদায় দেওয়ার পর খলিফা ধীর ও স্থির ভাবে চিন্তা করতে থাকলেন, কিভাবে কাদের দ্বারা সিরিয়া সীমান্তে রোমানদের প্রতিরোধ করা যায়। মহানবীব জীবিতকালেই দুমা অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে দু'জন সেনাপতি—আমর-বিন-আস ও ওয়ালিদ অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই তখন মদিনাতে ছিলেন। খলিফার ইচ্ছা হল—এই দু'জনকেও খালিদের সাহায্যে প্রেরণ করতে। তিনি তাঁদের ডাকলেন এবং বললেন—"তোমরা কি এখন বিশ্রাম করবে, না সিরিয়া সীমান্তে যাবে?" দু'জনে একই উত্তর দিলেন—আমরা ইসলামের পবিত্র তূণে তীর স্বরূপ, আর আপনি সেই তীরের তীরন্দাজ। যেদিকে ছোটাবেন, সেই দিকেই ছুটবো।" খলিফা তাঁদের উত্তরে যারপরনাই খুশি হয়ে উভয়কেই বিপদসঙ্কুল সিরিয়া প্রান্তে প্রেরণ করলেন। তাঁদের ওপর পৃথক পৃথক দুটো

আদেশ দিলেন—আমরু (আমর বিন আস) যেন বাইতুল মোকাদ্দাসের দক্ষিণ ভাগে আইলা নামক স্থানটিকে অনতিবিলম্বে অধিকার করেন এবং ওয়ালিদ যেন কালবিলম্ব না করেই বিপদাপন্ন সেনাপতি খালিদের সঙ্গে মিলিত হন। উভয়েই আপন আপন সেনাবাহিনী-সহ খলিফার নির্দেশমতো সিরিয়া সীমান্তে যাত্রা করলেন। খলিফা তাঁর ব্যক্তিগত গুপ্তচরবৃন্দের দ্বারা গভীর উদ্বেগ-সহ সকল সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকলেন সকাল-সন্ধ্যা।

সেনাপতি ইকরামার কৃতিত্ব:

সেনাপতি ইকরামা খালিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাঁকে খলিফার সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেন তিনি কোন ভুল পদক্ষেপ না নেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ ও চঞ্চলমতি খালিদ ইকরামার সাথে সামান্য সংখ্যক সেনা হাতে পেয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করে খলিফার সতর্কবাণীকে ভুলে গিয়ে অতি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরবর্তী আসন্ন সেনাপতি ওয়ালিদের অপেক্ষা না করেই অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে দামেস্কের নিকটে পৌঁছলেন। দূরদর্শী রোমান সেনাপতি এইটাই মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন। তাঁর কামনা সফল হল। তিনি পেছন হতে বিপুল বাহিনী সহ খালিদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলে খালিদ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অসহায় খালিদ তখন আর আমরু ও ওয়ালীদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করতে না পেরে, আত্মরক্ষা করার জন্য একাকী রণক্ষেত্র ত্যাগ করে ইসলামের ইতিহাসের ঐ অধ্যায়ে আপন কর্মদ্বারা কালি লেপন করলেন। ওদিকে সেনাপতি একাকী ইকরামা অপূর্ব রণকৌশলে অসীম সাহসে অভূতপূর্ব বিশাল রোমান বাহিনীর হাত হতে সামান্য সংখ্যক মাত্র মুসলিম সেনাবহিনীকে উদ্ধার করে ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজ নামকে, যোগ্যতাকে, আপন আত্মবিশ্বাসকে সবার ওপর ঈমানকে চির অমরত্ব দান করলেন। এইরূপ মহাবিপদের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে নিরাপদ রাখতে হলে সেনাপতির লেজেও খুর থাকতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বিশেষ শ্রেণীর সমর বিশারদের মধ্যে মহাবীর অজেয় বীর খালিদ-বিন ওয়ালিদ ছিলেন সবার উর্ধ্বে। জীবনের কোন যুদ্ধেই পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। এমনি ছিল তাঁর রণকৌশল।

খালিদ যখন প্রাণভয়ে পলায়নের পথে, ঠিক সেই সময় অগ্নিশর্মা, বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ খলিফার একটি পত্র তাঁর হাতে পড়ল। পত্রটি—"খুব হয়েছে, এবার থাম। আর এক পা-ও ফেলবে না। দেশবাসীকে আর মুখ দেখিও না। নিরাপদ স্থানে প্রতিবাদ করতে তুমি খুবই সাহসী; কিন্তু সমরক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় তুমি একেবারেই কাপুরুষ। ওমর ও আলি আমার অপেক্ষা তোমাকে ভালই চিনেছিল। তাদের কথা শুনলে আজ আর আমাব সেনাবাহিনীর

এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো না।" এইখানেই সেনাপতি খালিদ বিন সাঈদের যবনিকাপাত হল।

সিরিয়া সীমান্তে মুসলিম সেনাবাহিনী যখন দারুণ পরীক্ষার সম্মুখীন, যখন তাঁরা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে, যখন খলিফার নিকট সাহায্যেব জন্য বারবাব আবেদন-নিবেদন আসতে থাকল, তখন খলিফা তাঁদের সাহায্যের জন্য আরো চারটি দল পাঠাতে মনস্থ করলেন। সেনা পাঠাতে সুযোগেরও কোন অভাব হল না। কেননা তখন অন্যান্য অঞ্চল প্রায় শান্ত হয়ে এসেছে। সেনাবাহিনীর ঘরে ফেরার পালা চলছে। প্রথম দলের ভার পড়ল—সুহরাবিলের ওপর, দ্বিতীয় দলের আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াজিদের ওপর, তৃতীয় দলের আবুওবায়দা, চতুর্থ দলের আমর বিন আস। মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ত্রিশ হাজার। ইকরামার অধীনে ছিল—ছ'হাজার।

চার-রণকুশল বীর খলিফার সম্মুখেই মদিনার মাটিতে তাঁদের রণনীতি স্থির করলেন যাত্রার পূর্বেই। স্থির হল কারা একের পর এক সিরিয়া মুখে যাত্রা করবেন। কিন্তু সকলেই এমন এমন স্থানে ঘাঁটি গড়বেন, যাতে পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে না ফেলেন। অধিকন্তু সকলেবই লক্ষ্য থাকবে একটি করে রোমান দুর্গ অধিকার। সুতরাং এক একটি রোমান দুর্গকে লক্ষ্য রেখেই সকলে শিবির স্থাপন করেন। এখানে একটি মজাব ব্যাপার ঘটে গেল। যখনই মুসলিম সেনাবাহিনী একেব পর এক যাত্রা করতে থাকলেন, তখন মৃতসাগরের তীরে যে সমস্ত আরব ও বোমান সৈন্য একত্রিত হয়েছিল, তারা সকলেই প্রাণভয়ে কেটে পড়ল। ফলে আরব সৈন্যদের পথ আরও প্রশস্ত হয়ে উঠল। এমনকি সিরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের রোমান দুর্গগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পূর্বপরামর্শ ও রণনীতি অনুযায়ী আবু ওবায়দা দামেস্কের দিকে অগ্রসর হয়ে ইকরামার কাছাকাছি শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর পশ্চাতে থাকলেন সেনাপতি সুহরাবিল জর্দান নদীর উপত্যকায়। সেনাপতি ইয়াজিদ সেবার নিকটবর্তী বেলকা নামক স্থানে এবং আমর বিন আস নিম্ন প্যালেস্টাইনের হেব্রন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী প্রত্যেকেরই সম্মুখে কোন না কোন রোমান দুর্গ লক্ষ্যস্থল রূপে দাঁড়িয়ে ছিল।

তদানীন্তন বিশ্বে দুই বৃহৎ শক্তি—রোমান ও পারস্যরাজ। কয়েক বছর পূর্বে রোমানরাজ পারস্যরাজাকে একবার পরাজিত করে নিজকে কি ভাবছিলেন, তা চিন্তা করাই যায় না। যা একদিন ভেবেছিল—মিশরের ফেরাউনরাজ, কারুন, সাদ্দাদ, ও নমরুদ প্রমুখ। এবারের সিরিয়া সীমান্তে মুসলিম সেনাবাহিনীর উপস্থিতি রোমান রাজের চোখের ঘুমকে একটু যেন পাতলা করে দিল। হিরাক্লিয়াসের চৈতন্য হল। তিনি বিচলিত না হলেও কিছুটা চঞ্চল হযে উঠলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় কযেক লক্ষের এক বিশাল বাহিনী

প্রস্তুত করলেন—যাদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করা হল। সর্ববৃহৎ সেনাদলটির পরিচালনার ভার পড়ল হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরের ওপর। মুসলিম সেনাপতিগণ তখন পরামর্শ করলেন এই বিশাল বাহিনীকে বিক্ষিপ্তভাবে মোকাবিলা করা যাবে না। সুতরাং একত্রিতভাবেই সম্মুখীন হতে হবে। এই মর্মে তাঁরা খলিফার উপদেশ ও প্রার্থনা করলেন। খলিফা তাঁদের সাথে একমত হয়েই ইয়ারমুক অঞ্চলে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন।

চিন্তিত খলিফা :

খলিফা এবার নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি যেন বুঝতে পারলেন তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে কোথাও কোন গোপন দুর্বলতা এসে গেছে। অথচ তাঁদেরকে লড়তে হবে বিরাট শক্তিধর রোমান বাহিনীর সাথে। খলিফা যেন এক নিমিষেই অনুধাবন করলেন সেনাবাহিনীর ভেতর ঐক্য, সংহতি ও দুর্জয় মনোবলকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। নচেৎ মুসলিম সেনাবাহিনী আকারে যতই বৃহৎ হতে বৃহত্তর হোক না কেন, তারা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারবে না। কেননা মুসলিম সেনাবাহিনী কোথাও কোন যুদ্ধে সংখ্যাতে বিজয়ী হয়নি। প্রতিটি বিজয়ের মূলে ছিল সেনাবাহিনীর গুণগত দিক। যাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'ঈমান' বা এক আল্লাহতে বিশ্বাস। কিন্তু প্রশ্ন হল—সেনাবাহিনীর মধ্যে ঈমানের দুর্জয় শক্তিকে ফিরিয়ে আনবে কে। খলিফা অনুধাবন করলেন এই কাজের জন্য একমাত্র অজেয় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদই উপযুক্ত ব্যক্তি। কালবিলম্ব না করে খলিফা তাঁকে পত্র দিলেন—"আমার পত্র হাতে পাওয়া মাত্রই তুমি সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে সেখানকার সমস্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ কর। আমার মনে হচ্ছে সেখানকার সেনাবাহিনী তাদের মনোবল হারিয়েছে। তোমার সেনাবাহিনীর অর্ধেক তুমি সঙ্গে নাও এবং বাকি অর্ধেক মুসান্নার নিকট রেখে যাও। আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি সিরিয়া বিজয় শেষ করে পুনরায় ইরাকে ফিরে যাবে।" খলিফার নির্দেশমতো খালিদ ৯০০০ (নয় হাজার) সেনা সহ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। মুসান্না তাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে একাকী হীরাতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইরাক সীমান্ত (একাকী মুসান্না) :

পারস্য অভিযানে মহাবীর খালিদ ও বীরবর মুসান্না যখন ইরাক সীমান্তে ব্যস্ত আছেন, তখন সিরিয়া সীমান্তে মুসলিম সেনাপতিগণ এক বিপর্যয়ের মুখে বললেই চলে। এককথায় ওখানে বিশাল রোমান বাহিনীকে দেখে মুসলিম সেনাপতিদের চোখ গোল হয়ে গেছে। তাঁরা স্তব্ধ ও স্তিমিত,কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সকলেই একযোগে পরামর্শ করলেন, এহেন সুবিশাল রোমান বাহিনীর সাথে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই খলিফার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এই কথা যখন খলিফার কর্ণগোচরে এল, তখন খলিফা বুঝলেন, ওখানে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব পড়েছে, তাই তারা মনোবল হারাচ্ছে। সুতরাং তিনি মনস্থির করে মহাবীর খালিদকে পারস্য অভিযানের ইরাক সীমান্ত হতে সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মহাবীর খালিদ খলিফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র বীরবর মুসান্নাকে ঐ হীরা অঞ্চলে একাকী ৯০০০ সৈন্য-সহ সিরিয়া সীমান্তে যাত্রা করলেন। বীর মুসান্না একাকী রয়ে গেলেন।

এবার পারস্যরাজ এটাকে একটি মহাসুযোগ মনে করে মুসান্নার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। বীরবর মুসান্না যদি সমস্ত সৈন্য-সহ ঐ অভিযানের সম্মুখীন হতে যান, তাহলে হিরা অরক্ষিত হয়ে যায়। তাই তিনি আরব উপজাতিদের মধ্য হতে কিছু সৈন্যও সংগ্রহ করলেন। এবং ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে ব্যাবিলনের নিকট শিবির স্থাপন করলেন। পারস্যের রাজধানী মাদায়েন সেখান হতে মাত্র ৫০ মাইলের পথ। পারস্য সেনাবাহিনীও তখন মুখোমুখি এসে গেল। পারস্যবাহিনী খালিদবিহীন মুসলিম বাহিনীকে এককথায় 'মুড়ি-মুড়কি' মনে করে গর্ব-অহঙ্কার ও অতি তাচ্ছিল্যভরে পারস্য সেনাপতি হরমুজ মুসলিম সেনাপতি খালিদবিহীন একাকী মুসান্নাকে একটি পত্র লিখলেন—"আরবের কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে একদল শূকরকে পাঠালাম"। ওদিকে বীর মুসান্না বিপদকে একাকী মোকাবিলা করার জন্য যত রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাই করলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। পারস্য বাহিনীতে একটি হাতিও ছিল। বীর মুসান্না তাঁর আপন দু'ভাইকে দু'পাশে দিয়ে নিজে মধ্য ভাগে থাকলেন। মুসলিম বাহিনী প্রথম ঐ হাতিটিকেই বধ করে পারস্য সেনাদের মনোবলকে চূর্ণ করে মুসলিম বাহিনীকে নতুন ভাবে চাঙ্গা করে নেন। যুদ্ধে পারসিকগণের শোচনীয় পরাজয় হল। রাজধানী মাদায়েন পর্যন্ত তারা বিতাড়িত হল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের লাভ হল—বেশ কিছু রশদ ও বহু মূল্যবান আসবাবপত্র।

সেনাপতি মুসান্না বুঝতে পারলেন এই জয় বেশিদিন স্থায়ী হবে না। যদি মদিনা থেকে আরো কিছু সংখ্যক সেনা না আসে। তাই তিনি মদিনাতে খলিফার নিকট প্রার্থনা জানালেন কিছু সৈন্য পাঠাতে। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরও যখন কোন উত্তর তিনি পেলেন না, তখন নানা দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পরিশেষে বশির নামক এক বীরের হাতে হিরার ভার অর্পণ করে নিজেই মদিনা রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন খলিফা আবুবকর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সেনাপতি মুসান্নার মদিনা আসার সংবাদ তাঁর

কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি সেনাপতিকে ঐ জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণেই ডাক দিলেন। সেনাপতি মুসান্না তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সকল কথা বুঝিয়ে বলার পর খলিফা হযরত ওমরকে ডেকে পাঠালেন। হযরত ওমর হাজির হলে তিনি বলেন—"আমি যা বলি মনযোগ সহকারে শোন, এবং সেইমতো কাজ করো। আমার মনে হয় আজই দিনে আমার মৃত্যু হবে, যদি দিনের বেলায় মৃত্যু হয় তাহলে সন্ধ্যার পূর্বে, আর যদি রাত্রে হয় তাহলে ভোরের দিকে তুমি মুসান্নার জন্য সৈন্য পাঠাবে। কোনক্রমেই যেন গাফিলতি করবে না। মহানবীর মৃত্যু অপেক্ষা আমাদের আর কোন বড় বিপদ ছিল না। অথচ সেই বিপদেও আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি যথাযথভাবে। যদি না করতাম, তাহলে আমরা সেদিন ধ্বংস হয়ে যেতাম। আর একটি কথা শোন, আল্লাহ্ যদি আমাদের সিরিয়া বিজয় দেন, তাহলে তুমি মহাবীর সেনাপতি খালিদকে পুনরায় ইবাকে পাঠিয়ে দিও। আমি তাকে কথা দিয়েছি। তুমি কথা রক্ষা কর।" হযরত ওমর খলিফার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

খলিফা আবুবকর ঐ দিনই ইহলোক ত্যাগ করেন। এবং ওমর পরদিনই খলিফার আসনে সমাসীন হলেন। খলিফা ওমর খেলাফতের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম কাজ করলেন—মহাবীর সেনাপতি খালিদকে পদচ্যুত করে আবু উবায়দাকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। খলিফা ওমর আবুবকরকে দেওয়া কথা ভঙ্গ করলেন। এবং দ্বিতীয় কাজ করলেন সেনাপতি মুসান্নার জন্য সৈন্য সংগ্রহ। এই সৈন্য সংগ্রহে তায়েফের বীর আবু উবাইদ প্রথম সাড়া দিলেন। এবং এক হাজার সৈন্য সংগ্রহ হল। খলিফা এখানে সেনাপতি মুসান্নাকে সেনাপতির পদ হতে বরখাস্ত করে আবু উবাইদকে সেনাপতি করলেন। বীরবর মুসান্না খলিফাব আদেশকে অবলীলাক্রমে মেনে নিয়ে ইরাক প্রান্তে ফিরে গেলেন।

সেনাপতি আবু উবাইদ বীরবর মুসান্নার সাহায্যে পারসিকগণের সাথে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করলেও পরবর্তীকালে তিনি মুসান্নাব কথা না শুনেই নদী ওপারে যুদ্ধে রত হন। এই যুদ্ধের স্থান নির্ণযে মুসান্না বারবার আবু উবাইদকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আবু উবাইদ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে এই সেতুর যুদ্ধে (Battle of Bridge) নিজেই হস্তীপদতলে পিষ্ঠ হয়ে মারা যান। এবং বহু মুসলিম নদীগর্ভে প্রাণ হারান। যখন মুসলিম বাহিনীর অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক, তখন মুসান্না আবার তাঁর অপূর্ব বীরত্ব সহকারে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দেন। যদিও এই যুদ্ধে মুসান্নাব এক ভ্রাতা গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পরে মারা যান। সেনাপতি মুসান্না নিজেও গুরুতরভাবে আঘাত পান। তবুও তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বই একমাত্র এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ী করার গৌরব দান করে। এর কয়েক মাসের মধ্যেই বীরবর মুসান্না ঐ আঘাতের ফলেই মারা যান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খালিদের অচিন্ত্যনীয় ঐতিহাসিক যাত্রা

জগৎ-সেনাপতির ইতিহাসে খালিদ আর একবার নিজকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করলেন। খলিফার পত্র পাঠমাত্র খালিদ বিচলিত হয়ে উঠলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য। তাঁর একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কত সত্বর সিরিয়া প্রান্তে পৌঁছতে পারেন। কত সত্বর তাদের মনোবলকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, কত সত্বর রোমান বাহিনীব মোকাবিলা করতে পারেন। ইরাক হতে সিবিযা প্রান্তে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল---উত্তর দিকে। বাকি সমস্ত দুস্তর মরুভূমি, দুর্গম পথ। কিন্তু উত্তর দিকে আছে বিদ্রোহী রোমানগণের বসবাস ও একাধিক রোমান দুর্গ। চিন্তিত খালিদ সর্বশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে দুস্তব মরুভূমির দুর্গম পথেই পা দিতে হবে। দুমাত-আল জান্দাল নামক স্থানে পৌঁছলে সেনাপতি সকলের সাথে পরামর্শে বসলেন। রাফে নামক জনৈক বেদুঈন পদপ্রদর্শককে ঐ সভাতে ডাকা হল। তাকে সেনাপতি জিজ্ঞাসা কবলেন -কোন্ পথে গেলে অতি সত্বর সিরিয়া প্রান্তে পৌঁছানো যাবে। তখন রাফে উত্তব দিলেন---একটি পথ আছে, যে পথটি জনশূন্য, যে পথটিতে পাঁচদিনের মধ্যে কোথাও একবিন্দুও পানি পাওয়া যাবে না। যে পথে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীও যেতে সাহস করে না। রাফের কথা শেষ না হতেই খালিদ বলে উঠলেন ঐ পথই আমার পথ। কিন্তু রাফে পুনরায় খালিদকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পথের ভয়াবহ দুর্গমতা ও বিপদের কথা। তখন মহাবীর খালিদ তাঁর চির স্বভাবজাত উত্তরটি দিলেন---"আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মানুষের দৃঢ়সঙ্কল্প একত্রিত হলে পৃথিবীর কোন পথই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল নয়।" মহাবীর খালিদের কথায় যখন সেনাবাহিনী দুর্গম পথকে অতিক্রম করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিলেন, তখন বেদুঈন রাফে খালিদকে একটি পরামর্শ দিলেন---কমপক্ষে ৫০টি উট সংগ্রহ করতে। এবং ঐ উটগুলোকে পানি খেতে দিতে নিষেধ করলেন। পরে যখন তারা অত্যন্ত পিপাসার্ত হবে, তখন তাদের পানি দিতে বললেন এবং তারা পেটপুরে পানি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ ও কান বন্ধ করে দিতে বলেন, যাতে তারা জাবর কেটে পেটের সঞ্চিত পানিকে নষ্ট করতে না পারে। রাফের কথানুযায়ী কাজ করা হল। এবং তিনি পরবর্তী উপদেশ দিলেন---প্রত্যেক মঞ্জিলে পৌঁছবার পর দশটি করে উট জবেহ্ করে তাদের উদরস্থ পানি ঘোড়াগুলোকে খেতে দেবেন।

বিপদের হিমালয়কে মাথায় নিয়ে দুস্তর মরুভূমির বিপদকে বুকে নিয়ে

অজেয় বীর খালিদ তাঁর ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করলেন। রাফের কথামতো কাজ করে পঞ্চম দিনে পানি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল। তখনও মরুভূমি। ধু-ধু বালুকারাশি, কোথাও পানির চিহ্নমাত্র নাই। অথচ পানিবিশিষ্ট উটগুলো সবই শেষ, সৈনিকদের নিকট মশকে যা সামান্য পানি ছিল, তাও শেষ। তখন রাফে সেনাপতিকে উপদেশ দিলেন—এই অঞ্চলে জাম জাতীয় এক প্রকার ফল আছে। যা খেলে মানুষের তৃষ্ণা কিছুটা নিবারণ হয়। যদি ঐ ফলও না পাওয়া যায় তাহলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ব্যতীত আমাদের আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। তখন সেনাদল ঐ ফল ও পানির সন্ধানে বের হলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা ফল ও পানি দুয়েরই সন্ধান পেলেন। এইজন্যই হয়তো বলা হয়—সৌভাগ্য সাহসীকেই ভালবাসেন। এইরূপভাবে জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা না নিলে আল্লাহ্ কোন জাতিরই ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না।

কোরআন: ১৩:১১, ৫৩:৩, ৩৯:৫৩।

তাদমর অধিকার:

গুপ্তপথে পানির সন্ধান পেয়ে উল্লসিত সেনাদল খালিদকে মহানন্দে আলিঙ্গন করেন। খালিদ বুঝতে পারলেন সিরিয়া প্রান্ত আর বেশি দূরে নয়। রাফে খালিদকে জানিয়ে দিলেন—মাত্র ১০০ মাইলের মধ্যে রোমানদের দামেস্ক দুর্গ অবস্থান করছে। এবার রণকুশল বীর যথারীতি তার কাজ আরম্ভ করলেন। অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল অতর্কিত আক্রমণ। এই আক্রমণের শিকার হল রোমানদের তাদমর দুর্গ। এখান হতে দামেস্ক মাত্র ১৫ মাইল দূরে। সেনাপতি হঠাৎ তাঁর যাত্রা পথকে ঘুরিয়ে দিয়ে আজরাত নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। তখন দামেস্ক আরো নিকটে। মহাবীর খালিদ এখানেই তাঁর তাঁবু ফেললেন। এখান হতেই তিনি তাঁর গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। গুপ্তচর মাধ্যমে জানতে পারলেন সুহরাবিল বসরার নিকটে অবস্থান করছেন। বসরা আক্রমণ বা অধিকার কোনটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবার তিনি খালিদের আগমনবার্তা পেয়ে মহা উৎসাহে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। খালিদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত কম সংখ্যক সেনা নিয়ে বিরাট রোমান বাহিনীর বিপক্ষে বসরা আক্রমণের আশা করলেন কি করে। উত্তরে তিনি বলেন—এটি আবু উবায়দার নির্দেশ ছিল। উত্তরে খালিদা বলেন—"সততা, ধীরমতি ও বিচক্ষণতার জন্য আমি তাঁর প্রশংসা করলেও যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কম।"

বসরা অধিকার:

সেনাপতি আবু উবায়দা, ইকরামা, সুহরাবিল, আমর সকলেই জানতে পারলেন মহাবীর খালিদের অবস্থান। এবং সকলেই খালিদের নির্দেশের জন্য

যেন অপেক্ষা করতে থাকলেন। সকলের চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কখন কোন্ মহাক্ষণে মহাবীর খালিদ কোন পথে অগ্রসর হবেন। কয়েকজন সেনাপতি একত্রে যে কাজ সম্ভব করতে পারেন নি, সেই অসম্ভবকে আজ একাকী খালিদ সম্ভব করবেন—কোন্ মহামন্ত্র বলে কোন্ যাদু বলে। সকলেরই ঔৎসুক্যের কোন সীমা নেই। ইতিমধ্যেই খালিদ বসরা নগরীকে অবরোধ করলেন। তিনি কখনও প্রথম আক্রমণ করতেন না, প্রথম আত্মসমর্পণের সুযোগ দিতেন। এবারও তাই করলেন। বিরাট গ্রীক সেনাবাহিনী একত্রিত হল সেনাপতি রোমানাসের অধীনে। গ্রীকগণ আত্মসমর্পণ না করেই যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে দিল। তখন মহাবীর খালিদ তাঁর স্বভাবজাত বীরত্বেই বীরবিক্রমে রণভূমি কাঁপিয়ে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক সেনাপতি রোমানাসকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। সেনাপতি রোমানাস "দ্বিধায় জড়িতপদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে" সম্মতি জ্ঞাপন করে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সেনাপতি খালিদের সাথে কিছু আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পারলেন, এ এমনি একটি মহাশক্তি, যা মহাসত্যের নিকট হতেই আগত, এঁরা সত্য ব্যতীত মিথ্যা কাকে বলে জানে না, সরলতা ব্যতীত বাগাড়ম্বরকে বোঝেই না। এঁদের সাথে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। তিনি আপন শিবিরে ফিরে গিয়ে সকলকেই বাস্তবকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউই তাঁব কথায় কর্ণপাত না করে বরং তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে কাপুরুষ বলে প্রত্যাখ্যান করে। নিরুপায় রোমানাস তখন গভীর রাত্রে গোপন পথে মুসলিম শিবিরে এসে সেনাপতি খালিদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নিজেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে খালিদের সহকারীর মর্যাদালাভ করেন। তুমুল যুদ্ধ শেষে গ্রীকগণ রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন। বসরা অধিকৃত হল। খলিফার ধারণা সত্যে পরিণত হল। তিনি সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই খালিদকে অভিনন্দনবার্তা পাঠালেন।

দামেস্ক অবরোধ ও বিজয়:

এবার খালিদের লক্ষ্য দামেস্ক বিজয়। ইতিপূর্বে খলিফা দামেস্ক বিজয়ের জন্য সেনাপতি আবু উবায়দাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। অতঃপর খালিদের আগমন। খালিদের আবির্ভাবকে গ্রীক সম্রাট হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে আপন ভ্রাতা থিওডোরের অধীনে বিশাল ৭০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে আজনাদাইন অভিমুখে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে খালিদ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অবরোধ করেছেন। এবার মহাবীর খালিদ যুদ্ধের দাবা খেলাতে মহাসমস্যায় পড়লেন। যদি তিনি দামেস্ক অবরোধ করে বসে থাকেন, তাহলে থিওডোর যে কোন সময় অতর্কিতে পেছন দিক হতে আক্রমণ চালাতে পারে। আবার যদি দামেস্ক অবরোধ তুলে নেন, এবং আজনাদাইন অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহলে দামেস্কের

সৈন্যগণ দুর্গ হতে বের হওয়ার সুযোগ লাভ করে পশ্চাদ দিক হতে খালিদ বাহিনীকে আক্রমণ করবে। দু'দিকেই বিপদ, অথচ খালিদকে এই বিপদ অতিক্রম করতেই হবে।

মুসলিম মহিলা সেনাদল:

কিন্তু সর্ব বিপদের সমূহ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সেনাপতি খালিদকে আজ সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এইখানেই তাঁর মাহাত্ম্য, এখানেই তিনি অজেয় বীর, এখানেই 'সাইফুল্লাহ্'—আল্লাহর তরবারি। সকল দিকের অগ্র-পশ্চাদ চিন্তা করেই তিনি দামেস্ক অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদাইন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি মনের কোণে সজাগ থাকলেন গ্রীকগণ পশ্চাদ দিক হতে আক্রমণ চালাবে। খালিদের অশ্বারোহী দলের পেছনে ছিল আরব বীরঙ্গনাগণ। যাঁরা বুদ্ধিতে ছিলেন চরম বিদুষীবালা, রূপলাবণ্যে ছিলেন স্বর্গের হুর-পরী, বীরত্বে ছিলেন—বীরাঙ্গনা। এই আরবশ্রেষ্ঠ মহিলাগণকে সেনাপতি খালিদ সবসময় সেনাদলে সম্মানের আসন দান করতেন। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবিকারূপে থাকতেন। এবং প্রত্যেকেই ছিলেন—তরবারি, বর্শা ও তীর নিক্ষেপে সুদক্ষ সেনানী। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা সমানে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। আবার অস্ত্রশস্ত্র-রসদপত্রেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কখনো বা আহত আঘাতপ্রাপ্ত সেনার জন্য শিবিরে মা-বোন-স্ত্রীর স্থান পূরণ করতেন। কখনো বা তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসাহদানে সেনাবাহিনীর মনোবলকে শতগুণে বাড়িয়ে দিতেন। সুতরাং তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। আবু উবায়দা ছিলেন এই মহিলা সেনাদলের অধিনায়ক। অশ্বারোহী সেনাদল-সহ খালিদ যখন বহুদূর এগিয়ে গেছেন, তখন দামেস্কের মুক্তিপ্রাপ্ত অবরুদ্ধ দুর্গের গ্রীক সেনাদল পেছন দিক হতে এই মহিলা মুসলিম সেনাদলটিকে আক্রমণ করে। আবু উবায়দা সামান্য সংখ্যক মহিলাকে নিয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেন। এবং গ্রীক সেনাপতি পিটার বন্দিনী মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে দামেস্ক অভিমুখে রওনা হন।

"কোন কালে একা করেনিক জয়
পুরুষের তরবারি,
শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে
বিজয় লক্ষ্মী নারী" —নজরুল

এই দুঃসংবাদ সেনাপতি খালিদের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ দেরার, আব্দুর রহমান ও অন্যান্য বীর অশ্বারোহীদের নিয়ে মুসলিম বীরাঙ্গনাদের উদ্ধার কল্পে দামেস্ক মুখে দ্রুত রওনা হলেন। পথিমধ্যে অন্য এক দল গ্রীক সৈন্য তাঁদের বাধা দিলে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। জীবন-মরণ পণে মুসলিম বীরগণ যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধে গ্রীকদের পরিণতি এতই

শোচনীয় হল যে তাদের ছয় হাজার সেনার মধ্যে ছয় জনও প্রাণে রক্ষা পেল না। মাত্র দু'একজন কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে দামেস্ক দুর্গে তাদের করুণ পরিণতির সংবাদ দিল।

ইতিমধ্যে গ্রীক সেনাপতি পিটার দামেস্কের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে নিজেকে একেবারেই নিরাপদ মনে করে মুসলিম মহিলা সেনাদলকে নিয়ে একটি মনোরম স্থানে মনের আনন্দে বিশ্রাম নিতে থাকলেন। আরব-রমণীগণের মধ্যে খাওলা নাম্নী একজন পরমাসুন্দরী বীর রমণী দলের নেত্রী ছিলেন। তিনি সকলকেই তাঁর বীরত্বপূর্ণ বাণীতে-বক্তৃতাতে অনুপ্রাণিত করলেন। ঠিক হল কেউই বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে না। শহিদ হবে, শাহাদতকে বরণ করবে, তবুও তাঁরা লক্ষ্যচ্যুত হবেন না। তাঁরা যে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে বহুসংখ্যক লোহার দণ্ড ছিল। প্রত্যেকেই এক-একটি দণ্ড হাতে নিলেন এবং প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করলেন—তাঁদের সীমারেখার মধ্যে যে কেউ আসবে, তাদের মাথা চূর্ণ করা হবে। প্রথমবারেই সুন্দরী খাওলার হাতে একজন দুষ্ট প্রহরী প্রাণ হারাল।

খাওলার রূপ লাবণ্যে পিটার বন্দী :

প্রহরীর প্রাণনাশের কথা শোনামাত্র পিটার সেখানে দ্রুত আগমন করেন। মহিলা দলের নেত্রী খাওলার রূপলাবণ্য দেখে পিটার হতবাক। পিটারের মনের কোণে গোপন ইচ্ছা দানা বাঁধল, যেমন করেই হোক এই অপূর্ব সুন্দরীকে জয় করতে হবে। পিটার কখনো তরবারির ভয় দেখান, কখনো বা বীরের ন্যায় ভর্ৎসনা করেন, কখন বা প্রলোভন দেখান। কিন্তু কিছুতেই যখন কোন কাজ সিদ্ধ হল না, তখন পিটার সেনাবাহিনীকে ডাক দিলেন—সমূলে সব খতম করে দেওয়ার জন্য। সেনাবাহিনী যখন প্রস্তুত, পিটার পুনরায় খাওলাকে অনুরোধ করেন আত্মসমর্পনের জন্য। খাওলা কোরাআন থেকে উত্তর দিলেন—"আমরা মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছি, আবার মাটিতে মিশে যাব, উত্থান দিনে আল্লাহর নিকট ফিরে যাবো।" ২০:৫৫। "সুতরাং মুসলিম নর-নারী মৃত্যুকে ভয় করে না।" এবার পিটার মহাবিপদে পড়ল। একদিকে যদি তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেনাবাহিনী পিটারকে ক্ষমা করবেন না। অন্যদিকে, পিটার যদি তাঁদের হত্যার আদেশ দেন, তাহলে পিটারের জীবনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে খাওলার জন্য। পিটারের এই মহাসমস্যাই একদিন মুসলিম মহিলাবৃন্দকে মহাবিপদ হতে রক্ষা করল। আল্লাহ্ কখন কোন্ কৌশলে কাকে রক্ষা করেন, কাকে বধ করেন, তা কে জানে!

কোন কৌশলে কাহার দ্বারা
এই বিশ্ব করিছ পালন
মহা কুদরত্ তোমার লীলায়
ফেরাউন্ কোলে মূসার পালন।

ইতিমধ্যে পেছন হতে মুসলিম বাহিনী-সহ মহাবীর খালিদ তকবির ধ্বনি (আল্লাহু আক্‌বার্‌ ধ্বনি) দিতে দিতে পিটারের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। পিটারকে প্রথমেই বীর খালিদ মুসলিম মহিলাদের ফেরত দিয়ে আত্মসমর্পণের সুযোগ দান করেন। কিন্তু পিটার মুসলিম সেনাপতির কথায় গুরুত্ব বা কর্ণপাত না করায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। যুদ্ধের শুরুতেই খাওলার ভ্রাতা দেরার পিটারকেই আক্রমণ করেন। পিটার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূলুণ্ঠিত হল। দশ হাজার পদাতিক গ্রীক সৈন্যের ৭ হাজার সাক্ষাৎ মৃত্যু লাভ করে। বাকি তিন হাজার প্রাণভয়ে রণভূমি ত্যাগ করে। মহাবীর খালিদের অসীম বীরত্বে ও অসাধারণ রণনৈপুণ্যে মুসলিম মহিলাগণ মানসম্মান-সহ ঘরে ফিরলেন এবং দামেস্কের দুর্গের সেনাবাহিনীর পরাজয়ে সেনাপতি খালিদের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হল। সারা পৃথিবীর সমগ্র বীরের ইতিহাসে খালিদ বিন ওয়ালিদের কোন তুলনা সেদিনও ছিল না এবং আজও নেই। আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অজেয় বীর।

আজনাদাইনের যুদ্ধ :

রোমক সম্রাট হিরাক্লিরাস মহাবীর খালিদকে বাধা দেওয়ার জন্য আজনাদাইন নামক স্থানটিকে পছন্দ করে আপন ভ্রাতা থিওডোরার অধীনে ৭০ হাজার গ্রীক সৈন্যের সমাবেশ করলেন। এই স্থানটি ছিল দামেস্ক হতে জেরুজালেমের পথিপার্শ্বে রামলেহ্‌ ও বায়েৎ-জিবরিণ নামক দুটি স্থানের মাঝখানে। বহু চিন্তা-ভাবনা করেই রোমক সম্রাট স্থানটি নির্ণয় করেছিলেন। আবার সেনাবাহিনীকেও মনের মতো করে সাজিয়েও তুলেছিলেন। এককথায় কোথাও যেন কোন ত্রুটি রাখেন নি। এ ছিল এক অভিনব অভিযান আরবের বিরুদ্ধে।

মহাবীর খালিদ আজনাদাইনের নিকটবর্তী হলেন এবং অন্যান্য সেনাপতিগণও তাঁকে অনুসরণ করলেন আমর, ইয়াজিদ, দেরারের ও সোহ্‌রাবিল প্রমুখ। সেনাপতি খালিদ তাঁর চিরাচরিত যুদ্ধ নিয়মানুযায়ী দেরারকে গুপ্তচর রূপে নিযুক্ত করলেন। এই কাজে দেরার একাকী ৩০ জন গ্রীক সৈনিকের সম্মুখীন হয়ে একাই ১৭ জনকে হত্যা করে মহাবীরের খ্যাতি লাভ করেন। দেরার এই দুঃসাহসিক বীরত্ব ও অচিন্ত্যনীয় কৃতকার্যতা সমগ্র রোমান বাহিনীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এই দিক থেকে মুসলমানদের সংগ্রামের সূচনা ছিল শুভময়।

এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আরো দুটো ঘটনা ঘটল। গ্রীক সেনাপতি ওয়ার্দন একদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রেখে সেনাপতি খালিদের সাথে আপোস মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে আলোচনার জন্য খালিদকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেনাপতি খালিদ সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিলেন। গ্রীক সেনাপতি দুরভিসন্ধিমূলক চিন্তা নিয়ে আলোচনার স্থান নির্ধারণ করলেন—একটি

ঝোপের পাশে। এবং সময় নির্ধারিত হল—পরদিন সকালবেলা। গ্রীক সেনাপতি ওয়ার্দন গোপন ষড়যন্ত্রবশত রাত্রিকালে ১০ জন সশস্ত্র গ্রীক সেনাকে ঐ ঝোপে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন, এবং পরদিন সকালে তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাঁরা যেন ঝোপ হতে বের হয়েই সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি খালিদকে হত্যা করে। সমস্ত কথা ও কাজ পাকাপাকি হয়ে থাকল। গ্রীক সেনাপতি ওয়ার্দন মনের খুশিতে রাত্রি কাটালেন। এদিকে রণকুশল খালিদ চিন্তা করলেন স্থানটি কারো শিবিরে বা অন্য কোথাও না হয়ে ঝোপের পার্শ্বে হল কেন! তিনি সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এক গুপ্তচরকে ঐ ঝোপের পাশে নিযুক্ত করলেন। গুপ্তচর রাত্রিবেলায় খালিদকে ওয়ার্দনের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলে তিনি ১০ জন মুসলিম সেনাকে ঐ ঝোপে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম সেনারা গভীর রাতে ঝোপে গিয়ে লক্ষ্য করলেন গ্রীক সেনাগণ প্রচুর মদ পান করে মনের সুখে ঘুমাচ্ছে। তখন তাঁরা বিনা আয়াসে ঐ ১০ জনকে পলকের মধ্যে হত্যা করে তাদের পোশাকগুলো নিজেরাই পরলেন। পরদিন সকালে সেনাপতি ওয়ার্দন মনের আনন্দে সেনাপতি খালিদকে যেন সন্ধি নয় জীবনের বধ্যভূমিতে আমন্ত্রণ জানালেন আলোচনার জন্য। রণকুশল খালিদ হাজির হলেন। আলোচনা আরম্ভ হল। সেনাপতি ওয়ার্দন ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই ঐ ১০ জন মুসলিম বীর তাদেরই পোশাকে মূর্তিমান যমদূতের মতো ওয়ার্দনের সম্মুখে হাজির। সব আলোচনাই শেষ হয়ে গেল মহাবীর দেরারের ছ'ফুট তরবারির এক আঘাতের এক নিমিষেই। সেনাপতি ওয়ার্দনের ষড়যন্ত্রমূলক সমরের সাধ চিরসমাধিতে পরিণত হল।

আসল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তৃতীয় ঘটনাটি ছিল—একজন গ্রীক বৃদ্ধ দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে খালিদের শিবিরে হাজিব হন। গ্রীক দূতের প্রস্তাব—"আপনারা রোমানদের নিকট হতে সিরিয়া বিজয়কে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন বলে মনে করতে পারেন। আজ পর্যন্ত কেউই একাজ পারেনি। আপনারাও কখনও পারবেন না। বরং আজ পর্যন্ত যারা সিরিয়া জয় করতে এসেছে, তারা সমুচিত শিক্ষা পেয়েছে সম্মুখ সমরে, সিংহাসনের পরিবর্তে সমাধি তারাই লাভ করেছে। সুতরাং আপনিও এই দুরাশা ত্যাগ করেই সন্ধি স্থাপন করুন। যদি আপনারা যুদ্ধ না করে দেশে ফিরে যান, তাহলে আমরা আপনাদের প্রত্যেক সৈন্যকে একটি নতুন পোশাক ও পাগড়ী-সহ প্রত্যেককেই একশো' করে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হবে। আপনাকে দশটি পোশাক, দশটি পাগড়ি ও দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হবে। এবং আপনাদের খলিফাকে একশো' (১০০)টি পোশাক, একশটি (১০০) পাগড়ি ও এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।"

উত্তরে খালিদ বলেন—"আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি দুঃখিত। আপনারা

জেনে রাখুন, আমরা এমনি একটি জাতি, যারা লোভে ভুলে যায় না আপন কর্তব্য। আপনারা জানেন,—আমাদের মহানবীকে সারা আরবদেশ সম্রাট করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কোন লোভে পড়েই তাঁর কর্তব্য হতে একবিন্দুও সরে যাননি। তাঁর সরল উত্তর ছিল—

'দুই হাতে দাও যদি সূর্য আর চাঁদ,
আমার আদর্শ আমি নাহি দেব বাদ।'

আমরা ঐ নবীর উম্মত বা শিষ্য। সুতরাং আমার প্রস্তাব আপনি শুনুন। "কেবলমাত্র তিনটি—(১) কোরআন, (২) জিজিয়া (৩) তরবারি। আপনারা যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। আমরা আপনাদের সংখ্যাধিক্যকে ভয় করি না। আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করি, আল্লাহ্ই আমদের রক্ষক। আর আপনাদের ঐ ধনসম্পদ, লক্ষ্য করবেন—কিছুক্ষণের মধ্যে ওগুলোর মালিক আমরাই হবো।" দূত হতাশ মনে ফিরে গেল।

এবার প্রকৃত যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সেনাপতি খালিদ চির স্বভাবানুযায়ী কয়েকবার তকবির ধ্বনি দিলেন। বাকি সেনারা তার অনুসরণ করলেন। সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণে খালিদ সৈনিকদের মনোবলকে মজবুত করে দিলেন। কেবলমাত্র বললেন—"তোমরা শুধু আল্লাহ্র নামে যুদ্ধ করবে। যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ ঠেকাতে পার, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। কেননা মহানবী সকল যুদ্ধেই সন্ধ্যার প্রাক্কালেই জয়লাভ করতেন।"

গ্রীক সেনাপতি থিওডোর একটি সুন্দর শ্বেত অশ্বের ওপর চড়ে সৈনিকদের সম্মুখে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরমেনিয়ান তীরন্দাজদের হুকুম দিলেন—'আক্রমণ কর।' কালবিলম্ব না করেই তারা শ্রাবণের বারিধারার মতো তীর নিক্ষেপ শুরু করল। মুসলিম সেনারা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করতে থাকলেন। সেনাপতি খালিদের নির্দেশবশত কোন সেনাই আক্রমণের ভূমিকা নিলেন না। সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তখন শত্রুকুল রণ-ক্লান্ত। ঠিক এই মুহূর্তে মহাবীর খালিদ তাঁর বিশেষ (Reserved) সেনাবাহিনী নিয়ে ব্যাঘ্রবিক্রমে রণভূমি কাঁপিয়ে তুললেন। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই গ্রীক সৈনিকগণ রণে ভঙ্গ দিল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। গ্রীকদের সমরসাধ মিটে গেল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হতে বিজয়ের দামামা বেজে উঠল। এই রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র ৪৪৭ জন শহিদ হন। এবং গ্রীক সেনাগণের ৫০,০০০ উর্ধ্বে নিহত হয়। সেনাপতি থিওডোর সম্রাটকে মুখ দেখাতে না পেরে কনস্টান্টিনোপলে পলায়ন করেন।

বিজয়বার্তা :

এবার সেনাপতি খালিদ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বিজয়বার্তা খলিফার নিকট পাঠালেন : "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্র নামে, আমরা পরম দয়ালু আল্লাহ্র গুণগান

করছি। যিনি লা-শরীক। যিনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। অতঃপর আমরা আল্লাহর মহানবীর প্রশংসা করি। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ তিনি আমাদের অভাবিত বিজয় গৌরব দান করেছেন। আপনাকে আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমরা আজনাদাইন যুদ্ধে বিশাল রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছি। গ্রীক সেনাপতি থিওডোর যীশুর নামে এক বিশাল বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। আমরাও আল্লাহর নামেই প্রাণপণে যুদ্ধ করে ঐ বিশাল বাহিনীর ওপর জয়লাভ করি। আমাদের মধ্যে ৪৪৭ জন শহিদ হয়েছেন, এবং রোমানদের কম করেও ৫০ হাজারের বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। ৩০ জামাদিয়াল আওয়াল এই পত্র লিখলাম। আমরা আমাদের অপরাপর বিজয়ের জন্য আপনার দোয়া প্রার্থনা করি। আপনার ওপর ও অন্যান্য সকল মুমীনদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামান্তে—

আরজ ইতি।

যুদ্ধের ফলাফল :

ইসলামের ইতিহাসে আজনাদাইন যুদ্ধের ফলাফল ছিল অপরিসীম। এই যুদ্ধের ফল বিশ্বশক্তি রোমানদের ভিত্তিভূমিকে একেবারেই টলিয়ে দিয়েছিল। এই যুদ্ধ ভবিষ্যতের রোমান বাহিনীকেও মারাত্মক ভাবেই আঘাত করেছিল। কেননা রোমানদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অসংখ্য সেনাবাহিনী, প্রচুর অস্ত্র ও প্রভূত রশদ থাকলেই যে কোন যুদ্ধেই জয়লাভ করা যায়। কিন্তু আজনাদাইনের যুদ্ধের ফলাফল তাদের এই বিশ্বাসজনিত অহঙ্কার গর্ব ও আত্মশ্লাঘার মূলে কুঠারাঘাত করল। রোমানদের এই শোচনীয় পরাজয় রোমানবাসীদের মনোবলকে একেবারেই কাঁচের ঘরের মতো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। তারা যেন ভবিষ্যতের জন্যও কোন মতেই অঙ্কে মেলাতে পারল না—ক্ষুদ্র আরব বাহিনীকে কিভাবে ঠেকাতে হবে, কিভাবে চরম শিক্ষা দিতে হবে। চরম হতাশা ও একেবারেই নিরাশা তাদেরকে যেন শীত বস্ত্রের ন্যায় জড়িয়ে ধরল। তাই আমরা লক্ষ্য করি ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধেই তারা যেন এই শীত বস্ত্রকে আর দূরে সরাতে পারল না। তাদের হৃদয় ভূমিতে যে ভূকম্পন উঠল, সে হৃদকম্পন আর কোনদিনই থামল না।

অন্যদিকে, ঠিক এর বিপরীত ছবি মুসলিম শিবিরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নতুন-আশা, নতুন চেতনা, নতুন মনোবল যেন রচনা করল তাদের চোখের সামনে এক সুবিশাল স্বপ্ন-সাম্রাজ্য। মনে হল আগামী দিনের পৃথিবী যেন আর তাঁদের হতে বেশি দূরে নেই। তারা যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মনে হল পৃথিবী যেন তা অপেক্ষাও বহু দ্রুতগতিতে তাঁদের দিকে ধাবমান হচ্ছিল। এ যেন সূফী সাহিত্যের ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমিক ও প্রেমিকার

মহা-মিলনের মহা অভিযান। ইসলামের শান্তি-পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকল, আর রৌদ্র দগ্ধ দুনিয়া যেন তার স্নিগ্ধছায়া তলে আসতে ও আশ্রয় পেতে ব্যস্ত ও ব্যাকুল। মরু অঞ্চলের বেদুঈন জাতি তাঁদের দুর্বার গতিতে যে দিকেই চলতে থাকলেন, দেখতে পেলেন কোথাও শস্য-শ্যামলা উর্বর অঞ্চল, কোথাও রাশি রাশি ধনরত্নের সঞ্চিত দুর্গ। কোথাও ভুবন-ভুলান মনোরম রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি আরব বেদুঈনকে করল ঘরছাড়া পথিক। একদিন মরু বেদুঈন কেবল মরু অঞ্চলেই ঘুরে বেড়াতেন। আজ তাঁদের অঞ্চল সীমানা সারা বিশ্ব সারা দুনিয়া। তাই আজনাদাইনের যুদ্ধ ছিল রোমানদের ভাগ্য নির্ধারণের যুদ্ধ, এবং আরবদের বিশ্ববিজয়ের শুভ সূচনা শুভ সংকেত।

দীন ও দুনিয়া-সহ শিখাল কোরআন
কিভাবে লভিব মোরা বিশ্বের সম্মান।
ইসলামের জয়যাত্রা রাজ্য খেলাফত—
একবার ঘুরে দেখ অতীত-জগৎ।
এশিয়া আফ্রিকা হতে ইউরোপ বিজয়
ইসলামের অদ্বিতীয় কৃতী সুনিশ্চয়।
আজিও আশ্চর্যভাবে জগৎ-জনে
নিঃস্ব আরব ইহা করিল কেমনে।
এরাজ্য গড়েনি কোন ছলে-বলে-কলে
ইসলাম গড়িল তার ঈমানের বলে।
সুদূর রাজ্যের সীমা রাজসিংহাসন
মাথাতে মুকুটমণি জগৎ-ভূষণ।
অসীম অযুতধন বিশ্বের সম্মান
অলঙ্কৃত করিয়াছে আরব জাহান। কোরআন—৩:২৬, ২৭।

দামেস্ক বিজয়

বিখ্যাত আজনাদাইন যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যই ছিল দামেস্ক। রোমানগণের পরাজিত সৈন্যবাহিনী যখন দলে দলে দামেস্কের দিকে ধাবমান, তখন দামেস্ক নগরীর জনগণ অতি সহজেই বুঝতে পারলেন—অতি সত্বর তাদের ভাগ্যাকাশে কি ঘটতে চলল। তারা কোনদিনই চিন্তাও করতে পারে নি যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী, অসভ্য, অতি ক্ষুদ্র আরব বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করবে।

একদিন মহাবীর খালিদ কাজের সুবিধার জন্য এই দামেস্ক নগরীর অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। আজ আবার বীরবর আমরকে নির্দেশ দিলেন দামেস্ক-দুর্গ অবরোধ করার জন্য, নয় হাজার সৈন্যসহ সেনাদলের পুরভাগে থাকার জন্য।

স্বয়ং নিজে থাকলেন পশ্চাদভাগে, কেননা পেছন দিকে ছিল বিপদের সম্ভাবনা। মহাবীর দেরারকে শহরের চারিদিকে প্রহরার ভার দেওয়া হল। তিনি দিবারাত্রি কয়েক হাজার সৈন্য-সহ রচনা করলেন এক মহাবেষ্টনী। দুর্গের সাতটি ফটক ছিল। প্রতিটি ফটকে এক-একজন সেনাপতিকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করা হল। রণকুশল সেনাপতি খালিদ প্রথমেই নগরকে আক্রমণ বা আধমরা করা বাঞ্ছনীয় মনে না করে দুর্গের পতনই প্রথম কামনা করলেন। কেননা দুর্গেই ছিল তামাম সেনাবাহিনী। ঠিক অনুরূপভাবে স্বয়ং মহানবী নিজে একদিন খাইবারের সাতটি দুর্গের মধ্যে প্রথম সৈনিকদের দুর্গ নাতাত আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন। মহাবীর খালিদ আজ এখানে ঠিক সেই পথই অনুসরণ করলেন। এতে দুটো ফল ফলল। একদিকে সৈনিকগণের মনোবলও ভাঙতে থাকল, অন্যদিকে শহরে খাবারের অভাব দেখা দিল।

কিছুদিনের মধ্যে শহরবাসীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের জামাতা টমাস নামক একজন সাহসী গ্রীক সেনাপতি মুসলমানদের আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। একদিন রাত্রিকালে শহরের সদর দরজায় বিরাট এক আগুনের উৎসব পালন করে বড় বড় ক্রুশ চিহ্নিত নিশান উড়িয়ে বিশপ ও পাদ্রিগণের এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করলেন, এবং গ্রীক সেনাদের উৎসাহিত করতে থাকলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র যীশু তোমাদের সাহায্যের জন্য তোমাদের পাশে ও সম্মুখে সদাই হাজির। যিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু মুসলমানগণ ভাবলেন ঈশ্বরের কোন পুত্রই নাই, ফাঁকা বুলি।

পরদিন সকালে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে মুসলিম বীরাঙ্গনাগণও যোগ দিয়েছিলেন। আবান নামক একজন বিখ্যাত মুসলিম সেনা যুদ্ধে ভীষণ-ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁর স্ত্রী তাকে সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে এনে তাঁব সেবা শুশ্রূষা করেন। আবানের মৃত্যুকালে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী তাঁকে বলেন, হেপ্রিযতম, তুমি যাও সেই আল্লাহর নিকট, যিনি আমাদের মিলন ঘটিযেছিলেন। আমি সত্বর তোমার সাথেই মিলিত হবো। জীবিতকালে আমি দুটো জিনিস করবই—একটি তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই, এবং জীবনে আমার দেহ আব কোন দ্বিতীয় জন স্পর্শ করবে না। আবানের বিধবা বীব স্ত্রী স্বামীর অস্ত্র-শস্ত্রেই সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। প্রথম তীরেই গ্রীক নিশানধারীকে ভূপতিত করেন, এবং দ্বিতীয় তীরে স্বামীহত্যাকারী টমাসকে যমের হাতে তুলে দিলেন। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। যুদ্ধ আপাত থামল।

রাত্রি সমাগত, সকলেই বিশ্রামে গেলেন। হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে বিপদেব ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল। প্রথমেই উঠলেন সেনাপতি মহাবীর খালিদ। রণকুশল বীরের আর বুঝতে বাকি থাকল না, এটা গ্রীক সেনাপতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি অতর্কিতে তাঁর সেনাদলকে ঘুমন্ত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার

নির্দেশ দিয়ে জগৎ-যুদ্ধের ইতিহাসে নিজ নামকে চিরদিনের জন্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রূপে অঙ্কিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বিপদের এই মহাক্ষণে, মহাবীর খালিদ তাঁর চির অভ্যাসমতো পবিত্র কোরআনের বিশেষ কয়েকটি স্থান বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করে সমস্ত সেনাবাহিনীকে যেন এক-একটি সিংহের শক্তি দান করলেন। "আল্লাহ্ চির জীবিত ও চির বিরাজমান।" ২:২৫৫, "তোমরা অত্যাচার করো না, অত্যাচার সহ্যও করো না।"২:২৭৯। "তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি। ২০:৪৬। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম সেনাবাহিনী রোমানদের এমনভাবে আক্রমণ করলেন, যা তারা কোনদিনই চিন্তাও করতে পারেনি। বহু গ্রীক সৈন্য প্রাণ হারাল, বাকিরা প্রাণভয়ে দুর্গে আবার আশ্রয় নিল।

দুর্গ আবার অবরুদ্ধ হল। সত্তর দিন অবরোধ চলার পর দুর্গে খাদ্যাভাব দেখা দিল। সেনাবাহিনী আপন আপন মনোবল হারিয়ে ফেলল। ওদিকে দামেস্ক নগরী আত্মসমর্পণ করল। সেনাপতি খালিদকে গ্রীকগণ সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করতেন। তাঁরা পরামর্শ করলেন নরম মেজাজ আবু উবায়দার সাথে সাক্ষাৎ করতে। একদিন গভীর রাত্রে একশো জন পুরোহিত প্রতিনিধি সেনাপতি আবু উবায়দার সাথে সাক্ষাৎ করে সন্ধির প্রস্তাব দেন।

আবু উবায়দা তাঁদের মিনতিসহ প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন। এবং নিম্নলিখিত শর্তে একটি সন্ধিপত্র রচিত হল:

(১) সমস্ত বিবাদের অবসান হল।

(২) যারা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতে চায়, তাদেরকে মুসলমানগণ বাধা দেবেন না। তারা তাদের সম্পত্তিও সঙ্গে নিয়ে যেতে পাববে।

(৩) যারা খলিফার অধীনে জিজিয়া কর দিয়ে থাকবে, তারা নিরাপদে থাকবে। তাদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। নগরের সমস্ত গির্জাই তাদের অধিকারে থাকবে।

এই সন্ধিপত্রের কথা সেনাপতি খালিদ যখন জানতে পারলেন, তিনি বেশ কিছুটা রাগান্বিত হলেন আবু উবায়দার ওপর। খালিদ বললেন—"যা হবার সবই হয়ে গেছে, শক্তি থাকতে সন্ধি চলে, কিন্তু শক্তিহীন হলে আর সন্ধি চলেনা, তখন হবে আত্মসমর্পণ। এখন কার সাথে সন্ধি করবো, এখানে আর তো কোন শত্রু দেখছি না। আমি বিজয়ী, তারা বিজিত। আপনি অন্যায় করেছেন আমাকে না জানিয়ে এইরূপ একটি সন্ধি করে। কিন্তু এখন যদি আমি এই সন্ধিকে বাতিল করে দিই, তাহলে দেশে প্রচার হবে মুসলমানরা সন্ধি মানে না। অথচ কোরআনের কথা—"সন্ধি কল্যাণকর"। ৪:১২৮, ৭:৮৯। সুতরাং নানা দিক বিবেচনা করেই আমি আপনার এই সন্ধিকে মেনে নিলাম।"

সন্ধির শর্তানুযায়ী অনেকেই দেশত্যাগ করলেন, এবং অনেকেই থেকে গেলেন। যাঁরা দেশত্যাগ করলেন, তাঁদের মধ্যে হিরাক্লিয়াসের কন্যা, টমাসের বিধবা পত্নীও ছিলেন। তাঁদেরকে তিনদিন সময় দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

গ্রীক বীর জোনাস ও পরমা সুন্দরী ইউডোসিয়া:

এঁরা দু'জনেই প্রেমিক ও প্রেমিকা ছিলেন। বিবাহ হওয়ার পথে। হেন-কালে যুদ্ধ বেধে যায়। বীর জোনাস ইসলামের নানাবিধ গুণে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রেমিকা ইউডোসিয়া আপন ধর্মে থেকে যান। জোনাস তাঁর প্রেমিকাকে অনুরোধ করলেন—তিনি যেন তাঁরই মতো ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু প্রেমিকা উত্তর দিলেন—তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করা তো দূরের কথা, জিজিয়া কর দিয়ে এ দেশেও থাকবে না। এইভাবে দেখা গেল দু'জন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজনের ইসলাম প্রীতির নিকট ব্যক্তিপ্রেম পরাজিত হল, এবং অন্যজনের আপন ধর্মপ্রীতির নিকট ব্যক্তি প্রেমও পরাজিত হল। প্রেমিক পরবর্তীকালে প্রেমিকাকে জোর করে পেতে গেলে প্রেমিকা আত্মহত্যা করেন। পরে জোনাসও একটি যুদ্ধে শহিদের মর্যাদা লাভ করেন।

অন্যান্য বিজয়:

অতঃপর অন্যান্য বিজয়ের জন্য মহাবীর খালিদকে আর কোন যুদ্ধ করতে হয়নি বললেই চলে। পাকা আম পড়ার মতো এক একটি স্থান মুসলমানদের হস্তগত হল। যেমন—বালা, বাক্ক, হামাহ্ প্রভৃতি অঞ্চল। এমনকি শজারের অধিবাসীবৃন্দ মহানন্দে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে খালিদকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। আবার সম্রাট হিরাক্লিয়াস শেষবারের মতো আরবদের সাথে একটিবার শক্তি পরীক্ষার জন্য বহু স্থান হতে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে সুদক্ষ সেনাপতি ম্যানুয়েলের ওপর ভার দিলেন আরবদের চিরশান্ত করার জন্য। অতঃপর বিপুল বাহিনী ইয়ারমুকের দিকে যাত্রা করল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ:

ইয়ারমুক শব্দটির মূলে ছিল ইয়ারোমেক্স (Hiremax)। পরে অপভ্রংশ ইয়ারমুক। এটি একটি ছোট নদীর নাম। এর উৎপত্তিস্থল হুরান পর্বতমালা। পরে জর্ডন নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রটি ইয়ারমুক হতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ওয়াকুসা সামক স্থানে ছিল। তবুও এটি ইয়ারমুকের

যুদ্ধ নামে পরিচিত। স্থানটি তিনদিকে পর্বতবেষ্টিত, ওপরে ইয়ারমুক নদী প্রবাহিত। দামেস্ক হতে সিরিয়াগামী রাজপথ এই নদীর ওপর দিয়ে। রোমক সেনাবাহিনী এই পথ দিয়েই এই স্থানটিতে এসে পৌঁছাল। রণকুশল বীর খালেদ বুঝতে পারলেন—রোমকগণ আপনাদের ভুলবশত এমন একটি স্থান পছন্দ করেছে, যার তিনদিক পর্বতবেষ্টিত ও সামনে নদী। এ যেন একসাথে বহু শিকার শিকারীর বেড়াজালে বিধৃত। সেনাপতি আমর তো উল্লাসভরে বলেই ফেললেন—"শত্রুরা বেড়াজালে বদ্ধ, বাঁচার পথ যেন অবরুদ্ধ।" সেনাপতির নির্দেশক্রমে মুসলিম সেনাবাহিনী নদী পার হয়ে নদীতীরেই তাঁদের শিবির স্থাপন করলেন।

রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল—২৪০,০০০ হাজার, যার মধ্যে খ্রীস্টান আরব বেদুঈন ছিল ৬০-৪০ হাজারের মতো। কিন্তু মুসলিম সেনার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫,০০০/৪০,০০০ হাজার। মুখোমুখি অবস্থায় দু'মাস অতিবাহিত হল। অতঃপর বীরবর খালিদ ৬,০০০ হাজার সেনা-সহ তাঁদের সাথে যোগদান করলেন। এরপরও একমাস কেটে গেল। রণকুশল খালিদ সময় কাটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা বিশাল বাহিনীকে নিয়ে বেশিদিন তাদেব মনোবলকে অটুট রাখা যায় না। অধিকন্তু রসদেরও অভাব পড়ে। অনেক সময় মহামারীও দেখা দেয়। এরূপ নানা বিপদ থেকে যায়। প্রকারান্তে রোমান বাহিনীতে এসবেরই সূচনা আরম্ভ হয়েছিল। সেইজন্য রোমক সেনাপতি আর কালক্ষেপ করা ভাল হবে না বিবেচনা করেই যুদ্ধের জন্য আশু প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। রোমান বাহিনী একত্রিত হয়ে উঠল। তখন খালিদ একটি পরামর্শসভা ডাকলেন। এবং প্রস্তাব দিলেন, "রোমানদের সৈন্যসংখ্যার নিকট আমাদেব সৈন্যসংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং আমাদের উচিত হবে সকল সৈন্যকে একত্রিত করা, এবং একজনকেই তার দায়িত্ব দেওয়া, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহলে আমিই প্রথম দিনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।" সকলেই একবাক্যে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এবার রণকুশল খালিদ তাঁর অভিনব চিন্তাধারায় সমগ্র সেনাবাহিনীকে ৪০টি ভাগে বিভক্ত করে এক একজন বিশিষ্ট সেনাকে তার অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এতে অতি অল্প সংখ্যক সেনাবাহিনীকে অনেক বেশি সংখ্যক বলে মনে হচ্ছিল। সেনাপতি আরব বীরাঙ্গনাদের সেনাবাহিনীর পশ্চাতে রাখলেন। তাঁরা তীর-ধনুক ও বর্শা যোগে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। এই দলে ছিলেন বিখ্যাত রমণী দেরারের ভগিনী খাওলা ও আবু সুফিয়ানের কন্যা জয়ায়েরা প্রমুখ মহিয়ষী মহিলাবৃন্দ। সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে ছিলেন—সোহরাবিল ও আমর, বামদিকে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, মধ্যভাগে আবু উবায়দা ও ইকরামা। একটি দলের অধিনায়কের সম্মান লাভ করেছিলেন সেনাপতি খালিদের ১৮ বছরের পুত্র বীর আব্দুর রহমান।

এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কোরআনের জগদ্বিখ্যাত ক্বারী মিকদাদ ও আবু দরদ এবং বৃদ্ধ আবু সুফিয়ানও। আবু সুফিয়ান খুবই সুললিত কণ্ঠে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করতে পারতেন। জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনিও সেই শক্তি প্রয়োগ করেন এই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি বলেছিলেন—"হে আল্লাহ্, আজকের এই দিনটিকে তুমি আমার জাতির ইতিহাসে গৌরবজনকভাবে চির সম্মান দান কর, অবিস্মরণীয় কর, মহানবীর লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের আজ সাহায্য কর।"

ইয়ারমুকের যুদ্ধের গোপন মাহাত্ম্য :

রোমানদের পক্ষে ছিল ২,৪০,০০০ (দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার) সৈন্য এবং খলিফার পক্ষে ছিল মাত্র ২৫,০০০ (পঁচিশ) হাজার। অনেকেই মদিনার মাটিতে খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এত কমসংখ্যক সৈন্য দ্বারা রোমানদের ঐ বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করা যাবে কি! খলিফা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—"আমি জানি আমাদের সৈন্যসংখ্যা কিছু বেশিই আছে।" সকলেই হতবাক হলেন, খলিফা একথা কেন বলছেন। দু'-একজন উৎসুক মানুষ সাহসে ভর করেই খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দয়া করে অবুঝদের বুঝিয়ে দিতে। বিজ্ঞ ইমানদার খলিফা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়ে দিলে সকলেই হতবাক। খলিফা বললেন—"রোমানরা ২,৪০,০০০ বেশ তো, আর আমরা ২৫,০০০ অর্থাৎ ২৫,০০০ মোমিন ২,৫০,০০০ কাফেরের মোকাবিলা করবে"। সকলেই বললেন—"সুবহান আল্লাহ্। আল্লাহ্কে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের এমন একজন খলিফা দিয়েছেন, যাঁর ঈমানের বল, পৃথিবীর আলো ও বাতাসকেও হার মানিয়ে দেয়।" খলিফা বললেন—"ঐ প্রাঙ্গণে আছেন—আল্লাহ্র নবীর পূত-পবিত্র ১,০০০ (এক) হাজার সাহাবী, যাঁদের মধ্যে আছেন—বদর যুদ্ধেরই একশো বীর সেনা সাহাবী, যাঁদের সাহস মনোবল ঈমানকে কোন পাহাড়ই টলাতে পারে না। ঐ প্রাঙ্গণ আজ ধন্য পবিত্র কোরআনের পূণ্যাত্মা ক্বারীগণকে বুকে ধারণ করে। যাঁদের সুললিত ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সকলকেই দেবে যুদ্ধে অমিতশক্তি, অফুরন্ত সাহস, অপরিসীম সংযমতা-সততা।

যে তিন পল্লবে ফুটে জীবন বারতা
সততা, সাধনা আর ধ্যান সংযমতা।

খলিফা আবার বললেন, তোমরা কি জান, রোমানদের ওগুলো সৈনিক নয়, সৈনিকের সংখ্যা মাত্র। ওগুলোকে আনা হয়েছে বা সংগ্রহ করা হয়েছে জেলখানা হতে। যারা চোর, ডাকাত, লম্পট, ব্যভিচারী, খুনী, প্রতারক, ঠক, এককথায় নানা দোষে দুষ্ট কাপুরুষের দল। যাদের জানোয়ারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রেও পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হয়। জেনে রেখো, এরা

রোমানদের সৈন্য বৃদ্ধি করেনি, সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমার সৈনিকগণ কোন সংখ্যার সাথে যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে সৈনিকের সাথে। আমার যুদ্ধক্ষেত্রে আছে শত শত মুসলিম বীরাঙ্গনা। যারা পৃথিবীর কোন কিছুতেই টলে বা ঢলে যায় না, বরং সকল কিছুকেই টলিয়ে দেয়। সবের শেষে আমার যুদ্ধক্ষেত্রে আছে 'আল্লাহ্‌র তরবারি'। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। সুতরাং তাঁর তরবারি মহাবীর খালিদ সেখানে, যাঁকে স্বয়ং মহানবী 'আল্লাহ্‌র তরবারি' উপাধিই দিয়েছিলেন, জেনে রেখো সেই তরবারি চিরজয়ী।"

যুদ্ধ আরম্ভ :

দুদিক হতেই ভীষণ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। বিপুল বেগে যুদ্ধ চলছে। হেনকালে যুদ্ধরত অবস্থায় দুটো ঘটনা ঘটে গেল। মদিনা হতে একটি দূত এসে পৌঁছলেন। সকলেই ব্যস্ততার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর ভাল তো? দূত বলেন—সবই মঙ্গল। মদিনা হতে আরো সেনা আসছে। অতঃপর খালিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে কানে কানে কিছু বললেন। এবং খলিফার একটি পত্র তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন। খালিদ এক নজর পত্রটিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই তূণের মধ্যে রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে রোমান সেনাপতি থিওডোরের পুত্র জর্জ যুদ্ধের সম্মুখভাগে এসে জিজ্ঞাসা করেন, সেনাপতি খালিদ কোথায়, অনতিবিলম্বে খালিদ তাঁর সাথে মিলিত হলেন। এবার জজ খালিদকে বললেন, 'আমাকে সত্য কথা বলুন'। উত্তরে খালিদ বললেন—'মোমিন কোনদিন মিথ্যা বলে না'। এবার জর্জ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের মহানবী আল্লাহ্‌র নিকট হতে কোন তরবারি পেয়েছিলেন কিনা! সেই তরবারি আপনাকে দিয়াছেন কিনা। যার বলে আপনি সমস্ত যুদ্ধই অবহেলায় ধরেও অবলীলাক্রমে জয়লাভ করেন।" খালিদের সহজ উত্তর—'না'। তখন জর্জ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"তবে আপনাকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' বলা হয় কেন! উত্তরে খালিদ বলেন—"জীবনে বহুবার আমি মহানবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। পরিশেষে নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরে মহানবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং ইসলামে দীক্ষিত হই। এবং পরবর্তীকালে বহু যুদ্ধে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করে জয়লাভ করি। তখন মহানবী খুশি হয়েই আমাকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' উপাধি দান করেন।" তখন জর্জ বলেন, আপনি সত্যকথা বলেছেন। এবার আমাকে বলুন ইসলাম কি! তখন সেনাপতি খালিদ তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন—"ইসলাম সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনব্যবস্থা। শান্তি-সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব তার মূল কথা।" জর্জ অতীব মুগ্ধ হয়ে খালিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই কথা রোমান শিবিরে প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোমানগণ তেলে-বেগুনে

জ্বলে উঠল। তারা মনের সমস্ত ক্ষোভকে একত্রিত করল সমরে। তখন জর্জ, খালিদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তুমুল যুদ্ধে রত। মহাবীর খালিদের চিরাচরিত নিয়ম ছিল, যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি জোর দিতেন। অপরাহ্নের পর সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল না। অসীম বীরত্বে খালিদ রণভূমি কাঁপিয়ে তুললেন। সংখ্যাতীত রোমান সৈন্য মৃত্যুর দুয়ারে হাজির। সন্ধ্যা নামার পূর্বেই রোমান বাহিনীতে নামল চরম বিপর্যয়। সেনাবাহিনী মনোবল একেবারেই হারিয়ে ফেলে যে যেদিকে পারল পালাতে থাকল, সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পালাবারও পথ নেই। তিনদিকে পাহাড়, সম্মুখভাগে নদীগর্ভে। কম করে এক লক্ষ সৈন্য নদী গর্ভেই ঝাঁপ দিল। এবং এক লক্ষ নিহত হল সমরে।

অতঃপর সেনাপতি খালিদ রোমান শিবির আক্রমণ ও অধিকাব করলেন। সেনাপতি থিওডোর বন্দী হলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সেনাপতি খালিদ ইঙ্গিতেই মাগরিবের (সান্ধ্য) নামায সমাধা করেন। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। সকলেই আপন আপন শিবিরে গেলেন। পরদিন সকালে খালিদ আহত বীর ইকরামা ও তাঁর পুত্র আমরকে আপন শিবিরে আনেন। শোকসন্তপ্ত হৃদযে খালিদ অশ্রুসজল নয়নে পিতা ও পুত্রের মাথা আপন কোলে রেখে মুখ মুছিয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা শাহাদতের গৌরব লাভ করেন। এই যুদ্ধে বীরবর ইকরামা যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন, তা ইসলামের ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না। পরদিন সকালে ইয়ারমুক অঞ্চলে সূর্য উদিত হল ইসলামের বিজয় পতাকাকে অভিনন্দন জানিয়ে। ইয়ারমুকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল—ইসলামের—শান্তি-সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অমর বাণী। ইয়ারমুক রোমানদের ভাগ্য নির্ণয়ের চরম পরিণতি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে দিল।

অধিনায়ক যুবরাজ জাবালা ও ক্রীতদাস :

যুবরাজ জাবালা ইবনে আল আইহাম বিশাল রোমক সাম্রাজ্যেব আবব খ্রীস্টান বেদুঈনদের প্রতাপশালী অধিনায়ক। মহানবী তাঁর জীবিতকালে এই জাবালা ও রোমক সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এতে দু'জনেই ক্রুদ্ধভরে উত্তর দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রোমক সম্রাট কাঁটা দিযে কাঁটা তোলার জন্য জাবালাকে এই যুদ্ধে আহ্বান জানান। জাবালা রোমকদের পক্ষেই যোগদান করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেনাপতি আবু উবাইদার নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজ অতীত কাজের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তখন খলিফা আবু-বকরের মৃত্যুতে হযরত ওমর খেলাফতে খলিফার আসনে সমাসীন আছেন। খলিফা তাঁকে সাদরে বরণ করে মক্কায় হজ করতে নিয়ে গেলেন। জাবালা রাজকীয়

পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে হজে যোগদান করেন। হজের সময় জনতার চাপে এক কাফ্রী ক্রীতদাসের পা যুবরাজ জাবালার পোশাকে পড়ে যায়। জাবালা ক্রুদ্ধভরে তাঁকে এক চড় মারেন। তখন অসহায় ক্রীতদাস খলিফার নিকট নালিশ জানালে খলিফা জাবালাকে ডেকে বলেন, "আপনি এই ক্রীতদাসকে আপনার গালে একটি চড় মারতে দেন, অথবা তার ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দেন।" তখন জাবালা আবার ক্রোধভরে বললেন—"একি! আমি যুবরাজ, আর সে একজন ক্রীতদাস। আমার গালে সে চড় মারবে? আমার দেশ হলে তার প্রাণদণ্ড হতো।" তখন খলিফা বললেন, "ইসলামের আইনে সব মানুষই সমান। ইসলাম ধর্মেও সব মানুষই সমান, মসজিদে সবার সমান অধিকার, সেখানে যুবরাজ ও ক্রীতদাস নেই। সেখানে সবাই মুসুল্লী অর্থাৎ নামাযি। ইসলামে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই।" তখন যুববাজ বলেন, তাই যদি হয়, তাহলে আমি এই ধর্ম চাই না। যে সব মানুষকে এক ও একাকার করে দেয়।" অতঃপর যুবরাজ জরিমানা দিয়ে পূর্ব খ্রীস্টধর্মে ফিরে গেলেন। পরবর্তীকালে জাবালা আপন ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন।

যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ :

এই যুদ্ধে রোমানদের ছিল—২,৪০,০০০ সৈন্য। মুসলমানদের ছিল মাত্র ২৫,০০০ হাজার তবুও রোমান বাহিনী কেন পরাজয় বরণ করল। মুসলমানদের শহিদের সংখ্যা ছিল ৩০০০ এবং রোমানদের মৃতের সংখ্যা ছিল—২,০০,০০০।

(১) রোমান সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল—জেলের অসৎ আসামী কয়েদী। যুদ্ধক্ষেত্র হতে যাতে তারা পলায়ন করতে না পারে, তার জন্য তাদের পায়ে শিকল পরানো ছিল। এইরূপ একটি বাহিনীকে নিয়ে কোনদিন কেউই জয়লাভ করতে পারে না। যারা মনেপ্রাণে কামনাও করছিল রোমান শাসনের অবসান।

(২) অন্যান্য রোমান খ্রীস্টান সেনাদের মধ্যে ধর্মের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। রোমান সম্রাট এক দলকে অন্য দলের ওপর অতিরিক্ত প্রধান্য দেওয়ায় বাকিরা অত্যন্ত বিরক্ত ও বিরাগভাজন ছিল রোমক শাসকদের প্রতি। যারা মনেপ্রাণে তাদের অবসান কামনা করছিল।

(৩) সবের ঊর্ধ্বে রোমক সম্রাটগণ সমাজে সাধারণ মানুষের মান-সম্মানকে এত নিম্নে নামিয়েছিলেন, অগণিত মানুষ তাদের মুক্তির জন্য সদাই আর্তনাদ করছিল। মানুষের প্রতি অত্যাচারের ও অবিচারের কোন সীমা ছিল না। তাই সমাজের অবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই চেয়েছিল রোমানদের পতন, রোমান শাসনের সমাধি।

এ সমাধি তারাই রচনা করেছিল, নিমিত্ত মাত্র ছিল মুসলিম সেনা, এবং মূলে ছিল মুসলিমগণের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী।

(৪) রোমানরা লড়েছিলেন মান-সম্মানের জন্য। মুসলিমগণ লড়েছিলেন অস্তিত্বের জন্য।

(৫) রোমান সেনাদের সম্মুখে ছিল আশা ও নিরাশা, জয় ও পরাজয়, আলো ও অন্ধকার।

কিন্তু মুসলিম সেনাদের সম্মুখে ছিল এপারে জগৎ-সম্পদ, ওপারে দুর্লভ স্বর্গলাভ। যুদ্ধে বাঁচলে এপারে গাজীর সম্মান ও মরলে ওপারে শহিদের মর্যাদা লাভ।

(৬) রোমানদের নিকট যুদ্ধ ছিল সম্রাটের নির্দেশ, কিন্তু মুসলমানদের নিকট এটি ছিল আল্লাহ্র আদেশ, যা পালন করা মহান আল্লাহ্ব পথে শ্রেষ্ঠ এবাদত বা উপাসনা।

(৭) রোমান সেনাদের নিকট যুদ্ধ ছিল এক বিভীষিকাময় ঘটনা, নিবিড় অন্ধকার, মহামরণের ডাক, ভয় ও ভীতির প্রাঙ্গণে অবস্থান, এক অজানা লোকের অন্ধকারে গমন। কিন্তু মুসলমানদের নিকট ছিল এবাদতগার; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে, সমর ক্ষেত্রে, রণাঙ্গনে মৃত্যু বলে কিছু ছিল না। এ কত বড় আশ্বাস ও জীবনেব প্রতি কত বড় বিশ্বাস। সমগ্র পৃথিবীর সমর ইতিহাসে কোথাও কি এর কোন দৃষ্টান্ত মিলবে! কখনও না। ইসলামের মহানবী তাঁর উম্মৎদের (শিষ্য) এই বি.্ষ ব্যতিক্রম বিহীন নজিরবিহীন দৃষ্টান্তবিহীন আশার জীবনদীপটি জ্বেলে দিযে গেছেন—পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। যে অনির্বাণ শিখা কোনদিনই কোন কালেই নির্বান লাভ করবে না। "তুমি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালবাসে।...আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট, এরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্ব দল। নিশ্চয আল্লার দলই সফলকাম হবে"। কোরআন ৫৮:২২। "আল্লাহ্র পথে যাবা নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। তারা জীবিত, কিন্তু তোমবা ওটি বুঝতে পার না।" ২:১৫৪। ২২:৭৮, ২৯:৬, ২০:৬৮।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের তথ্যাদি :

উইলিয়ম মূইরের মতে, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম। কিন্তু হিট্টি বলেন—এটি সংঘটিত হয়েছিল ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রথম মতটির সমর্থনকারী। আমাদের অভিমতও অনুরূপ। নিখুঁতভাবে আরব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যুদ্ধটি আবুবকরের খেলাফতকালেই সংঘটিত। য.িৎ খলিফা এই সময়েই মারা যান।

সকলেই একমত রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল—২,৪০,০০০ এবং

মুসলমানদের কেউ বলেন ৪০,০০০ আবার কেউ কেউ বলেন ২৫,০০০। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ শেষের মতটিই পোষণ করেন। কেননা খলিফা সাধারণত সব যুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রু-সৈন্যসংখ্যার $\frac{1}{2}$ অংশের সামান্য কিছু বেশি পাঠাতেন। তাঁরা সকলেই জানতেন একজন মোমিন দশজন মুশ্‌রেকের মোকাবিলা করবে। এই দিক থেকে আমরা ২৫,০০০-কে সঠিক সংখ্যা বলে মনে করি।

সকলেই একমত এই যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র ৩০০০ শাহাদত বরণ করেন। এবং রোমানদের কেউ বলেন—৭০,০০০। কেউ বলেন, ১,০০০০০ কেহ বলেন—২,০০০০০। রোমান সেনারা হয়ত ৭০,০০০ যুদ্ধে প্রাণ হারান। কিন্তু তাঁরা এমন একটি স্থানকে সমরক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন, যার তিনদিক পাহাড়, এবং অন্য দিকে নদীগর্ভ। এই অসুবিধায় পড়েই যুদ্ধে পরাজয়ের পরও অসংখ্য রোমান সৈন্য নদীগর্ভে প্রাণ হারান। সুতরাং অধিকাংশের মতে, রোমানদের সর্বমোট ২,০০০০০ সৈন্য নিহত হয়।

দূতের সেই পত্রটি :

ভীষণ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মদিনা হতে একজন দূত এসে সেনাপতি খালিদকে একটি পত্র দেন। এই যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই খলিফা আবুবকর ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন হযরত ওমর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মুহূর্তও দেরি না করে দূতের মাধ্যমে সেনাপতি মহাবীর খালিদকে বরখাস্ত করাব ফরমান পাঠিয়ে দেন। পত্রটি ছিল ঐ বরখাস্তের জরুবি ফরমাননামা। পত্রখানি হযরত ওমর স্বহস্তেই লিখেছিলেন। তাতে যা বয়ান ছিল—

খলিফা হযরত আবুবকর পরলোক গমন করেছেন। এখন হযরত ওমর খলিফা রূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি সেনাপতি খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করে তাঁর পদে আবু উবায়দাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

দূতের হাত হতে সেনাপতি খালিদ যখন পত্রটি আপন হাতে পেলেন ও পড়লেন, তখন যুদ্ধ পুরোদমে চলছে। তিনি অসীম বীরত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। হেনকালে বজ্রপাত, এরূপ একটি মর্মান্তিক পত্র হাতে পড়ল। এই পত্রটিকে তিনি পড়ার পর তূণের মধ্যে রেখে দিয়ে সমানে আপন কাজে পূর্ববৎ আত্মনিয়োগ করে ধৈর্যের যে পরিচয় দিলেন, তাতে আমাদের মনে হয় যে মহাবীর খালিদ পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে কেবলমাত্র অজেয় বীরই শুধু নন, পৃথিবীর ধৈর্যশীলদেব ইতিহাসেও একজন অজেয় ধৈর্যশীল। পবিত্র কোরআন বলে—"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথী"। ২ : ১৫৩। এই জন্যই বোধ হয়, আল্লাহকে তিনি চিরসাথী রূপে পেয়েছিলেন। এইজন্যই মনে হয়, জগৎবীর তাঁকে কোনদিনই পরাস্ত করতে পারেনি। তিনিই একমাত্র আজও পৃথিবীর অজেয় বীর সন্তান।

এত বড় আঘাত, এত বড় অসম্মান, এত বড় সম্ভ্রমহানি ও অবমাননা সব কিছুকেই অবলীলায় অতিক্রম করে যুদ্ধ শেষে আপন অধীনস্থ কর্মচারী আবু

উবায়দার নিকট উপস্থিত হয়ে খলিফার ঐ পত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য বদনে আপন মাথার মুকুটটি তাঁর মাথায় বসিয়ে দিয়ে তাঁকে সেনাপতিরূপে অভিবাদন জানিয়ে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করলেন—"খলিফা ওমরকে ধন্যবাদ যে, তিনি একজন সাধারণ সৈনিকবেশে আমার ইসলামের সেবা করার অধিকারটুকুকে বরখাস্ত করেননি, বাজেয়াপ্ত করেননি, বজায় রেখেছেন। আমি এতেই সন্তুষ্ট থাকলাম আমার কর্তব্য পালন করতে।"

আবু উবায়দা অতীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলিফার এই আদেশ মেনে নিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন মহাবীর খালিদ কত বড় সমরবিশারদ, কত সামরিক প্রতিভা, যাকে স্বয়ং মহানবী 'সাইফুল্লাহ—'আল্লার তরবারি' উপাধি দান করেছিলেন। সেই মহা বীরের অপমান তিনি অন্তরে-অন্তরে অনুভব করলেন, মনে প্রচণ্ড কষ্ট পেলেন। তাঁর অন্তরের অব্যক্ত আঘাত খালিদও অনুভব করলেন। আবু উবায়দা সেনাপতির পদ নিলেন, কিন্তু সেনাপতির দায়দায়িত্ব মহাবীর খালিদের ওপরই ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকলেন। তখনও বীর খালিদা নির্বিকার।

খালিদ কত বড় সামরিক প্রতিভা, ও কত বড় ইসলামদরদী ছিলেন, তাঁর কাজেই তার চির প্রমাণ রয়ে গেল।

কর্মী পালিয়ে যায় অতল জলে
কৃতী দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।
বর্বর রোমানদের করিতে তাড়া
আল্লার ফেরেশতা রূপে হয়েছিলে খাড়া।

বিশ্ববিজয়ী বীর খালিদ ও মুসান্না :

ইসলামের অভ্যুদয়কালে বা তদানীন্তন বিশ্বে আজকের মতো দুটো বৃহৎ বিশ্ব-শক্তি ছিল। একটি রোমান শক্তি, ও অন্যটি পারস্য শক্তি। এই দুই বৃহৎ শক্তিকে যাঁরা ইসলামের পতাকা তলে হাঁটু গাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন মহাবীর খালিদ ও অন্যজন মহাবীর মুসান্না। সিরিয়া বিজয়ের গৌরব যেমন খালিদের, পারস্য বিজয়ের গৌরব তেমনি মুসান্নার। বীরত্ব, রণ-কৌশল ও দেশ বিজয়ে এঁদের কোন জোড়া ছিল না। শৌর্যে-বীর্যে ও দুঃসাহসে মুসান্না খালিদের সমকক্ষ না হলেও একমাত্র খালিদকে বাদ দিলে মুসান্নারও পর কেউই ছিলেন না। সিরিয়া সীমান্তে খালিদ ও পারস্য সীমান্তে মুসান্না না থাকলে ইসলামের ইতিহাসের স্রোত সেদিন কোন পথে কোন নদীতে কোন দিকে প্রবাহিত হত, তা কে বলতে পারে। মহানবীর পরলোক গমনের পর ইসলামের জয় গতকালই যাঁরা দেশে দেশে উড্ডীয়মান করলেন, ইসলামি খেলাফতকে যাঁরা দিগ-দিগন্তে সম্প্রসারিত করলেন, তাঁদের একজন খালিদ ও অন্যজন মুসান্না। ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র উসামার মতো মুসান্নাও ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তাই হয়তো যুগের তাগিদেই হযরত ওমরের মত মানুষও একজন মরু বেদুঈনকে যোগ্যতম জেনেও

মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত সাহাবীদের উপর স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও ইসলামের প্রথম যুগের মহাবিপদও বীরত্বের মধ্য-গগনে মহাবীর খালিদ যেখানে সূর্য স্বরূপ, বীরবর মুসান্না সেখানে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ ধার করেছেন।

খলিফা আবুবকরের জীবনের শেষ লগ্ন

মহানবীর জীবনছায়া হযরত আবুবকরের জীবনের শেষলগ্ন এবার ঘনিয়ে এল। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি একটু জ্বরে পড়লেন। দু'সপ্তাহ কাল অসুখে ভোগার পর তিনি যেন বুঝতে পারলেন জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আর বেশি দেরি নেই। তাঁর অসুস্থতাকালে তিনি হযরত ওমরকে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। এমনকি মসজেদের ইমামতির ভারও তাঁকে দিলেন।

মহানবীর পরলোক গমনে খেলাফত গঠন সম্পর্কে খলিফা আবুবকরের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা হতেই রোগশয্যাতেই নিশ্চিত হতে চাইলেন আগামী দিনের খেলাফত সম্পর্কে। বহু বিজ্ঞ অভিজ্ঞ সাহাবীদের একের পর এক ডাকলেন। সবার সাথে পরামর্শ করলেন। সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র জ্ঞানবৃদ্ধ সাহাবী আব্দুর রহমান বলেন—"আমার মতে ওমরই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি খলিফা হওয়ার জন্য। যদিও তাঁর চরিত্রে ধীরতা ও সহনশীলতার অভাব আছে। যা রাষ্ট্র পরিচালনায় খুবই দরকার"। আবুবকর বলেন—"ঠিকই, তবে গুরুদায়িত্ব মাথায় এলে ও দোষটা কেটে যাবে। খুব কোমল হওয়াটাও ভাল নয়। কিছু কঠোরতাও দরকার।" হযরত ওসমান বলেন—"ওমরের ভেতর বাহির অপেক্ষা কত সুন্দর।" হযরত আলি বলেন—"এখন ওমর ব্যতীত অন্য কারো খেলাফত স্বীকার করা যায় না।" বিভিন্ন জনের বক্তব্যে খলিফা খুশিই হলেন।

খেলাফতের অন্য একজন দাবিদারও ছিলেন, যাঁর নাম তালহা। যিনি আবুবকরের আত্মীয়ও ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আবুবকর তাঁকেই খেলাফত দিয়ে যাবেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন—খলিফা, ওমরকে খলিফা পদে আনার জন্য মনস্থির করেছেন। তখন তিনি খলিফার নিকট গিয়ে বললেন—"শুনছি আপনি ওমরকে খলিফার পদ দেওয়ার জন্য মন স্থির করছেন। কিন্তু আপনি তো জানেন—ওমরের ব্যবহার কত রূঢ়। খলিফা হলে সে-ব্যবহার কিরূপ হবে, তা চিন্তা করা যায় না। আপনি আল্লাহর নিকট গিয়ে কি জবাব দেবেন।" তালহার এই কথা শোনা মাত্রই খলিফা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং বললেন—"তুমি কি আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাতে এসেছ? আমি শপথ করেই বলছি—আল্লাহকে গিয়ে বলব—একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি।"

অতঃপর আবুবকর ওমরকে ডেকে পাঠালেন, এবং তাঁকে বললেন—"তুমি খলিফার পদ গ্রহণ করো।" ওমর জানালেন—"আমি ঐ পদের প্রার্থী নই"। তখন খলিফা বললেন—"ঐ পদটি তোমার প্রার্থী। ইসলামের সেবার জন্য তোমাকে

এই পদটি গ্রহণ করতে হবে।" ওমর তখন নিরুত্তর। খলিফা হযরত ওসমানকে ডাকলেন, এবং বললেন—কাগজ ধর, লেখ—"আমার পরে খলিফা; এতটুকু বলার পরই চৈতন্য হারালেন। কিছুক্ষণ পর চৈতন্য ফিরে এলে খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন—কি লেখা হয়েছে? ওসমান পড়ে শুনিয়ে বললেন—আমি কি 'হযরত ওমর' শব্দটি এবার লিখে দেব? খলিফা বললেন—'না'। অতঃপর কাগজটি নিজেই নিয়ে লিখে দিলেন—'হযরত ওমর'। এবং ওসমানকে বললেন—সকলকেই শুনিয়ে দাও। অতঃপর খলিফা সমস্ত জনতাকে তাঁর বাসার নিকট আসতে বললেন। সকলে উপস্থিত হলে—খলিফা বহু কষ্টে স্ত্রী আসমার কাঁধে ভর দিয়ে জানালায় এসে সকলকে সম্বোধন করে জানালেন—"হে ভাই সকল, আমি ওমরকে খলিফার পদে মনোনীত করেছি, তোমরা কি আমার এই মনোনয়নকে সমর্থন করো, কিংবা করো না? সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিলেন—"আমরা সমর্থন করলাম। আমরা সকলেই তাঁকে মেনে চলব।" আবুবকর খুশি হয়ে আবার শয্যা গ্রহণ করলেন।

অতঃপর অবুবকর আবার ওমরকে ডাকলেন, এবং বললেন—"কঠোর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করো, কিন্তু ঐ কঠোরতার মধ্যেও কিছু কোমলতাব অবকাশ রেখো।" পরে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট মোনাজাত করলেন—"হে আল্লাহ্, ইসলামের সেবায় আমি ওমরকে খলিফা মনোনীত করলাম, তুমি তাকে কবুল করো। তুমি তাকে সাহায্য করো—সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে।"

তখন খলিফার শারীরিক অবস্থা দ্রুত যেন পতনের দিকে ধাবিত। তিনি প্রাণ-প্রিয় কন্যা আয়েশাকে ডাক দিলেন। আয়েশা এলেন। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন—"রাজকোষ হতে খলিফা এ যাবত বেতন বাবদ কত নিয়েছেন? আয়েশা হিসাব করে বলে দিলেন—"সর্বমোট ৬০০০ (ছয়) হাজার দিরহাম, (১৫০০, শত টাকা)।" তখন খলিফা বললেন—"আমার একটি নিজস্ব সম্পত্তি আছে, ওটাকে বিক্রি করে, প্রথম ঐ ছয় হাজার দিরহাম রাজ-কোষে ফিরিয়ে দিও।" আবার খলিফা বললেন—"আমার সংসার যাত্রার জন্য আর কি কি আছে?" তখন আয়েশা বলেন—"একটি হাবশী (পার্টটাইম) দাস, একখণ্ড বস্ত্র, ও একটি উঁঠ।" তখন খলিফা বলেন—"আমার মৃত্যুর পর, যা কিছু আছে, সবই ওমরের নিকট পাঠিয়ে দিও"।

একথা শুনতে শুনতে ওমর আবুবকরের অন্তিমশয়নে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হল—হে ওমর, কাঁদছ কেন। উত্তরে ওমর বলেন—"হে আবুবকর, আপনি কত মহান, আপনি আপনার আচরণ দ্বারা আপনার উত্তরাধিকারের কাজকে কতই না কঠিন করে গেলেন।"

অতঃপর আবুবকর কন্যা আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহানবীর দাফনে কয় টুকরা কাপড় লেগেছিল? আয়েশা বলেন—"তিন টুকরো"। আমাকেও তিন টুকরো দিও। আমি দুখানা ব্যবহার করছি, আর একখানা কিনে নিও।

এবং আমার ব্যবহার করা দু টুকরোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিও। আয়েশা বলেন—"আমরা কি এতই দরিদ্র বা কৃপণ যে আপনার জন্য তিন টুকরো নূতন কাপড় সংগ্রহ করতে পারবো না!" আবুবকর বলেন—"নূতন কাপড় মৃত অপেক্ষা জীবিতদের বেশি কাজে লাগে।" অতঃপর আবুবকর আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ কি বার" আয়েশা বলেন—'সোমবার'। তখন আবুবকর বলেন—"মহানবী এইদিনেই পরলোক গমন করেছিলেন। আমার মনে হচ্ছে, আমিও আজ দুনিয়া ত্যাগ করব। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে মহানবীর পাশে কবর দিও।"

এবার ইসলাম জগতের ত্রানকারী খলিফা আবুবকর যেন অন্যজগতে যেতে প্রস্তুত। আয়েশার কোলে মাথা, কন্যা আয়েশা ক্রন্দনরতা। আয়েশা যেন কোলে এবার ভার অনুভব করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আরবী ঐ কবিতাটিকে আবৃত্তি করলেন, "প্রত্যেক অশ্বারোহী তার মঞ্জিল খোঁজে।" জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও পবিত্র কোরআনের চির জাগ্রত জীবন খলিফা আবুবকর কন্যাকে বললেন—"ও কথা কেন বলছ, বরং কোরআনের এই আয়াত বলো—

সত্যই আসিবে যেন মৃত্যুর বেদনা
হে মানুষ যাহা তুমি এড়াতে পারনা। ৬২ : ৮

সমগ্র ইসলাম জগতে স্বয়ং মহানবীকে বাদ দিলে যে কোন সংকটময় কঠিন পরিস্থিতি ও পরিবেশে কালবিলম্ব না করেই সমস্যার সমাধান কল্পে সঠিক উত্তর দানে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি প্রয়োগে হযরত আবুবকর ছিলেন চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অতপর আবুবকর যেন চেতনা হারালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার চেতনা ফিরে পেলেন। এবার উর্দ্ধমুখে চেয়ে বললেন—"হে আল্লাহ, আমাকে পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে মরতে দাও; আমি যেন তোমার অনুগৃহীত দলের সাথে মিশতে পারি।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহানবীর জীবন-ছায়া, ইসলামের প্রথম খলিফা ইহলোক ত্যাগ করলেন।

তাঁর মৃত্যুদিনটি ছিল—১৩ হিজরী, ২২শে জামাদিউল, সোমবার, ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৩শে আগস্ট। সময়টি ছিল মাগ্‌রেব্‌ (সান্ধ্য) নামায ও এশার (রাত্রির) নামাযের মাঝামাঝি সময়। হযরত ওমর তাঁর জানাজা-নামায সম্পন্ন করেন। মহানবীর পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

এমনি জীবন তুমি করেছিলে খাড়া
মুসলিম জাহানে তব নাহি আছে জোড়া।

চতুর্দশ অধ্যায়

চরিত্র-মাহত্ম্যে আবুবকর

চরিত্রে আবুবকর :

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ বর্ষাকাল, আগস্ট মাস, আবুবকর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধু-বান্ধব ব্যাকুলভাবে বলতে থাকলেন—চিকিৎসক ডাকুন। উত্তরে তিনি জানালেন—ডেকেছেন। বন্ধুগণ—চিকিৎসক কি বললেন! উত্তর—চিকিৎসক বললেন—"তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন"। কোরআন ৮৫ : ১৬।

প্রতিটি মানুষের চরিত্র তার জীবন ধারাতে প্রতিফলিত হয়। আমরা খলিফা আবুবকরের জীবন ধারা বিস্তারিত ভাবেই দেখলাম। সেখানে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে তাঁর চরিত্র কত সুমহান ছিল। তবুও আমরা একবাব দেখবো তাঁর সম্বন্ধে মনুষ্যকুল কি বলেন।

স্বয়ং মহানবী বলেন—"নবী-রসুলদের বাদ দিলে, আবুবকর অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের মুখের উপর সূর্য উদয় হয়নি।" "তাঁদের বাদ দিলে আবুবকরই মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।" যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবুবকরকে গ্রহণ করতাম"।

খলিফা হযরত ওমর বলেন—"ইসলামের খেদমতে কেহই আবুবকবকে অতিক্রম করতে পারবে না।"

খলিফা হযরত আলি বলেন—"মহানবীর পর আবুবকর ও ওমব শ্রেষ্ঠ মুসলমান।"

মওলানা মহম্মদ আলী বলেন—তাঁর নম্রতা, একনিষ্ঠতা, অনাডম্বব জীবন, অতি সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞান, গরিব দরদী মন, কঠিন সংকল্প, হৃদয়েব কোমলতা, ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়, সর্বোপরি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অটল ও অফুরন্ত বিশ্বাস এবং ভালবাসা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য তাঁর স্থান ইসলাম জগতে মহানবীর পরই।"

অধ্যাপক মূইর বলেন—"আবুবকরের খেলাফত স্বল্প মেয়াদী হলেও মহম্মদ (দঃ)-এর পর আর কারো জীবনে তাঁর পূর্ণ জীবন-পদ্ধতি এমন জীবন্ত রূপ গ্রহণ করেনি।"

আমাদের মতেও—কর্মময় সংসারে বিশেষ বিশেষ ক্ষণে কোরআনের সঠিক উদ্ধৃতি প্রয়োগে আবুবকরের জোড়া নাই। অর্থাৎ তাঁর জীবনের ও মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোরআন প্রবেশ করে গিয়েছিল। তিনি কেবলমাত্র কোরআন মুখস্থ করেন নি, বরং আত্মস্থ করেছিলেন। সফল অনুষ্ঠানকে অতিক্রম কবে তাঁব

আত্মা ও অনুভূতিতে ইসলাম একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোরআন ছিল তাঁর আত্মস্থ, কেবল মুখস্ত নয়।

সাবালক পৃথিবীর শেষ অধ্যায়:

"হে মানুষ, অভিভাবকত্বের যুগ এখানেই তোমাদের শেষ হল, এখন তোমরা সাবালক। এখন তোমরা তোমাদের আপন দায়িত্বে নিজ পায়ে নিজে দাঁড়াও।" কোরআন—

আমাদের পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনেও এই অভিভাবকত্ব লক্ষ্য করা যায়। পিতা-মাতা সন্তানদের অভিভাবক। সন্তান সাবালক হলে অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে। মহানবী বলেন—"সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার। এই পরিবারের অভিভাবক স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ, যিনি সবারই পরম প্রভু। তিনি তাঁর পরিবারের নাবালকত্বের যুগে যুগ-যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে একের পর এক—এক লক্ষ চব্বিশ হাজার (অভিভাবক) নবী বা রসুল পাঠালেন মানবমণ্ডলীকে পথ দেখানর জন্য। সর্বশেষ অভিভাবক ছিলেন—হযরত মহম্মদ (দঃ)। এই অভিভাবকের দ্বারা স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি জগৎকে জানিয়ে দিলেন—আর কোন অভিভাবক আসবে না। এবার তোমরা নিজে নিজে চলো।

সাবালক পৃথিবীর প্রথম দায়িত্বে আবুবকর:

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) হতে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত এই যুগটিকে একদিকে মানবমণ্ডলীর নাবালকত্বের যুগ ও অন্যদিকে নবীদের যুগ বলা যায়। এই বিশাল যুগটিতে মহান আল্লাহ মানুষকে বার বার তাঁর দূত পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন, সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সময় বলে দিলেন—আরকোন দূত যাবে না। মহম্মদ (দঃ) শেষ দূত। ৩৩ : ৪০। সাবালক পৃথিবী, সাবালক মানবমণ্ডলী প্রথম কোন্ মানুষটিকে পেল। কে তাঁদের পরিচালনার প্রথম দায়িত্ব পেলেন। কে এই সৌভাগ্যবান পুরুষ, কে এই মানব-শ্রেষ্ঠ নেতা। যাঁকে নবীদের পরই স্থান দেওয়া হল। তিনিই হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)। কত বড় সুমহান চরিত্র, কত বড় সমুন্নত ব্যক্তিত্ব। কত বড় গরীয়ান, কত বড় মহীয়ান। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর পর সাবালক জগতের প্রথম কাণ্ডারী, প্রথম পরিচালক হযরত আবুবকর যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হবেন একথা তো খুবই স্বাভাবিক, খুবই সত্য।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম আকাশ রক্তিমাভ রংগে রঙ্গিন হয়ে ওঠে, এবং বেশ কিছুক্ষণ আলোদান করে। মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিজন প্রধান শিষ্যের মাধ্যমে বেশ কিছুকাল আলো থেকে যায়।

মহানবী নিজেই বলে গিয়েছিলেন—ত্রিশ বছর ঐ আলো থেকে যাবে। আমরা বাস্তবেও তাই লক্ষ্য করলাম—মহানবীর তিরোধানের ৬৩২ খ্রীঃ হতে ৬৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর চার প্রধান শিষ্য ৩০ বছর যাবৎ একের পর এক আলো বিতরণ করেন। গণতন্ত্রের মাঝে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, এক হাতে ফকিরের ও অন্য হাতে সম্রাটের, তা তখন হতে আজ পর্যন্ত কোন শাসকের পক্ষে তুলে ধরা তো দূরের কথা, কেউ চিন্তাও করতে পারলেন না। এই চার জন অতুলনীয় মানুষের প্রথম ব্যক্তিটিই ছিলেন অভাবনীয় হযরত আবুবকর।

মানুষেরই মাঝে মোরা মহান তুলি
অফুরন্ত মান্ তাঁর মানব বলি।

পারিবারিক জীবন :

আবুবকরের পিতা ছিলেন উসমান, যাঁর ডাক নাম ছিল আবু কোহাফা, মাতার নাম ছিল—সালমা, ডাক নাম ছিল উম্মুল খায়ের। পিতা, পুত্রের পরলোক গমনের পরও ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আবুবকর মোট চারটি বিয়ে করেছিলেন। দুটো মক্কায় ও দুটো মদিনাতে। প্রথম স্ত্রী কুতাইলা, যাঁর গর্ভে জন্ম নেন—আব্দুলাহ্ ও আস্মা। দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে রোমান, যাঁর গর্ভে জন্মে—আব্দুর রহমান ও আয়েশা। তৃতীয় স্ত্রী আস্মা, যিনি হযরত আলীর ভ্রাতা সুপণ্ডিত জাফরের বিদুষী বিধবা-স্ত্রী, জাফর মুতার যুদ্ধে শহিদ হন। আসমার গর্ভে পুত্র মহম্মদের জন্ম। চতুর্থ স্ত্রী হাবিবা, যাঁর গর্ভে উম্মে কুলসুমের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর এঁর জন্ম হয়।

বাসগৃহ :

ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রপতি মদিনার তীরে মুন্নাহ নামক একটি পল্লীতে স্ত্রী হাবিবার সাথে বসবাস করতেন। সেখান হতে প্রত্যহ কখন পায়ে হেঁটে, কখন বা ঘোড়াতে চেপে ফজরের নামায ইমামতি করতেন মদিনাতে এসে। এবং এশার নামাজের পর আবার ফিরে যেতেন। এর জন্য বহু সময় নষ্ট হত। তাই অন্যান্য সাহাবীদের অনুরোধে তিনি মদিনায় আসেন।

জীবন-যাত্রা :

কত সাধারণভাবে তিনি জীবনযাত্রা করতেন, তা আমাদের পক্ষে চিন্তা করা শক্ত। কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করতেন, কিন্তু দীন দরিদ্রের সেবায় সবই বিলিয়ে দিতেন। কখনও বা ছাগল চরাতেন। রাষ্ট্রপতির

পদ লাভ করেও কাঁধে কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। একমাত্র ওমরের অনুরোধে তিনি রাজকোষ হতে অতি সামান্য কিছু মাত্র বেতন নিয়ে ঐ কাজ বন্ধ করেন। একদিন স্ত্রী বললেন—সামান্য মিষ্টি এনো, তিনি উত্তর দিলেন—মিষ্টি কেনার মত পয়সা আমার নাই। পরে একদিন স্ত্রী বললেন—সামান্য ময়দা এনো, উত্তরে খলিফা বলেন—"চিনি কোথায় পাবে?" স্ত্রী বলেন—"প্রত্যহ দৈনিক খরচ হতে কিছু চিনি বাঁচিয়ে রেখেছি।" উত্তরে খলিফা বলেন—"কি সর্বনাশ, তা হলে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করেছি। অতঃপর খলিফা সেই চিনিটুকু বায়তুল মালে ফেরৎ পাঠালেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনির বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন।

খলিফা রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজকোষ হতে বছরে সর্বমোট ২,৫০০ দিরহাম, অর্থাৎ মাসে এক শ (১০০) গ্রহণ করতেন। প্রথম ছয়মাস রাজকোষ হতে একটি পয়সাও নেন নি। মসজেদে নববীতে বসেই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। না ছিল রাজ-প্রাসাদ, না ছিল রাজ-দরবার। এমনি ছিল ইসলামের রাষ্ট্রপতির জীবন-ধারা, জীবন যাত্রা।

স্নেহপ্রবণ ও দয়াবান আবুবকর:

আবুবকর জন্মগত ভাবেই স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর কোমল হৃদয় মানব-সন্তান হতে জীবজন্তু সকলকেই স্পর্শ করেছিল। শিশু ও বালক বালিকাদের ভালবাসা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। দরিদ্র মানুষ, অসহায় মানুষ, অনাথ বালক-বালিকা, সকলেই যেন জানতো আবুবকর তাঁদের আশ্রয়স্থল। অত্যন্ত কোমল হৃদয় হওয়ার জন্য তিনি পবিত্র কোরআন পড়াব কালে চোখেব পানিকে সম্বরণ করতে পারতেন না। পাড়া-প্রতিবেশীকে নানা কাজে নানা ভাবে সাহায্য করা ছিল তাঁর জীবনের গতানুগতিক ধাবা। জীবনে এমন কোন ছোট কাজ ছিল না, যাকে তিনি ঘৃণা করতেন, সে যেমনই কাজ হোক। এমনকি তাঁর খেলাফতের জীবনও, সময়ের অভাব হলেও, এই সকল কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত করতে পারেনি।

স্নেহ-মায়া-মমতার-
প্রাচীর দিয়ে
শান্তনীড় গড়েছিলে—
সবারে নিয়ে।

সত্যবাদী আবুবকর:

মহানবী ছিলেন—চির সত্যবাদী, চিরবিশ্বাসী। পবিত্র কোরআন

বলে—"তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"৯:১১৯। হযরত আবুবকর অতি সাথকভাবেই মহানবীর চিরসঙ্গী হয়েছিলেন আর একজন চির সত্যবাদী রূপে। তাই মহানবী তাঁকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) উপাধীতে ভূষিত করেন। হযরত আবুবকর তাঁর জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলতেন না। সত্যবাদীতা মানুষের সর্বশ্রেষ্ট গুণ। এবং যিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ট মানব।

বীরত্বে আবুবকর :

যে দিন মহানবী (সাঃ) প্রথম ঐশী লাভ করেন, ও অতি সন্তর্পনে, অতীব গোপনে তার প্রচার আরম্ভ করেন, সেদিন সমগ্র আরব ভূমির কোন্ বীর সমস্ত বিপদকে মাথায় নিয়ে, অতি দুর্ধর্ষ আরব বেদুঈনকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে বহিরবিশ্ব হতে প্রথম ইসলামকে হৃদয় দিয়ে বরণ কবলেন, কে সেদিন কোরেশ বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম, কে সেদিন প্রথম সত্যকে বরণ করার জন্য সমস্ত কিছুকে বর্জন করেছিলেন, তিনিই তো মহাবীর আবুবকর। তাঁর এই বীরত্ব বরণেই শেষ হযনি, সমগ্র জীবন-ব্যাপী—বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, সমরে-সর্বকষ্টে, মৃত্যুব মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এই বরণকে, এই বিশ্বাসকে লালন কবে গেছেন, পালন করে গেছেন। মক্কার মাটিতে তাঁর যে বীরত্বের পরিমাপ, তা একমাত্র মহানবীকে বাদ দিলে—অন্যান্য সকলের বীরত্বে বারো আনা প্রাপ্য একা আবুবকরের। অতঃপর মদিনার মাটিতে বদর যুদ্ধ হতে আরম্ভ করে মহানবীর জীবনে এমন কোন যুদ্ধ নাই, যার প্রথম সারিতে আমরা হযরত আবুবকরকে দেখি না। মহানবীর এ জীবনে এমন কোন সংকট বা সংঘাত নাই, যেখানে দেখি না তাঁর জীবন-ছায়া আবুবকরকে। মহানবীর জীবনে এমন কিছু গোপন নাই যেখানে দেখি না আবুবকরকে, সওর পাহাড়ের সঙ্গী আবুবকর। আবার মহানবীর আশু পরবর্তীকালে বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি রোমক ও পারসিক হতে আরম্ভ করে আপন দেশবাসী যা আরম্ভ করেছিল,—এককথায় এক নিঃশ্বাসে এক পলকে, এক ঝলকেই বলা যয়—একমাত্র আবুবকরের বীরত্ব ব্যতীত সেদিন জগতের বুক হতে ইসলামের নাম নিশানা পর্যন্ত হযত মুছে যেত। এইজন্যই ইসলামে আবুবকরের বীরত্বের কোন তুলনা নাই। আবুবকর তুলনাহীন বীর।

নিঃস্ব জীবনে শুধু ঈমানের বল
তোমাকে পাহাড় হতেও করেছে সবল।
রাখিয়া 'তত্তহিদ-রব্' হৃদয়ে বন্দী
সেখানে মান নি কোন শর্ত সন্ধি।

আবুবকরের ধর্ম-বিশ্বাস :

ধর্ম যে কোন অনুষ্ঠানে নেই, আছে মানব অনুভূতিতে, একথাটি পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায় আবুবকরের ধর্মানুভূতি থেকে। জীবে প্রেম ও মানুষের কল্যাণই যে আসল ধর্ম, একথাটি আবুবকরের জীবন-সাধনাতে বুঝবার কোন অপেক্ষাই রাখে না। তিনি ধর্ম বলতে যা বুঝতেন—"নিশ্চয় আল্লাহ (তোমাদের মানুষদের মধ্যে) সুবিচার ও মানুষের উপকার করতে এবং আত্মীয়-স্বজনদের দান করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন।" ১৬ : ৯০। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে হযরত আলি বলেন—"যদি আবুবকরের ঈমান বা বিশ্বাস এবং সমগ্র জাতির ঈমান দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায়, তাহলে অতি অবশ্যই আবুবকরের পাল্লাই ভারী হবে।" আবুবকর সব সময়ই যুক্তি ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বেই তাঁর ঈমানকে স্থান দিতেন। আবুবকর কখনও বিশ্বাস করতেন না যে, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা মহাসত্যকে লাভ করা যায়। তিনি বলতেন, একমাত্র গভীর বিশ্বাসই সত্যের উপলব্ধিকে সহজ করে ও ভীষণ সংকটকালে মানুষকে অপরিমিত শক্তি দান করে।

মনের বিকার শুধু মনিষা বিজ্ঞান
তোমারে চিনিতে চায় তব দেওয়া জ্ঞান।
নহে মোর মানবিক যুক্ততর্ক জ্ঞান
যেখানে দিয়েছ ধরা সেতো শুধু ধ্যান।
তোমারে করেছে জয় মনের ক্ষুদ্রতা নয়
বিবেকের সাথে বসা বিশাল হৃদয়।

তাঁর গভীর বিশ্বাসই তাঁর নিকট সত্যের উপলব্ধিকে সহজ করে দিয়েছিল। এবং সংকটকালে তিনি যে অপরিমিত শক্তি ধারণ করেছিলেন—তার প্রমাণ তদানীন্তন বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তির নতি স্বীকার। তিনি বলতেন, ধর্মে অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করতে না পারলে আল্লাহর সাথে একাত্মতা সৃষ্টি করা যায় না, এক হওয়া যায় না। ধর্মের আসল স্বাদও পাওয়া যায় না।

যাদের প্রাণে ধর্ম শুধু অনুশাসনের অঙ্করব
ধর্ম তাদের দেয়নি ধরা দিয়েছে ধরা তারাই সব।
যাদের কাছে নেই ভেদাভেদ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর
আর কোথাও কি ধর্ম আছে তাদের ধরা ধর্ম পব।
মনুষ্যত্বের মহান রূপই ধর্মে যাদের লক্ষ্য স্থল
সত্যজয়ী মরণ জয়ী তারাই ধরার ধর্ম বল।

আবুবকরের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা :

মহানবীর পূর্বে আরবের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা আমরা জানতে পেরেছি—মহানবীর জীবনীতে। এককথায় সেটা ছিল অন্ধকারেব যুগ। এবং

মহানবীর পরলোক গমনের পর আরবে আমরা যে সমাজ লক্ষ্য করি, তা এক কথায় দুর্যোগের যুগ। এই সামাজিক দুর্যোগের ঘনঘটা মাথায় নিয়ে আবুবকর খলিফার পদ বরণ করেন। তাঁর খেলাফতকাল ছিল মাত্র দুবছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও মানসিকতার পরিচয় দিয়ে দুযোর্গপূর্ণ আরব সমাজের ডুবন্ত সমাজ তরীটিকে তীরে আনলেন, বিশ্ব-ইতিহাসে তার কোন তুলনাই নেই। মহানবী সমগ্র আরব সমাজকে নিবিড় অন্ধকার হতে প্রভাতের আলোকে এনেছিলেন। এবং আবুবকর সেই আলোকহারা, পথ-হারা বিভ্রান্ত সমাজকে আবার বিশৃঙ্খলা হতে শৃঙ্খলায় আনলেন, বিপথ হতে পথে আনলেন। জাতির জ'নক রূপে জাতিকে আবার পথ দেখালেন—সমাজ সংস্করণের পথে। যে জাতি উচ্ছৃঙ্খলতায় মহানবীর পর আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, জাতির সেই বাঁধভাঙ্গা উন্মাদনাকে যিনি পথে আনলেন, তিনিই আমাদের আবুবকর, পৃথিবীর অন্যতম সমাজ-সংস্কারক।

অর্থনৈতিক পদক্ষেপ :

আরব জাহান সকল দিক থেকেই ছিল দুর্বল। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা আবার সকল দিক থেকেই সফল হতে আরম্ভ করল। মহানবীর সময়ে বাইতুল মাল (সাধারণ কোষাগার) ঠিক মতো স্থাপিত না হলেও এর সূচনা তখন হতেই। মহানবীর অনুসরণে ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর বাইতুল মাল স্থাপন করেন। এটা ছিল রাষ্ট্রের প্রধান ধনভাণ্ডার, যার প্রাপ্য ছিল সকল নাগরিকেরই। খলিফা ছিলেন তার রক্ষকমাত্র। বিভিন্ন দেশ জয়ের মাধ্যমে একদিন আরব ধনভাণ্ডার ভরে উঠল। বিভিন্ন যুদ্ধ-জয়ে যা কিছু ধনসম্পদ পাওয়া যেত, তাকে বলা হত গানিমাহ্ বা যুদ্ধ-লব্ধ ধন। এই ধনের $\frac{১}{৫}$ অংশ বাইতুল মালে জমা পড়ত। এবং বাকি $\frac{৪}{৫}$ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন হত। বাইতুল মাল সম্পদের তিনটি ভাগের প্রথম ভাগ হত—(১) মহানবীর জন্য, যা জাতীয় কাজেই বেশি ব্যয় হত, (২) মহানবীর স্ত্রী-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং জেহাদের সঙ্গীগণ, (৩) গরিব-দীন-দরিদ্রের জন্য। পরবর্তীকালে এরও কিছু পরিবর্তন হয়।

বিভিন্ন দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিজিয়া ও রাজস্বের পরিমাণ বহু অংশে বেড়ে গেল। খলিফা প্রথম রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটাতেন। পরে যা কিছু থাকত, প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে তা বিতরণ করতেন। উচ্চ-নীচ সকলকে সমান ভাবে দেওয়া ঠিক হয়। তখন খলিফা উত্তর দিলেন—"এই রাষ্ট্রে প্রজা হিসাবে সকলেই সমান। সুতরাং সবার অধিকারও সমান। আইনে চোখে উচু বা নীচু বলে কিছুই নেই। কে ভাল, কে মন্দ, কে সৎ কে অসৎ,

ওটা বিচাবকের ব্যাপার, বা ওটা আল্লাহ্‌ব ব্যাপাব। ওটা আমাব বা খলিফাব ব্যাপার নয়। খলিফার চোখে সকল প্রজাই সমান।" বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রবাদীবা ধনসম্পদ বণ্টন নিয়ে চিন্তা কবছেন। কিন্তু এই চিন্তাব প্রথম জনক সপ্তম শতাব্দীর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম কর্ণধার—স্বযং মহানবী নিজে ও তাঁব চাব খলিফাবৃন্দ। এই সম্পর্কে বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ভন ক্রেমাব বলেন—"বর্তমান রাষ্ট্রেব ভাতা বা সম্পদ বিতবণেব মূল ভিত্তি—ইসলামেব সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। প্রযোজনীয়তাব দিক থেকে এই পদক্ষেপেব মৌলিকত্ব শুধুমাত্র ইসলামেব ইতিহাসেই নয, ববং সমগ্র মানব জাতিব ইতিহাসেই এক যুগান্তকাবী ঘটনা।"

মনেব কোণে দেখেছি তোমাব
দুইটি ছিল আবাধনা—
সাম্যের বুকে সমাজ গড়া
প্রতিপালকেব বন্দনা।

শাসনব্যবস্থা :

হযরত আবুবকবের শাসন-ব্যবস্থা ছিল প্রধানত গণতান্ত্রিক ভিত্তিক। যাব সূচনা কবে গিযেছিলেন মহানবী নিজ হাতে। তিনি নিজে খলিফাব আসনে সমাসীন হযেছিলেন পূর্ণ গততান্ত্রিক ভিত্তিতে। এমন কি এতে স্বযং মহানবীবও কোন ইঙ্গিত ছিল না। কেননা তিনি চেযেছিলেন গণতন্ত্রেব মাধ্যমেই সব কিছুই হোক। খলিফা সকল জ্ঞানী-গুণী সাহাবাদেব নিযে একটি পবামর্শ সভা (PARLIAMENT HOUSE) গঠন কবেছিলেন। যে কোন জটিল, গুরুতর, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব হলেই, তিনি পবামর্শ সভাকে ডাকতেন। তাঁদেব সাথে খোলা মনে সকল প্রকাবেব আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতেন। তিনি একদিকে ছিলেন রাষ্ট্রেব শাসন-ব্যবস্থাব সর্বময কর্তা, আবাব অন্যদিকে ছিলেন সামবিক বিভাগেবও প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু তিনি সমগ্র জীবনে কোন দিনই স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয দেন নি। কখনও নিজকে বা নিজ মতকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন না। রসুলেব জীবনছায়া অপবিমিত জ্ঞানে ও গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি আবুবকর সব সময় বলতেন—"আমবা সাধাবণ মানুষ। ভুল আমাদেব চিরসঙ্গী, ভ্রান্তি আমাদেব চিবসাথী।" তাঁব মতো মানুষেব মুখে এ কত বড় বিনযেব কথা। এ কত বড শিক্ষাব কথা।

তাঁর এই গণতান্ত্রিক ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাব মধ্যে দুটা জিনিস সূর্য ও চন্দ্রের মর্যাদা লাভ কবেছিল, প্রথমটি আল্লাহ্‌ব বাণী পবিত্র কোবআন। ও দ্বিতীয়টি তাঁব বসুলেব বাণী অবিকৃত হাদিস। তৃতীয আবো একটি বস্তু ছিল, যা তাবকা বা নক্ষত্রেব সম্মান লাভ কবেছিল, সেটি 'ইজতেহাদ', অর্থাৎ

বিবর্তনশীল জগতে সবসময় সব সমস্যার খুঁটিনাটি সমাধান কোরআন-হাদিসে পাওয়া যেত না, বা যাবে না। তাই আবুবকর বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে পরামর্শসভা ডেকে সমস্যার সমাধানে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করতেন। এরই নাম 'ইজতেহাদ'। এটাও খুবই ভাল জিনিস, এও কোরআনেরই কথা। ৪ : ৮২, ৪৭ : ২৪।

ইসলাম আধুনিক যুগের বিকৃত ও মেকী গণতন্ত্রকেও পছন্দ করে না। প্রশাসনে যেমন গণতান্ত্রিক ভিত্তিলোক নিয়োগ করে প্রশাসন চলতে পারে না। সেখানে প্রয়োজন যোগ্যতার। তাই যোগ্যতার জন্য পরীক্ষা অনিবার্য। সেইরূপ ভাবে একটি দেশ পরিচালনাতেও মেধাবী ও বিকৃত গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ অধিকার ছেড়ে দিলে, কোথায় যেন বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। এরূপ ধরনের গণতন্ত্র দেশকে একদিন দেউলিয়াতে পরিণত করে দেয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রেরই মাধ্যমে দেশের কিছু জ্ঞানী ও গুণীকে ভার দিতে হবে দেশ-পরিচালনায় কারা থাকবেন। এই নীতিতেই একদিন 'বনি সফিফাতে' হযরত আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং ঐ একই নীতিতেই হযরত আবুবকরের জীবিতকালেই হযরত ওমর খলিফা নির্বাচিত হন।

শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য তিনি সমগ্র দেশটিকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। এবং প্রদেশকে জেলা হতে গ্রামপঞ্চায়েত পর্যন্ত ভাগ করেন। প্রতিটি প্রদেশের গভর্নর খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এবং গভর্নর তাঁর আপন মতানুযায়ী অন্যান্য অফিসারবৃন্দকে নিযুক্ত করে যথানিয়মে খলিফার অনুমোদনের জন্য তাঁদের তালিকা পাঠিয়ে দিতেন। সকল কর্মচারীই আপন আপন কাজের জন্য গভর্নরের নিকট দায়ী থাকতেন। এই সমস্ত লোক নিয়োগের পূর্বে যথারীতিভাবেই পরীক্ষা নেওয়া হতো। আবার কোন কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে যথাযথভাবে শাস্তি দেওয়া হতো। তাঁর শাসনব্যবস্থায় পুরস্কার ও তিরস্কার দুয়েরই ব্যবস্থা ছিল।

বিচারবিভাগ :

মহানবীর সময় হতেই হযরত ওমর প্রধান বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন। আবুবকরের সময়ও তিনি ঐ একই দায়িত্বে থাকলেন। মহানবী হযরত ওমরকে কেবলমাত্র প্রধান বিচারকই করেননি, বরং তাঁর বিচারকার্যে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে 'ফারুক' (অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধানকারী) উপাধিও দান করেছিলেন। হযরত ওমরের বিচার পৃথিবীর ইতিহাসে প্রবাদস্বরূপ। তিনি বিচারক হিসাবেই আপন পিতা ও একমাত্র পুত্র আবু সামাকে বিচারে আপন হাতেই প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। এ-জগতে সকলই মরণশীল, সকলেই মরে গেছে এবং সকলেই মরে যাবে। কিন্তু এ বিশ্ব-জগতের বিচারের প্রবাদপুরুষ

হযরত ওমরের বিচার কোনদিনই মরে যাবে না, যা মরণশীল জগতে চির অমরত্ব লাভ করেছে।

এবার আমরা একবার খলিফা আবুবকরের ন্যায় বিচার লক্ষ্য করব। খলিফা তাঁর কন্যা আয়েশাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি জীবিতকালে তাঁর বাইশটা খেজুর গাছ আয়েশাকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের অন্তিম শয়নে আয়েশাকে ডেকে বললেন—"ঐ গাছগুলো তোমরা ভাই-বোনে কোরআন মোতাবেক ভাগ করে নিও।" একবার মহানবীর প্রাণপ্রিয় কন্যা বিবি ফাতেমা খলিফা আবু বকরের নিকট আবেদন পেশ করলেন—"তাঁর পিতার ফিদাক নামক বাগানটি তাঁকে দেওয়া হোক।" অনেকেরই ধারণা ছিল—মহানবীর কন্যার অনুরোধ খলিফা রক্ষা করবেন। কিন্তু খলিফা তাঁরই পিতার (অর্থাৎ মহানবীর হাদিস) বাণী উদ্ধৃত করেই কালবিলম্ব না করে উত্তর দিলেন—"নবী বা রসুলগণের কোন ওয়ারিশ নেই। তাঁদের যা কিছুই আছে বা থাকে, সমস্তই তাঁদের উম্মতদের প্রাপ্য।" হযরত ওমর মদিনাতে আসার পর এক আনসার রমণীকে বিয়ে করেন। এবং তাঁর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় ওমর তাঁকে তালাক দেন। পরে একদিন ওমর ঐ মহল্লার ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ শিশু বালকটি রাস্তার উপর খেলা করছিল। পিতা ওমর তাঁর পুত্রস্নেহে বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে আপন বাসাতে আনেন। তখন ঐ বাচ্চার নানী বাচ্চাটিকে নিতে এলে ওমর না দেওয়ায় নানী খলিফার নিকট নালিশ করলে খলিফা ওমরকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠান, এবং বাচ্চাটিকে তার মাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। ওমর তাঁর নির্দেশ পালন করেন। বাচ্চা তখনই মায়ের কোলে ফিরে গেল।

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে 'বিচার' বিচারের নামে কোন প্রহসন ছিল না। রাজা, বাদশা, ফকির, সতী-সাধ্বী, পতিতা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মালিক-দাস, আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয়, বরেণ্য-নগণ্য প্রভৃতির মধ্যে বিচারের কোন রকমই তারতম্য ছিল না। তাই আজও বিশ্ব-সমাজে কাজীর বিচার এই সামান্য শব্দ দুটি চির সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করে আছে।

সামরিক বিভাগ :

স্বয়ং মহানবীর সময় কোন সামরিক বিভাগ বা সেনাবাহিনী বলে পৃথক কিছু ছিল না। যুদ্ধ বা জেহাদ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—"আপন রিপুর বিরুদ্ধে জেহাদ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জেহাদ।" তিনি আরো বলেন—"শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বা

অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, সে মুসলমান নয়।" পবিত্র কোরআন বলে—"অন্যায় করো না, এবং অন্যায় সহ্যও করো না।" ২ : ১২৪, ২৭৯।

খলিফা আবুবকর মহানবীকেই অনুসরণ করেছিলেন অকৃত্রিমভাবে সকল কাজেই। তাঁর সময়েও পৃথক কোন সেনাবিভাগ বা সেনাবাহিনী ছিল না। আরবের মুসলমানগণ সকলেই ছিলেন এককথায় যোদ্ধা। যখনই প্রয়োজন পড়ত, তখনই সবল ও সক্ষম ব্যক্তিগণ সকলেই যোগদান করতেন। যুদ্ধের জন্য যখনই খলিফা আহ্বান করতেন, সঙ্গে সঙ্গে আরববাসী তাঁদের সকল কাজ ফেলেই খলিফার আহ্বানে সাড়া দিতেন। যখনই কোন বড় আকারের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হতো, তখন খলিফা হাতে সময় রেখেই তাঁদের আহ্বান জানাতেন। এবং তাঁরাও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে এসে মদিনাতে হাজির হতেন। তখন খলিফা তাঁদের ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করতেন। যাতে তাঁরা ইসলামের যুদ্ধকে অন্য পথে পরিচালিত না করেন।

সেনাপতি নির্বাচনের সময় মহানবী কখনও বংশ, গোত্র, আভিজাত্য বা সামাজিক মান-মর্যাদাকে স্থান বা গুরুত্ব দিতেন না। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতেই সেনাপতি নিয়োগ বা নির্বাচিত করতেন। খলিফা আবুবকরও এই নীতি কঠোরভাবেই অনুসরণ করেন। মহানবীর জীবিতকালেই তাঁর আদেশেই ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র উসামা রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন মুতা অভিযানে। এই অভিযানে বহু বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত সাহাবীও ছিলেন। আবু-বকরের সময় বিখ্যাত সেনাপতি মুসান্না ছিলেন একজন ক্রীতদাস। মহাবীর খালিদের পরই বীরবর মুসান্নার নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরসুবিদিত। সেনাবাহিনীকে একত্রিত করার পর খলিফা তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন যুদ্ধে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য কি। তিনি বারবার বলতেন, "মহানবী এই জগতে এসেছিলেন রাজ্য গড়তেও নয়, বা রাজ্য ভাঙতেও নয়। তিনি এসেছিলেন বহু নিন্দিত মানব-সমাজকে গড়তে। মানুষকে গড়তে। মানুষকে গরীয়ান ও মহীয়ান করতে। তাঁকে তার মনুষ্যত্বের ধারক করতে, মানবতার বাহক করতে। যুদ্ধকালে মহানবীর যুদ্ধনীতিকে কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী প্রবর্তিত ইসলামের যুদ্ধ নীতি ছিল :

১। অসামরিক সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর হাত দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এবং সামরিক বাহিনীও বা কোন সৈনিক আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বা তাকে আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। সামরিক বাহিনীর মধ্যে হলেও নারী ও শিশুর প্রতি কোন আঘাত চলত না।

২। প্রাণীজগতের কাউকেই হত্যা করা চলত না। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও আরোহী-শত্রু নিহত হয়ে যাওয়ার পর তার বাহন হাতি-ঘোড়া-উট যাই হোক, তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। তবে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতে কোন

শত্রুর বাহন মারা পড়লে দোষ ছিল না। কিন্তু বাহনকে লক্ষ্য করা নিষিদ্ধ ছিল।

৩। উদ্ভিদজগৎ শস্যক্ষেত্র, ফসল-বাগান-বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

৪। স্থাপত্যজগৎ-বাড়ি-ঘর-ইমারত বা এই জাতীয় কোন কিছুকেই ধ্বংস করা চলত না।

৫। যে কোন জলাশয়ের—পুকুর-নদী-নালা-খাল-বিল-সমুদ্র-হ্রদ প্রভতির জলকে বন্ধ বা দূষিত করা চলত না।

এককথায় মহানবী যুদ্ধ সম্পর্কে বলতেন—অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার-অনাসৃষ্টি প্রভৃতিকে বন্ধ করার জন্য এবং সাম্য-শান্তি-সমৃদ্ধিময় সুন্দর সমাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ। যাঁরা যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করতেন, তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হত। যুদ্ধের ১/৫ অংশ লব্ধ ধন রাষ্ট্র পেত, এবং বাকি ৪/৫ অংশ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। একবার একটি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের অমানুষিক ব্যবহারের জন্য খলিফা খালিদ বিন ওয়ালিদকে ভীষণ শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু খলিফার নির্দেশ পৌঁছবার পূর্বেই তারা আত্মসমর্পণ করে, এবং খালিদ তাদের ক্ষমা করেন। এই সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র খলিফা খালিদকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়ে উচ্চ সম্মান দান করেন।

ইসলামের ত্রানকারী আবুবকর (Saviour of Islam):

যোগ্যতম প্রতিনিধি:

শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে সমগ্র বিশ্ব-মুসলিম জাহান হযরত আবু-বকরকে ইসলামের ত্রাণকারী বা রক্ষাকারীর মর্যাদা দান করে আসছে। যতদিন জগৎ আছে, ততদিন ইসলাম আছে, এবং যতদিন ইসলাম আছে, ততদিন আবুবকরের এই সম্মান কেড়ে নেয় বা ম্লান করে দেয়, মহাকাল আজও সে শক্তি ধারণ করেনি। যে কোন ব্যক্তি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবেন যে মহানবীর পর খলিফা বা প্রতিনিধি শব্দের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছিল হযরত আবুবকরের জীবনে। একথায় কোথা এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই।

সমাজে শাসনে যাঁর প্রত্যক্ষ জীবন—
বিধাতার শতগুণে গুণান্বিত জন
সাম্যেতে সূর্যের সম দীপ্তি বিকিরণ
শান্তিতে চন্দ্রের ন্যায় আলো বিতরণ।
কখনও কোমল হৃদয় কুসুম সম
কোথাও পাহাড় হতেও রুদ্রতম।
কখনও প্রশান্তপ্রাণ সাগর সম
কোথাও আকাশ হতেও উদারতম।

ঘনঘোর অন্ধকার :

মহানবীর নির্বাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আরব আবার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। আরব যেন আবার মেতে উঠল আপন স্বভাবে। এই ঘনীভূত অন্ধকারে আবুবকর ইসলামের হাল ধরলেন। আকাশে-বাতাসে বিদ্রোহের দাবানল যেন সমগ্র আরবভূমিকে এক নিমিষেই শেষ করে দিতে চায়। চারিদিকে আন্দোলন, আলোড়ন, ঘরে ঘরে স্বধর্মত্যাগীদের মহড়া। অন্ধকার যুগের আরব বেদুঈন যেন আবার জেগে উঠল। দেখা গেল সর্বত্র অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা মাথা চাড়া দিয়েছে। প্রতারণা-ভণ্ডামী-ভাঁড়ামি-বিশ্বাসঘাতকতা সৎ-সরল মানুষদের একেবারেই বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই দুর্দিনে, দুর্যোগে জাতির সম্মুখে কাণ্ডারী হয়ে এলেন হযরত আবুবকর। খলিফা আবুবকরের অবদান সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন—"এরূপ ঘনীভূত সঙ্কটে, ঘনঘোর অন্ধকারে হযরত আবু বকরের মতো খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র কোনটাই রক্ষা পেত না। মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজ অনিবার্যভাবেই ধ্বংস হতো।"

কোমলচিত্তে কঠোর মানুষ :

আবুবকরের কৃতকার্যতার মূল রহস্য তাঁর কোমলচিত্তে কঠোর মানসিকতা, এবং যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস ও বিচক্ষণতা। আবুবকর নিজে নবী ছিলেন না, কিন্তু যত বড়ই কঠিন সিদ্ধান্ত হোক, যে কাজটিকে তিনি করা বলে উচিত মনে করতেন, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে কোন রকমই দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। সমগ্র আরব যেখানে দুর্বলতার শিকার, সমস্ত দুর্ধর্ষ মরু-বেদুঈন যেখানে পদক্ষেপে স্তিমিত প্রায়, সেখানেই দেখি—আবুবকর সিংহবিক্রমে অবিচলিত মানুষ, কঠোর হস্তে কঠিনতম সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক দুর্জয় মানুষ, সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী মহা বেগবান নদীর ন্যায় এক দুর্বার গতিসম্পন্ন মানুষ, কোমল হৃদয়ে মহাকালের মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড্য মাথায় নিয়ে চির দীপ্তমান, চির দৃঢ়সংকল্প, চির প্রত্যয়পূর্ণ এক কঠোর মনীষা। নবী বা রসুলদের বাদ দিলে নিখিল-মানবে এই মানুষটির দ্বিতীয় নেই।

চরম বিপদকালে দিয়েছিলে তাড়া
রোমান দস্যুরা যখন ঘিরেছিল পাড়া।

বেদুঈনদের সাথে আপোস রফা :

যখন আরব বেদুঈনরা নানাদিক থেকে মাথাচাড়া দিল, যখন হাজারে হাজারে মানুষ তাদের সাথে যোগ দিল, মুসলমানগণ যখন উদ্‌ভ্রান্ত বিভ্রান্ত,

দিশেহারা, মনোবলহারা; তখন বেদুঈনগণ পরামর্শ দিল কিছুটা আপোস রফা করার জন্য। অধিকাংশ মুসলমান তখন এই প্রস্তাবকে সাদরে বরণ করলেন। প্রস্তাবটি ছিল—ইসলামের ফরজ বা অবশ্যাই বিধিবিধানের কিছুটা নেওয়া এবং কিছুটা বাদ দেওয়া। হযরত ওমরের মতো চরম ব্যক্তিত্বশালী মানুষও ঐ প্রস্তাবটিকে মেনে নিয়ে খলিফাকে সম্মত করার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু একমাত্র খলিফা আবুবকর বুঝতে পেরেছিলেন ইসলামের একবার অঙ্গচ্ছেদ হলে, সেটা হবে তার মৃত্যুপরোয়ানা। কেননা ঐ বিধিবিধানগুলো কোন মানুষের দেওয়া নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর কোরআনেই নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন—"আল্লহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।" কোরআন—৬ : ৩৪, ১১৫, ১০ : ৬৪, ১৮ : ২৭। খলিফা সকলকেই বুঝিয়ে দিলেন ঐগুলোর রদবদল করার অধিকার তাঁর নেই। এমনকি স্বয়ং মহানবীরও ছিল না।

অতঃপর খলিফা নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করলেন—জগতে ইসলাম এসেছে বিভ্রান্ত মানুষকে, সমাজকে, বিশ্বকে পথ দেখাতে। কোন ভ্রান্তির সাথে আপোস মীমাংসা করতে নয়, কোন লোভ-প্রলোভনের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিতে নয়, কোন অশুভ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে নয়, কোন ভয়ের নিকট মাথা নত করতে নয়। ইসলামের আগমন আলোর জন্য। অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে নয়। বরং অন্যায়ের সাথে, অবিচারের সাথে, অন্ধকারেব সাথে, মিথ্যার সাথে লড়াই করে আপোসহীন শর্তে এগিয়ে যাওয়াটাই ইসলামের মূল কাজ, মূল আদর্শ। ৩ : ১১০, ৬ : ১৬২-৬৩, ১৬ : ৯০, ২২ : ৪১, ৭৮। এই মহাসত্যকে সেদিন একমাত্র আবুবকরই মর্মে মর্মে অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। অধ্যাপক মূইর ঠিকই বলেছেন—"সেদিন আবুবকর না থাকলে বেদুঈন গোত্রদের সাথে একটা আপোস রফা করে ইসলাম চিরতরে লোপ পেয়ে যেত। অথবা জন্মের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।" আবুবকর ইসলামকে এই অনিবার্য বিলোপ ও ধ্বংস হতে রক্ষা করলেন।

চির সত্যবাদী আবুবকর :

মহানবী (সাঃ) জীবনে একটিবারও মিথ্যা উচ্চারণ না করেই দুর্ধর্ষ আরব বেদুঈনদের নিকট হতে 'আল-আমীন' চির বিশ্বাসী উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁব এই উত্তম চরিত্রের উত্তম দিকটি তাঁর মহান ব্রতে কম সাহায্য ও কম অবদান জোগায়নি। সমগ্র আরবকেই মনের কোণে মাঝে মধ্যেই চিন্তা করতে হয়েছিল—'মহম্মদকে,' কোন মহান যিনি জীবনে মিথ্যা কিছুই জানেন না। ঠিক অনুরূপভাবেই মহানবীর যোগ্যতম শিষ্য, অদ্বিতীয়

শিষ্য, অচিন্ত্যনীয় শিষ্য, বিরল ব্যতিক্রমময় পুরুষ আবুবকব একদিন মহানবীব নিকট হতেই লাভ করলেন—জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপাধি - 'আল্ সিদ্দিক' সত্যবাদী। ইসলাম জন্ম নিল একদিন চিরবিশ্বাসীর' কোলে, ঠিক অনুরূপভাবেই লালিত হল, পালিত হল একজন সত্যবাদীব কোলে। এইটাই বোধহয বিধিব বিধানে বিধিবদ্ধ ছিল। যা পরবর্তীকালে সমাজ-জীবনেব নানা স্রোতে স্বাভাবিক রূপ লাভ করল।

ইসলামের তরী তীরে আনলেন :

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) ইসলামেব মাধ্যমে চেযেছিলেন সমগ্র আরব তথা বিশ্ব মানবের শান্তি ও সভ্য জীবন। 'ইসলাম' ছিল তাঁব সেই মহান ব্রতের মহালক্ষ্যে পৌঁছনোর মেশিনাবী উপায বা হেতু। এখানে 'ইসলাম' কোন গতানুগতিক 'ধর্ম' ছিল না। এটা ছিল 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কোবআনে ইসলামকে ঐ অর্থেই ব্যবহাব কবা হযেছে। ধর্ম অর্থে নয়। কোরআন - ৩ : ১৯.৮৫, ৫ : ৩, ৯ : ৩৩, ৩০ : ৩০, ৪৮ : ২৮। তাই ইসলামেব মূল উদ্দেশ্য প্রভুব বন্দনা বা স্মবণ এবং সত্য ও সুন্দবেব পথে সমুন্নত জীবন গঠন বা সমাজ গঠন।

কিন্তু মহানবীব পবলোক গমনেব পব যখন আববাসী আপন ভ্রমবশত ইসলামকে নানা কাবণে প্রত্যাখ্যান কবে আবাব তাবা তাদেব সেই অসভ্য বর্বব জীবনে ফিবে যেতে চাইল, তখন আবুবকব সিংহবিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন। অসাধাবণ বীবত্ব ও বিচক্ষণতায ইসলামকে আবাব বুঝিযে দিলেন জীবন গঠনে, সমাজ গঠনে, জাতি গঠনে এব মূল্য কত অপবিসীম। ইসলামেব সকল অনুশাসনকেই সমাজে অবিকৃত অবস্থায বেখে এবং অক্ষবে অক্ষবে পালন কবিযে জগতেব ইতিহাসে প্রমাণ কবে গেলেন তিনি ইসলামেব তবণী তবীটিকে তীবে আনলেন, এবং ঐ মহাদুর্দিনে তিনিই ছিলেন ইসলামেব ধাবক ও বাহক। সমগ্র আববেব ভয ভীতি, উদ্ভ্রান্ত ভণ্ডামি, ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা, প্রতাবণা, হিংসা, বিদ্বেষ, বিরুদ্ধাচাবণ কোন কিছু কোনদিনই তাকে এতটুকুও কর্তব্যচুত বা পদচ্যুত করতে পাবেনি। নবীজীব যোগ্যতম শিষ্য হযবত আবুবকব (বাঃ) নিখিল বিশ্বেব সম্মুখে মহাঝঞ্ঝাময বিপদসঙ্কুল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষ হতে ইসলামেব তবীকে নিবাপদে তীবে আনলেন। এটা হযবত আবুবকবেব গর্ব, এবং তিনি বিশ্ব মুসলিমেব তথা ইসলামেব গৌবব।

রোমান দস্যুবা যখন ঘিবেছিল পাড়া
এমনি চবমকালে দিযেছিলে সাড়া।

কোন্ অদৃশ্যবলে আবুবকর ইসলামের ত্রাণকারী :

হযরত আবুবকরের কৃতকার্যতা লাভের মূলে ছিল বিরাট সত্যের উপলব্ধি। তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বজয়ের পূর্বেই আরববাসীদের প্রথম আরবকেই জয় করতে হবে। যেমন মহানবী বলেছিলেন—"শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার পূর্বেই তুমি নিজের সাথে যুদ্ধ কর। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন সবচেয়ে বড় জেহাদ, আপন ষড়রিপুর সাথে জেহাদ করা।" এই জেহাদে যিনি বিজয়ী, তিনি সমস্ত জেহাদেই বিজয়ী। এই জেহাদেই মহানবী ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মোজাহেদ এবং শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী। এই পথই আবুবকর অনুসরণ করলেন। এইটাই ছিল তাঁর সত্যের বিরাট উপলব্ধি। তিনি সমগ্র আরবকে শেখালেন—আগে নিজকে জয় কর। পরে অপরকে কর। এইভাবে তিনি সমগ্র দেশবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখালেন। তখন মরুবেদুঈন আবার আবুবকরের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলো। তাদের শক্তি যেন সঙ্গে সঙ্গেই দশ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। অর্থাৎ তাঁরা যেন আবার মোমিনে অর্থাৎ বিশ্বাসীতে পরিণত হলেন। আবু-বকরের একটি কথাই ছিল—ফিরে চল কোরআনে, ফিরে চল মহম্মদে। আরববাসী আবার যেন ফিরে পেল তাদের উত্তম চরিত্র, কোরআনের চরিত্র। ৯৫ : ৪। এবার তাদের পা পৃথিবীর মাটিতে থাকলেও তাদের উন্নত মাথা উন্নতির আকাশকে স্পর্শ করল।

আপন জাতিকে এইভাবে উন্নত চরিত্রে কোরআনের মোহিনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর খলিফা আবুবকরের হাতে দেখা দিল বিশ্ব-বিজয়ের মহাসূচনা। আপন জাতিকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে এবার খলিফা মনোযোগ দিলেন ঐ শত্রুকুলের প্রতি, যারা দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখছিল—আরব বেদুঈনকে চিরতরে বিলোপ করে দিতে। এইভাবে আবুবকরের হাতে শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে সমগ্র আরবভূমিতে বেজে উঠল—বিশ্ব-বিজয়ের দামামা। পরাজিত হল—বিশ্বশক্তি পারস্যবাহিনী, মাথা নত করল সারা বিশ্বের সন্ত্রাসকারী শক্তি রোমান বাহিনী। দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা বলতে পারি পরবর্তীকালে হযরত ওমর ফারুকের সময় ইসলামের যে বিশ্ব-বিজয় সারা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, তা কোনদিনই সম্ভব হতো কিনা কে জানে, যদি না হযরত আবুবকরের অসীম বীরত্ব, অতুলনীয় ঈমানের বল, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পবিত্র কোরআনের নিখুঁত প্রয়োগ, মহানবীর প্রতি দ্বিধাহীন আস্থা এবং আপন বিশুদ্ধ বিবেকের ক্রটিহীন বিচক্ষণতা অনাগতকালের আরবভূমিতে, মক্কার মাটিতে, মদিনার বুকে ঐ মহাবিজয়ের পূর্বতন বীজ রূপে না বয়ে যেত। সুতরাং হযরত আবুবকর শুধু মাত্র ইসলামের ত্রাণকারীই নন, বরং ইসলামের আত্মতীরে ফল্গুর মতো চির প্রবাহিত সঞ্জিবনীসুধা। অন্তরের এই স্বর্গীয় সুধাই ছিল তাঁর অদৃশ্যবল। ৩ : ১৭৯।

একবার ঘুরে দেখ অতীত জগৎ
ইসলামের জয়যাত্রা রাজ্য খেলাফত।
এশিয়া আফ্রিকা হতে ইউরোপ বিজয
ইসলামের অদ্বিতীয় কৃতী সুনিশ্চয।
আজও আশ্চর্যভাবে জগৎ-জনে
নিঃস্ব আরব ইহা করিলে কেমনে।
এ রাজ্য গড়েনি কোন ছলে-বলে-কলে
ইসলাম গড়িল তার ঈমানের বলে।

ইসলামের এই বিশ্ববিজযের বীজটি বপন কর্বেছিলেন স্বযং মহানবী, চাবা বৃক্ষটি গরু-ছাগলের অত্যাচার হতে, কঠিনতম বিপদ হতে পবিত্রাণ পেযে লালিত হল, পালিত হল হযরত আবুবকবের হাতে। আবাব বিশ্ববিজযেব সেই শিশুবৃক্ষটি মহীরূহতে পবিণত হল হযরত ওমবেব হাতে।

কোরআন সংরক্ষণ :

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবিতকালে আল্লহ্ব নিকট হতে ফেরেশতা জিবরাইল কর্তৃক ঐশীবাণী কোরআন পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে (শ্রুতিযোগে) সাহাবীদের মুখস্থ করতে বা লিখে রাখতে বলতেন। মহানবীব পবলোক গমনেব পর হযরত আবুবকবের সময ভণ্ডনবী মুসাইলামাব বিরুদ্ধে ইযামামাব যুদ্ধে তিনশো' হাফিজ (কোরআন মুখস্থকারী) শহিদ হলে হযবত ওমবেব পবামর্শ মতো খলিফা আবুবকর মহানবীর ব্যক্তিগত কোরআন-সচিব যাযেদ বিন সাবেতকে কোবআন শরীফ পুস্তাকারে লিপিবদ্ধ কবাব দাযিত্ব ও নির্দেশ দেন। যাতে ভাবীকালে মূল কোবআন পেতে কারো কোন অসুবিধে না হয। যাযেদ ঐ কাজ সম্পন্ন করে খলিফাব নিকট জমা দেন। তখন খলিফা নিশ্চিন্ত হলেন। খলিফা জীবনেব অন্তিমকালে হযবত ওমবেব নিকট ঐ মহাগ্রন্থটি দিয়ে যান। হযরত ওমর তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে আপন কন্যা ও মহানবীব স্ত্রী বিবি হাফ্সার নিকট জমা রেখে যান।

পরবর্তীকালে ইসলামের তৃতীয খলিফা হযরত ওসমান দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে কোরআন পাঠে কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করে বিবি হাফসাব নিকট হতে ঐ মূল গ্রন্থটি সংগ্রহ করে তা হতে অসংখ্য কপি তৈবি কবে দেশেব প্রচলিত সমস্ত কপিগুলোকে নষ্ট কবে সারা দেশে মূল গ্রন্থটিব অবিকল কপি প্রচলিত করলেন। এইভাবে ইসলামেব মূল গ্রন্থ পবিত্র কোবআনেব বক্ষণাবেক্ষণে হযরত আবুবকরের দান অপরিসীম ও অসামান্য রূপে বয়ে গেল।

সুতরাং হযরত আবুবকর যে ইসলামধর্মের ও রাষ্ট্রের ত্রাণকাবী রক্ষাকারী,

একথাটি রাতের পর দিনের ন্যায় সত্য। মহানবীর জীবিতকালে হযরত আবু-বকর ছিলেন তাঁর জীবনছায়া দেহরক্ষী স্বরূপ। আবার অন্যদিকে, মহানবী ছিলেন ইসলামের প্রাণস্বরূপ এবং আবুবকর ছিলেন সেই প্রাণের দেহস্বরূপ। পরবর্তীকালে আবুবকর অতীতের ঐ যোগসূত্র হতেই বর্তমানের অগ্নিপরীক্ষায়, সত্যের মহাপরীক্ষায়, সাধনার দুর্গম পথে আকাশের মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় প্রমাণ করলেন তিনি ছিলেন অরক্ষিত মহাবিপদাপন্ন শিশু ইসলামের রক্ষাকারী ত্রাণকর্তা।

এমনি জীবন তুমি করেছিলে খাড়া
মুসলিম জাহানে তব নাহি আছে জোড়া।

খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)

(১) প্রথম মুসলমান, বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে
(২) প্রথম মুজাহিদ, ইসলামের পথে
(৩) প্রথম খলিফা, ইসলাম জগতের
(৪) প্রথম বায়তুলমাল স্থাপনকারী, ইসলামি সাম্রাজ্যে
(৫) প্রথম ভাতা প্রবর্তনকারী, ইসলামি সাম্রাজে
(৬) প্রথম ইজতিহাদের (বিচার বুদ্ধির) প্রবর্তনকারী, ইসলামি সাম্রাজ্যে
(৭) প্রথম কোরআন সংরক্ষণকারী, ইসলামি সাম্রাজ্যে
(৮) প্রথম স্থান সংগ্রহকারী-মসজেদে নববীর জন্য, মদিনাতে
(৯) প্রথম বেহশতে প্রবেশকারী
(১০) প্রথম শ্রেষ্ঠ মানব, নবী ও রসুলগণের পর
(১১) প্রথম শিক্ষা দিলেন—দুই বিশ্ব-শক্তিকে
(১২) প্রথম ইমাম—মসজিদে নববীতে, নবীর পর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আল্লাহর তরবারি, অজেয় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ

সাইফুল্লাহ :

বিশ্ববীরের ইতিহাসে খালিদ একজন প্রবাদপুরুষ, একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। একজন অপ্রতিহত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর। আমরা বীরের ইতিহাসে দেখছি আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, হানিবল, কুব্লাইখান, হালাকু খান, চিঙ্গিস খান ও নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রমুখ। কিন্তু বিশ্ববীরের ইতিহাসে লক্ষ্য করছি এই সমস্ত বীরগণ কোথাও না কোথাও পরাজয়কেও আলিঙ্গন করেছেন। বীববর খালেদ এর ব্যতিক্রম। জীবনে কোথাও কোন যুদ্ধেই পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনি এক ক্ষণজন্মা বীর বিশ্ব ইতিহাসে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সকল ঐতিহাসিকই এই সত্যটি স্বীকার করেছেন। বীরাকাশের মধ্যাহ্ন গগনে অজেয় বীর খালিদ বীবের ইতিহাসে সূর্যেব ন্যায় চিরদীপ্তমান, যেখানে অন্যান্য বিশ্ববীরগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বিরাজ করছেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর অতি উচ্ছ্বাস ভবে বলেছিলেন— "আর কোন আরব-রমণী দ্বিতীয় খালিদকে গর্ভে ধারণ করবে না।" ইসলামের মহানবী খালিদকে 'সাইফুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লার তরবারি নামে ভূষিত করেছিলেন। 'সাইফুল্লাহ' কোথাও কোন মানুষের তরবারির নিকট নত হয়নি। বিশ্ববীরের ইতিহাসে তাই তিনি আজও একমাত্র 'অজেয় বীর'। আকাশে বাতাসে আজও তিনি চির-উন্নত, সমুন্নত 'সাইফুল্লাহ্'।

জগৎ-বীরের সভায় মোরা, তোমারই করি গর্ব হে
মুসলিম সেতো বীরের জাতি, মুসলিম নহে খর্ব হে।

বংশ-পরিচয় :

সারা পৃথিবীর একমাত্র অজেয় বীর খালিদ আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশের মাখযুমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সন-তারিখ সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি হযরত ওমরের সমসাময়িক ছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর জন্ম সন ৫৯০-৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই পড়ে। তাঁব পিতার নাম ওয়ালিদ এবং মাতার নাম লোবাবা ছেগরা। মাতা মহানবীর স্ত্রী ময়মুনার সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। ফলে মহানবী ছিলেন খালিদের আপন খালু। মাখযুমী গোত্র যুদ্ধবিদ্যায়

অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। আরবদের শতাব্দীর ইতিহাসে যুদ্ধবিদ্যায তাঁদের যথেষ্ট সুখ্যাতিও ছিল। মহাবীর খালিদ সেই সুখ্যাতির চরম ও শ্রেষ্ঠ ফসল।

মহাবীর খালিদ আশৈশব খুবই নির্ভীক ও কৌশলী ছিলেন। তিনি শৈশব হতেই কোরেশ বংশের বাছাই করা বীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। আরবদের মধ্যে হযরত ওমর ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর। একবার একটি প্রতিযোগিতাতে হযরত ওমর ও হযরত খালিদও যোগদান করেন। কুস্তী প্রতিযোগিতাতে খালিদ ওমরকে সরাসরি মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন। ঐদিন হতে খালিদ আরব ভূমিতে বীর হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য হতেন। আজও সেদিনের আবব-বীর খালিদ সমগ্র বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

খালিদের পা হতে মাথা পর্যন্ত ছিল একজন নিখুঁত গোলাকৃতি মানুষ। অতি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না, একটু খর্বাকৃতি বিশিষ্ট সুঠাম মানুষ ছিলেন। মাথা ছিল বড়। ললাট ছিল প্রশস্ত। বক্ষ ছিল বিস্তৃত, মুখে কিছু বসন্তের দাগ ছিল, চক্ষুদ্বয় ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, হাত-পা ছিল নিটোল। এককথায় তাঁর দেহ ছিল একজন মহাবীরের নিখুঁত ছবি। যাঁকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুকুল ঘাবড়ে যেত।

মহাবীর খালিদের ইসলাম গ্রহণ, মহানবীর সময় :

হযরত ওমরের ন্যায় মহাবীর খালিদও ইসলামের চরম দুষমন ছিলেন। এমনকি ওহোদ যুদ্ধে তাঁরই রণকৌশলে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী কিছুক্ষণের জন্য বিজেতাতে পরিণত হন। হযরত ওমর তাড়াতাড়ি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু মহাবীর খালিদের ইসলামের সৌন্দর্যকে বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল; ঐতিহাসিক হোদাইবিয়ার সন্ধিব পর খালিদের আপন খালা বিধবা মযমুনা (৫১) মহানবীকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠান। মহানবী সানন্দে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে দুই বীর বত্নকে লাভ করেন—মহাবীর খালিদ ও বীরবব আমব বিন আস। এই কাজে ময়মুনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মহানবীর অন্যান্য সকল বিবাহের পশ্চাতেও ছিল এমনি এক একটি গুঢ় কারণ।

রোমানদের সাথে মুতা যুদ্ধে খালিদ :

মহানবীর খালিদের অবদান :

সেদিনের সিরিয়া প্রান্তে রোমান, গ্রীক ও খ্রীস্টানদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের যাতায়াত একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠলে মহানবী চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। পরিশেষে ঐ অঞ্চলে একটি তিন হাজার সৈন্য বিশিষ্ট ছোট অভিযান

পাঠালেন। ঐ অভিযানের নেতা ছিলেন যায়েদ বিন হারিস। মহানবী তাঁদেব যাত্রাকলে নির্দেশ দিলেন, "যদি যায়েদ শহিদ হয়, তাহলে হযরত আলির ভ্রাতা জাফর বিন আবু তালিব পতাকা নেবে, সেও যদি শহিদ হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়া, যিনি ছিলেন আরবের একজন বিখ্যাত কবি, সেও যদি শহিদেব মর্যাদা লাভ করে, তাহলে তোমাদের মনোনীত ব্যক্তি।" অতঃপব মহানবী আব মুখ খোলেনেনি।

যখন ঐ অঞ্চলের মুতা প্রান্তরে লক্ষাধিক রোমান বাহিনীব সাথে মিলিত হল সামান্য মুসলিম বাহিনী, তখন রোমানগণ ঘোষণা করল--আধ ঘণ্টাব মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই রোমানগণ মুসলমানদের নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করতে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হল। অল্পক্ষণেব মধ্যেই যুদ্ধ প্রবল বেগে ধাবিত হল। ইসলামের পতাকাবাহী যোদ্ধা সেনাপতি যায়েদ কিছুক্ষণের মধ্যেই শহিদ হলেন, তখন পতাকা নিলেন জফর, তিনিও শহিদ হলেন, অতঃপর পতাকা নিলেন আব্দুল্লাহ। তিনিও শহিদ হলেন।

অতঃপর মহাবীর যুবক খালিদই মনোনীত সেনাপতির আসন লাভ করলেন। তিনি প্রথমেই তাঁর সেনাবাহিনীকে গুছিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতাল ভেদ করে তকবির ধ্বনি "আল্লাহু আকবার" আরম্ভ কবলেন। কখনও 'ইয়া মহম্মদ', 'ইয়া মহম্মদ'। কখনও বা "লা তাখাফ্", তোমরা ভয় করো না। "ইন্নাল্লাহা মা' আনা", আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল সেনার মনের মধ্যে মহাবেগে ঈমানের তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। আবম্ভ হলো আবার যুদ্ধ। সেনাপতি খালিদ তাঁর সহচরদের নির্দেশ দিলেন- তাঁবা যেন এক ডজন উত্তম তরবারি সহ তাঁর পেছনে সদাই প্রস্তুত থাকেন। পরবর্তী অধ্যাযে খালিদ যে মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তা প্রমাণ করেছিল—মহাবীব খালিদ যেন কোন রণাঙ্গনে নেই। তিনি যেন একটি 'রোমান-কলা বাগানে' প্রবেশ কবে সন্ধ্যা আগত হওয়ার পূর্বেই বাগানটি শেষ করলেন। এই কলা বাগানটি শেষ করতে তাঁর নয়টি উত্তম আরবীয় তরবাবির প্রযোজন হর্যেছিল। পবদিন প্রভাতে ঐ অঞ্চলে রোমান সৈন্য তো বহু দূরের কথা, একটি পাখিও ছিল না। ছিটেফোটা যে কয়েকজন রোমান সৈন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন, তাঁরা রাত্রির অন্ধকারেই অদৃশ্য হল। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বহু রসদ পত্র, ও মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং বহু জীব-জন্তু লাভ করে বিজয়ী বেশে মহানন্দে মদিনায ফিরে মহনবীব সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মহানবী খালিদকে তখন "সাইফুল্লাহ", 'তুমি আল্লহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন হতে আজও খালিদ 'সাইফুল্লাহ'। এই সম্মান, এই উপাধি তিনি ব্যতীত অন্য কেউই পাননি।

ইসলামের ইতিহাসে মুতার যুদ্ধে খালিদের অবদান এক বিস্ময়কর ঘটনা, বিশ্ব ইতিহাসে এই ঘটনার কোন তুলনা নেই, এই যুদ্ধে যদি মুসলমানগণ

হেরে যেতেন, তাহলে ইসলাম প্রচার রোমানগণ কর্তৃক হয়তো বা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেত। সুতরাং আরবের বাইরে ইসলামের প্রথম যে প্রচার মহাবীর খালিদের হাতেই তা সার্থকতা লাভ করল।

বর্বর রোমানদের করিতে তাড়া
মূর্তিমান যমরূপে হয়েছিলে খাড়া।

ইসলামের প্রচারক রূপে নাজরান অঞ্চলে খালিদ :

আমরা খালিদকে মুতা প্রান্তরে একজন অসীম সাহসী মহাবীর মহাযোদ্ধা রূপে দেখতে পেলাম। এবার আমরা ইসলামের সেবায় তাঁর অন্য একটি স্বরূপ দেখতে পাবো। খালিদ মহাবীর ছিলেন। তবে কোনদিনই রক্তপিপাসু ছিলেন না। বিশাল তরবারি তাঁর ইঙ্গিতে ঘুরত। কিন্তু তিনি কোনদিনই তরবারির দ্বারা ঘোরেননি। মহানবী নাজরান গোত্রে ধর্মদ্রোহিতাদের জন্য একদল সৈন্য সহ খালিদকে পাঠালেন। তিনি খালিদকে যাওয়ার কালে নির্দেশ দিলেন—প্রথমে তিনি যেন তাদেরকে বুঝিয়ে ইসলামে আনার চেষ্টা করেন। সকলেই জানত খালিদ তরবারি যোগে মহাবীর। কিন্তু কেউই জানত না তাঁর বীরত্ব অন্য স্থানেও বিরাজিত।

তিনি সেখানকার নাজরানবাসীদের ডাকলেন। ভাই বলে সকলেরই সাথে সমভাবে মিশলেন। সকলেই বুঝতে আরম্ভ করলেন ইসলামের অসংখ্য গুণাবলী। ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এটি মানুষকে করে মহীয়ান। এককথায় ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, মনুষ্যত্বের ধর্ম। খালিদ কোরআন ও হাদিস্ হতে ইসলামের যে অপরূপ ব্যাখ্যা দেন, তাতে নাজরানবাসীদের হৃদয়-মন একেবারেই বিগলিত হয়ে ওঠে। তাঁরা আবেগপ্লুতভাবে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। এই শুভ সংবাদ খালিদ পত্র মারফত মহানবীকে জানিয়ে দেন—

"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লহর নামে—
আপনার ওপর আল্লহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনার নির্দেশমতো আমি নাজরানে বনি হারেস গোত্রকে ইসলামের গুণাবলী তিনদিন যাবৎ ব্যাখ্যা করে বোঝানর পর তারা সকলেই ইসলামের গুণে মুগ্ধ হয়ে আবার ইসলামে ফিরে এসেছে। বর্তমানে আমি তাদের কোরআন ও হাদিসের নানা প্রকার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছি। অতঃপর আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ দেবেন, আমি সেইরূপভাবে এগবো। আপনার আদেশের অপেক্ষায় থাকলাম।"

এই পত্রের উত্তরে মহানবী খালিদকে লিখলেন—

"আল্লহর রহমত তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক। দূত মারফত তোমার পত্র পেয়ে আনন্দ পেলাম। বনি হারিস গোত্র ইসলাম কবুল করেছে জেনে সুখী

হলাম। তুমি তাদের পবিত্র কোরআন ও হাদিসেব মর্মবাণী শিক্ষা দাও। তাদেব সর্বপ্রকার কল্যাণ করার চেষ্টা কর, এবং তাদের পূর্ণ নিবাপত্তা ঘোষণা কর, এবং তাদের মধ্য হতে একদল প্রতিনিধি-সহ মদিনাতে ফিবে এস।"

অতঃপর খালিদ মহানবীর নির্দেশমতো কাজ করলেন। নাজবানেব হাবিস গোত্রের কিছু প্রতিনিধি সহ খালিদ মদিনাতে মহানবীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। মহানবী খালিদের কাজে যারপরনাই খুশি হলেন। আল্লহর তরবারি আজ ইসলামের সেবায় আল্লহর দূতের দূতরূপে কাজ করে মহাকৃতকার্যতা-সহ মহানবীকে মহানন্দ দান করে নিজকে আজ মহাবীর হতে মহাবাগ্মীর অধ্যায়ে ও আসনে উন্নীত করলেন। আজ মহাবীর খালিদ জীবনের বহু রক্তক্ষয়ী বিপ্লবী হতে তববাবিশূন্য রক্ত-বিহীন বিপ্লবী। এখন হতেই আরম্ভ হল ইসলামের প্রচার কৃপাণে নয় কোরআনে। যখন কেউ কোরআন অর্থাৎ সত্য ও ন্যাযকে মেনে নেয়নি, অনাচারেব দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখনই একমাত্র কৃপাণ বেজে উঠেছে। খালিদের এই ঘটনার পর মহানবী মাত্র তিন কি চার মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন।

আবুবকরের খেলাফতকালে খালিদ :

ইসলামের ইতিহাসে ও সেবায় যদি মহাবীর খালিদের যথার্থ স্বরূপ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে হয়, তাহলে বলতেই হবে—স্বয়ং মহানবীব পব আবুবকর, এবং আবুবকরের সাথে বা পরে মহাবীর খালিদ। কেননা সারা আরব যখন মহানবীব পর বিদ্রোহের বানে ডুবুডুবু, ইসলামের তরী যখন একেবাবেই টলায়মান। স্বধর্মত্যাগীরা যখন দলে দলে আপন আপন পুরাতন বিশ্বাসে প্রবল বেগে প্রধাবিত, ভণ্ডনবীগণ যখন সমগ্র আরবকেই যেন গ্রাস করে বসেছে, ঠিক হেনকালেই ইসলামের জন্য আরবের বাইরেও দেখা দিল বিরাট ও বিভীষিকাময় বিপদ। তদানীন্তন দুই বিশ্বশক্তি—ইরান ও রোমান বাহিনী শিশু ইসলামকে জীবনের মতো জগতের বুক হতে চিরবিদায় দিতে সর্বশক্তি-সহ ছলে-বলে-কলে বিরামবিহীন প্রচেষ্টায় একেবারেই বদ্ধপরিকর হল। এককথায় এই ঘরে-বাইরে বিপদে সকলেই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইসলামের মৌলিক দিকটাকেই ভুলে গেলেন। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন—হযরত আবুবকর ও সাথে খালিদ। এমনকি তখন অনেকেই ইসলামের কিছু কাটছাঁট করেই ঐ বিদ্রোহীদেব সাথে আপোস মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছিলেন।

ঘরে-বাইরে খালিদ :

অতঃপর আবুবকব প্রথম ঘর সামলাবার জন্য আল্লহব তববারি খালিদকে ডাক দিলেন। মহাবীর খালিদ বীরবিক্রমে, যে তৎপবতায, যে বণনৈপুণ্যে,

যে অসীম সাহসে আরবের অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও প্রবল প্রতাপান্বিত ভণ্ডনবীগণের দুর্বার প্রচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করলেন; বিশ্ববীরের ইতিহাসে, ইসলামের ইতিহাসে তা চির নজিরবিহীন বিরল দৃষ্টান্ত। এই মহাদুঃসময়ে এই দুর্দিনে ইসলামের সেবায় মহাবীর খালিদ একমাত্র আবুবকর ব্যতীত মহানবীব সকল সাহাবীকেই নিঃসঙ্কোচে-নির্দ্বিধায় অতিক্রম করেছেন। এই কথা বললে মহাবীর খালিদ সম্পর্কে এতটুকুও অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন করা হবে না। অতঃপর খলিফা আবুবকর ঘরকে শান্ত করার পর বহির্বিশ্বের দিকে মনঃসংযোগ করে আবার নিযুক্ত করলেন—সেই একই 'আল্লহর তরবারি' মহাবীর খালিদকে। তদানীন্তন বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি ছিল—পারস্য ও রোম। উভয়েরই একই উদ্দেশ্য ছিল এক নিমিষে জগতের বুক হতে ইসলামকে চিরতরে খতম করা। যার জন্য তাদের বারবার বহু যুদ্ধ, হুঙ্কার ধ্বনি, বারবার জুলুম, অহেতুক অন্যায়-অত্যাচার আরবভূমিকে একেবারেই আতঙ্কগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। এমনকি আরব-অস্তিত্বেরই ভিত নড়ে গিয়েছিল। যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ক্ষণজন্মা পুরুষ হযরত ওমরের মতো বিবল ব্যক্তিত্বও ইসলামের 'অঙ্গহানিও মেনে নিয়ে বিরোধীপক্ষের সাথে আপোস মীমাংসাতে বসার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করে ধমক খাচ্ছেন—"ওমর তুমি মরো"।

হক কথা বলতে গেলে ইসলামের জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে, একদিকে নিরুপায় ও অন্যদিকে অসীম সাহসী খলিফা আবুবকর এক আল্লহর ওপর নির্ভর করেই সেই একই 'আল্লহর তরবারি' খালিদকে আবার নির্দেশ দিলেন—'এগিয়ে চলো'। একটির পর একটি ইতিহাসের পাতাতে আরবের বুকে আরম্ভ হল মুরুঝড়-মরুতুফান, ইসলামের অগ্নি-পরীক্ষা। মরুবুকে বিরামবিহীন গতিতে চলল একের পর এক অভিযান-যুদ্ধাভিযান সমরাভিযান ও বিজয়াভিযান:

১। ঐতিহাসিক ধুলকাশা ও রাবাধার যুদ্ধ
২। ,, বুজাখার যুদ্ধ
৩। ,, ইয়ামামার যুদ্ধ
৪। ,, বাহরাইন অভিযান
৫। পারস্য অভিযান
৬। ,, বাইজান্টাইন (রোমান) অভিযান
৭। ,, আজনাদাইনের যুদ্ধ
৮। ,, দামেস্ক বিজয়
৯। ,, ইয়ারমুকের যুদ্ধ

এতদ্ব্যতীত অসংখ্য দুর্গের দখল প্রভৃতি রণাঙ্গনে তদানীন্তন দুই বৃহৎ শক্তির সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার-অহমিকা ও আত্মশ্লাঘা যেন শীতের আগমনে ফাল্গুনের পাতা পড়া হলো।

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বীর খালিদ :

তখন জগৎ দেখতে পেল একমাত্র আল্লহ্র তরবারি খালিদের বাহু বলে, বীরত্বে, বিক্রমে ও রণকৌশলে দুই বিশাল বিশ্ব-শক্তি পারস্য ও রোম, যারা ইসলামের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করতে এসে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী মহা বেগবান তুফানের মুখে বালির বাঁধভাঙা রূপে তোড়ে বিলীন হয়ে গেল। ইসলামের ঘরে-বাইরে জগৎ যেন সাক্ষী থাকল—আল্লাহ্র তরবারি কত দুর্জয়, কত দুর্নিবার, কত দুর্লঙ্ঘনীয়, জয় যেন তাঁর জন্ম নাড়িতেই বাঁধা ছিল। বিজয় ছিল যাঁর সহচর। সফলতা ছিল চিরসঙ্গী, কৃতকার্যতা চিরবন্ধু। হৃদয়ে ছিল বীরের তেজ, বুকের কোণে নবী মহম্মদ (দঃ), ফেরেশতা ছিলেন দুই বাহুতে, আল্লাহ্ ছিলেন মাথার 'পর। এইটাই ছিল বীর খালিদের গোপন চেহ্রারা, বীরত্বের চাবি।

সুতরাং যতদিন জগৎ আছে, ততদিন ইসলাম থাকবে, এবং যতদিন ইসলাম আছে, ততদিন মুসলিম থাকবে, এবং যতদিন মুসলিম আছে, ততদিন আল্লাহ্র তরবারি খালিদের অপরিসীম দান ও অবদানের কথা আকাশে-বাতাসে, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। এই ধরনীর এই ধূলি মাটিতে এই ধ্বনির কোনদিনই শেষ নেই।

শেষ নেই যার, সেটি শেষ করিলাম
একথা বলিতে কভু নাহি পারিতাম।

*　　*　　*

জগৎ বীরের সভায় খালিদ, তুমিই মোদের গর্ব হে
বিশ্বশক্তি কাঁপিয়ে দিলে, মুসলিম নহে খর্ব হে।

*　　*　　*

বীর খালিদের বীর বাহুদ্বয় বিশ্বকে দিল ভু'ড়ে
আবুবকরের বিজয় ডঙ্কা বাজিল বিশ্বজু'ড়ে।
বীর মুসান্নার বীর বাহুদ্বয় বিশ্বকে দিল ছুঁড়ে
আবুবকরের বিজয় ডঙ্কা বাজিল বিশ্বজু'ড়ে।

ইসলামের ইতিহাসের
দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।